৭ মার্চ ১৯৯০ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ সাত টাকা

# আনন্দমেলা

■ লুকনো রত্নের রহস্য
■ আনন্দ বাগচীর গোয়েন্দা উপন্যাস

■ কম্পিউটারের ভাষা
■ ইলেকট্রনিক্স গেম
■ কেরিয়ার গাইড

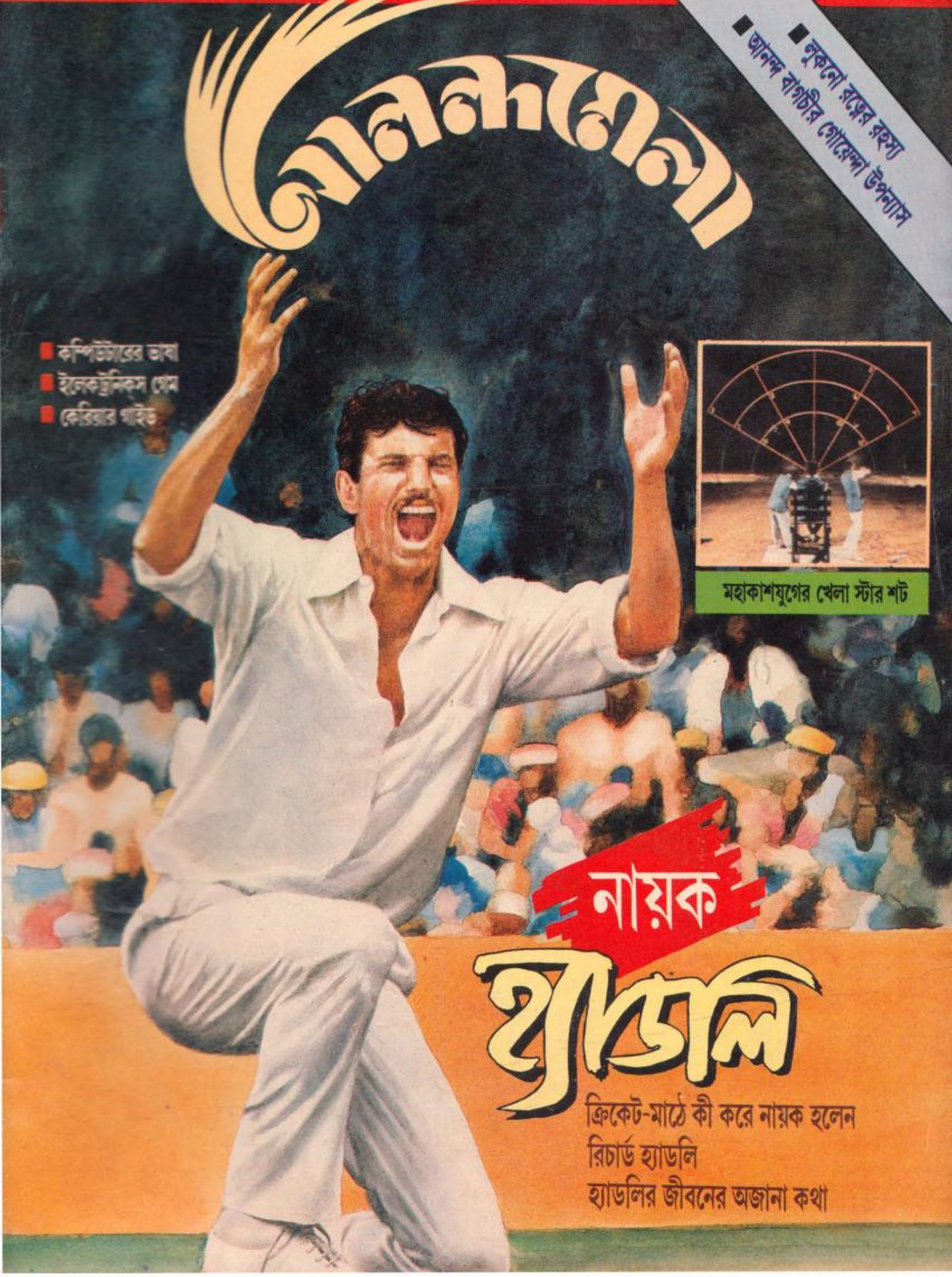

মহাকাশযুগের খেলা স্টার শট

## নায়ক হ্যাডলি

ক্রিকেট-মাঠে কী করে নায়ক হলেন
রিচার্ড হ্যাডলি
হ্যাডলির জীবনের অজানা কথা

ফ্যাশানদুরস্ত চুল!
স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চুল!
ক্যান্থারাইডিন সেই একমাত্র লাইট হেয়ার অয়েল যা আপনাকে দেয় এই দুটিরই সম্পদ
ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল আপনার চুলে এনে দিচ্ছে খুশি থাকার মতন স্বাস্থ্য ও স্টাইল। এর প্রতিটি ফোঁটাই ক্যান্থারিসের গুণে ভরা। প্রাকৃতিক গুণের জন্য চুলের পরিচর্যায় ক্যান্থারিসের আদর তো সেই ক্লিওপেট্রার যুগ থেকেই।
নিয়মিত ক্যান্থারাইডিন মাখলে শুধু চুলের গোড়াই শক্ত হয় না, চুল আরো ঘন ও কালো হয়ে ওঠে। এই তেল হালকা ও মোটেই চিটচিটে নয় বলে, ক্যান্থারাইডিন আপনাকে এনে দেয় চুল নিয়ে মনের মতন ফ্যাশান করার অবাধ স্বাধীনতা।
ক্যান্থারাইডিন
লাইট হেয়ার অয়েল
স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চুলের জন্য,
ফ্যাশানদুরস্ত চুলের জন্য।
বেঙ্গল কেমিক্যাল
(ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ)
CLARION C-BCPC-1

ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইটে তোলা
পরমসুন্দর যায়না ভোলা

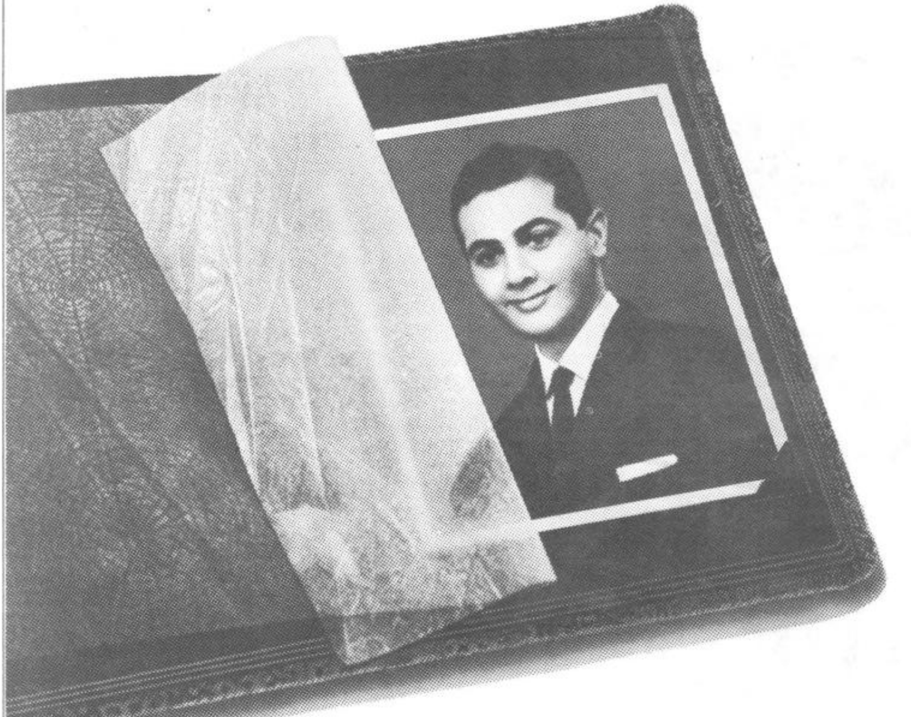

বাবা! স্মার্ট, ঝকমকে চেহারা।
প্রথম স্যুট পরে তোলা ছবি, কত কাল আগের ছবি।
ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইটের ছবি, যেন চিরতরে,
অম্লান ছবিটি রাখে যে ধরে।
স্মৃতির মণিকোঠায়, চিরকাল উজ্জ্বল রয়।
আমার কল্পনায় আসে, বাবার সম্ভ্রান্ত চেহারাটি ভাসে।

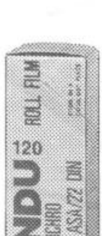


INDU

ইন্দু ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট ফিল্ম
রাখে ধরে, চিরতরে।

হিন্দুস্তান ফটো ফিল্মস ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী লিমিটেড

১২

নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক ওয়াল্টার হ্যাডলির পুত্র রিচার্ড হ্যাডলি টেস্ট ক্রিকেটে ৪০০ উইকেট নিয়ে এক অসাধারণ কীর্তি স্থাপন করেছেন। বস্তুত, ৪০০ উইকেটেই তিনি থেমে নেই। তাঁর লক্ষ্য, ৫০০ উইকেট। এবারের প্রচ্ছদকাহিনীতে হ্যাডলির ঘটনাবহুল ক্রিকেট-জীবনের কথা আলোচনা করা হল। তিনি কবে প্রথম টেস্ট খেললেন, তার আগে কীভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন নির্বাচকদের, ব্যাটিংয়েও কবে থেকে হয়ে উঠলেন ভয়ঙ্কর—আলোচনা করা হয়েছে এসব তথ্য। হ্যাডলির আরও তিন ভাই ক্রিকেটার। তাঁর স্ত্রী কারেনও মিডিয়াম পেসার। হ্যাডলির জীবনকথার পাশাপাশি তাঁদের ক্রিকেট-পরিবারের কথাও জানা যাবে প্রচ্ছদকাহিনীতে। সঙ্গে প্রচুর পরিসংখ্যান।

৭

সমুদ্রের অন্তত ৬০০ ফুট নীচে হঠাৎ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন মেল ফিশার। বহু বছর আগে সামুদ্রিক ঝড়ে নিশ্চিহ্ন 'আটোশা' নামের একটি জাহাজের ধ্বংসাবশেষ তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। ওই জাহাজে ছিল প্রচুর ধনরত্ন। গুপ্তধনের খোঁজে মেল ফিশারের মতো বহু মানুষ এখনও ঘুরে বেড়ান। গুপ্তধন আবিষ্কারের প্রতিটি কাহিনীই রোমাঞ্চকর।

৪৮

মেয়েদের দাবায় বিশ্বচ্যাম্পিয়ান মায়া চিবুরদানিজ কিছুদিন আগে কলকাতায় খেলে গেলেন। কলকাতা তাঁর ভাল লেগেছে। এই শহরেই তিনি তাঁর জন্মদিন পালন করলেন। মায়ার একান্ত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এবার প্রকাশিত হল একটি নিবন্ধ। মায়া শুধু বিশ্বচ্যাম্পিয়ান দাবাড়ুই নন, তিনি নামকরা চিকিৎসক। লেখাপড়া ও খেলাধুলো—দুটোকেই তিনি সমান গুরুত্ব দিয়েছেন।

## ৫৩

কম্পিউটার হল এক যন্ত্রসমষ্টি। এর একটি যন্ত্র তথ্য সংগ্রহ করে। সংগৃহীত সমস্ত তথ্য কম্পিউটার সঞ্চয় করে রাখে 'স্মৃতি' নামের এক অংশে। যে-কোনও তথ্যই প্রথমে এসে জমা হয় এই অংশে। কম্পিউটারের স্মৃতির সঙ্গে মানুষের স্মৃতির প্রায় কোনও মিল নেই। কম্পিউটার তথ্যগুলি নিয়ে কীভাবে কাজ করবে, তা তাকে শিখিয়ে দিতে হয়। শেখানোর কাজটি করা হয় কিছু সহজ নির্দেশের সাহায্যে। কম্পিউটারকে কীভাবে কাজে লাগাতে হবে সে-সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কিছু পরামর্শ দেওয়া হবে ধারাবাহিক রচনা

'কম্পিউটারের ভাষা'-য়। যে কোনও কাজ কম্পিউটারকে দিয়ে করাতে হলে তা তাকে আগে থেকেই শিখিয়ে দিতে হয়। না শেখালে কোনও কাজই সে করতে পারে না। কম্পিউটারকে সঠিকভাবে শিখিয়ে দিতে পারলে বহু কাজই সে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় করে ফেলে। আধুনিক জীবনের নিত্যসঙ্গী এখন কম্পিউটার।

### ■ আগামী সংখ্যায় ■

গৌতম চক্রবর্তীর প্রচ্ছদকাহিনী
**কল্পবিজ্ঞানের রোমাঞ্চ**

অসীমরতন ঘোষের ধারাবাহিক নিবন্ধ
**কম্পিউটারের ভাষা**

আনন্দ বাগচীর সম্পূর্ণ উপন্যাস (শেষাংশ)
**রহস্যের আলোছায়া**

আইজাক আসিমভের কল্পবিজ্ঞানের গল্প
**রোবি**

রঞ্জন ভাদুড়ীর গল্প
**নিশুত রাতের অ্যাডভেঞ্চার**

২২ ফাল্গুন ১৩৯৬ □ ৭ মার্চ ১৯৯০
১৫ বর্ষ ২৩ সংখ্যা

# আনন্দমেলা


সম্পূর্ণ উপন্যাস (প্রথমাংশ)

**রহস্যের আলোছায়া** আনন্দ বাগচী ৬০

গল্প

**সিংহাসনের উত্তরাধিকার** চিত্রা দেব ৩২
**জাদু-সিন্দুক** কমল চক্রবর্তী ৩৫

প্রচ্ছদকাহিনী

**নায়ক হ্যাডলি** তানাজি সেনগুপ্ত ১২
**আশ্চর্য এক ক্রিকেট পরিবার** আশিস উপাধ্যায় ১৪

ধারাবাহিক উপন্যাস

**উদাসী রাজকুমার** সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২৫
**সোনার গণপতি হিরের চোখ** ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ৭৮

বিশ্ববিচিত্রা

**হারানো রত্নের খোঁজে** গৌতম চক্রবর্তী ৭

কমিকস

টারজান ৩১, গাবলু ৪১, রোভার্সের রয় ৫১, টিনটিন ৭১, ব্যাটম্যান ৭৩

টাকাকড়ি

**দেশে-দেশে টাকার আবির্ভাব**···
ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২৩

কবিতা

**দোলের খেলা** রাখাল বিশ্বাস ৭০

প্রযুক্তিবিজ্ঞান

**কম্পিউটারের ভাষা** অসীমরতন ঘোষ ৫৩

কেরিয়ার গাইড

**কম্পানি সেক্রেটারি হতে হলে** অমর দাশ ৭৬

খেলাধুলো

**রঙিন পোস্টার : রিচার্ড হ্যাডলি** ৪২
**মহাকাশ যুগের খেলা স্টার শট** তন্ময় চট্টোপাধ্যায় ৪৪
**খেলার খবর** ৪৭
**টেনিসে যেমন গ্রাফ, দাবায় তেমনই মায়া**
মানস চক্রবর্তী ৪৮
**মাঝমাঠের লড়াই** গৌতম সরকার ৫০

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিচাপাটি ৬, আঁকিবুকি ৮, হাসিখুশি ৮, বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে ১০, কুইজ ২৮, কিওকুশিন কারাটের ক্লাস ৪৯, আকাশ চেনো ৫৯, ইলেকট্রনিক্স গেম ৬৪, আকাশে ওড়ার কথা ৬৮, ক্যাম্পাস ৭৫, শব্দসন্ধান ৮০, বইয়ের খবর ৮১, নানারকম ৮২

প্রচ্ছদ

বিমল দাস


**সহকারী সম্পাদক** □ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়
**সম্পাদকীয় বিভাগ** □ সিদ্ধেশ্বরনাথ ভার্মা, সাধনা মুখোপাধ্যায়, শ্যামলকান্তি দাশ, রতনতনু ঘাটী, বাদল ঘোষ, বিমলকুমার পাল
**শিল্প নির্দেশক** □ অমিয় ভট্টাচার্য
**সহযোগী** □ অসিত পাল, প্রবীর সেন

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। অস্থায়ী সম্পাদক অভীক সরকার। দাম সাত টাকা। বিমান মাশুল ত্রিপুরা ২০ পয়সা উত্তর পূর্ব ভারত ৩০ পয়সা


## ছবি-ছড়া আর গল্পে ভরা

**উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী**
● টুনটুনির গল্প ৩·০০
**সুকুমার রায়**
● খাগড়াই ৪·০০
● পাগলা দাশু ১০·০০
**যোগীন্দ্রনাথ সরকার**
● আষাঢ়ে স্বপ্ন বা জানোয়ারের মেলা ৩·০০
**ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত**
● শ্যামলা দীঘির ঈশান কোণে ৫·০০
**প্রেমেন্দ্র মিত্র**
● কুমির সাহেব ৩·০০
**লীলা মজুমদার**
● জানোয়ার ৪·০০
**শৈল চক্রবর্তী**
● ছড়ার দেশে টুলটুলি ৬·০০
**মীরা বালসুব্রমনিয়ন**
● তিনটি তামার পয়সা ৭·০০
**গৌরী ধর্মপাল**
● চোদ্দ পিদিম ৬·০০
**নির্মলেন্দু গৌতম**
● বনজঙ্গল ৭·০০
**বুদ্ধদেব গুহ**
● মি হাবিজাবি ৬·০০
**চিত্তরঞ্জন মাইতি**
● ছড়া ছবিতে যানবাহন ৪·৫০

## শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ

৩২ এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলি-৯

চিঠিচাপাটি

## নতুন অঙ্গসজ্জা সুন্দর

আমি শৈশব থেকেই 'আনন্দমেলা' পত্রিকার একজন মনোযোগী পাঠক। ৭ ফেব্রুয়ারি সংখ্যাটি অন্য সংখ্যাগুলোর মতো খুবই আকর্ষক হয়েছে। এই সংখ্যাটি নতুন এবং সুন্দর হয়েছে। 'ব্যাটম্যান' প্রচ্ছদকাহিনীটি খুবই আগ্রহের সঙ্গে পড়লাম। 'স্কুলের কম্পিউটার' লেখাটির জন্য আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। লেখাটি আমার খুব কাজে লাগবে। নতুন অঙ্গসজ্জায় আনন্দমেলা সুন্দর।

*অরিজিৎ ঘোষ*
*বেলেঘাটা*

আমার প্রিয় পত্রিকা আনন্দমেলা'র প্রতিটি বিষয় আমি খুব মন দিয়ে পড়ি। ৭ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার

প্রচ্ছদকাহিনী 'ব্যাটম্যান' পড়ে অনেক তথ্য জানতে পারলাম। আমাদের প্রিয় পত্রিকাকে আরও আকর্ষক ও সুন্দর করে তোলার জন্য ধন্যবাদ। 'হিম্যান' নিয়ে যদি কোনও প্রচ্ছদকাহিনী প্রকাশ করেন, খুব ভাল হয়।

*শান্তনু দত্ত*
*ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর*
*শাশ্বতী দত্ত*
*পর্ণশ্রী, বেহালা*

আনন্দমেলা ৭ ফেব্রুয়ারি সংখ্যাটি খুবই মূল্যবান সংখ্যা। প্রতিটি সংখ্যার জন্য আমি উন্মুখ হয়ে থাকি। এই সংখ্যার প্রচ্ছদকাহিনী ব্যাটম্যান পড়ে অনেক তথ্য জানতে পারলাম। এই সঙ্গে ব্যাটম্যানের যেসব ছবি ছাপা হয়েছে তাও সুন্দর। নতুন অঙ্গসজ্জা দেখে আমাদের প্রিয় পত্রিকাকে আরও আপন করে নিলাম।

*কমল সিওয়া*
*রামকুমার লামা*
*কালচিনি ইউনিয়ন অ্যাকাডেমি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি*

## চিত্তাকর্ষক প্রচ্ছদকাহিনী বইমেলা

প্রতিটি সংখ্যা আনন্দমেলা'ই আমার মনের মতো হয়। ২৪ জানুয়ারি সংখ্যার প্রচ্ছদকাহিনী 'বইমেলা' পড়ে খুব ভাল লাগল। বিশেষ করে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ও সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের লেখা দুটি খুব ভাল হয়েছে। বিকাশ বসুর লেখা 'বইয়ের কথা' থেকেও অনেক অজানা তথ্য জানতে পারলাম। আশা করি ভবিষ্যতে এরকম চিত্তাকর্ষক প্রচ্ছদকাহিনী আরও পাব।

*রবীন্দ্র আগরওয়াল*
*বাঁকুড়া জিলা স্কুল, বাঁকুড়া*
*ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী*
*ভাইজাগ, অন্ধ্রপ্রদেশ*

বইমেলা প্রচ্ছদকাহিনী ২৪ জানুয়ারি সংখ্যায় পড়লাম। খুব ভাল লাগল। বইমেলা পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক সাড়া ফেলে প্রতি বছরই। এই সংখ্যায় আনন্দমেলা'র প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদচিত্র দেখলাম। তবে ছবিটি আরও বড় এবং রঙিন হলে ভাল হত। প্রথম সংখ্যা প্রকাশের তারিখ জানালে আরও ভাল হত।

*দেবর্ষি দাস*
*তেজপুর, অসম*

অনেকদিন থেকেই আনন্দমেলা পড়ে আসছি। ২৪ জানুয়ারি সংখ্যার প্রচ্ছদকাহিনী বইমেলা খুব ভাল লাগল। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, বিকাশ বসু ও অণিমা মুখোপাধ্যায়ের লেখাগুলি খুবই উল্লেখযোগ্য। সাধনা মুখোপাধ্যায় ও রতনতনু ঘাটীর কবিতা দুটিও খুব ভাল লাগল। হরেকরকম মেলার মধ্যে বইমেলাও যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে। বইমেলা সম্পর্কে লেখকদের চিন্তাভাবনা জানতে পারলাম।

*রাজকুমার সরকার*
*মোক, ধানবাদ, বিহার*
*সমিত ঘোষ*
*বালুরঘাট*

আনন্দমেলা ২৪ জানুয়ারি সংখ্যার প্রচ্ছদকাহিনী বইমেলা পড়ে বই এবং বইমেলা সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পারলাম। কোনও একটি সংখ্যায় কিশোরদের ভাল লাগবে এমন কিছু বইয়ের নাম যদি প্রকাশ করেন তা হলে খুশি হব।

*অম্লান সরকার*
*ষষ্ঠ শ্রেণী, কানাইলাল বিদ্যামন্দির*

## ম্যামথরা কেন লোপ পেল

২৪ জানুয়ারি সংখ্যা 'আনন্দমেলায়' শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বিশ্ববিচিত্রা' বিভাগে 'ম্যামথরা কেন লোপ পেল' লেখাটি পড়ে ভাল লাগল। কিন্তু একটি প্রশ্ন মনে হয়েছে আমার, ম্যামথদের নুনের কী দরকার ছিল? আজকের আফ্রিকার

*লেনিনগ্রাদ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে এই উলি ম্যামথ*

হাতিরা কেন নুনের খনির চারপাশে বসবাস করতে ভালবাসত, তা জানার আগ্রহ আমার।

*অর্পিতা সরকার*
*দীপঙ্কর বসাক*
*রানাঘাট, নদীয়া*

## টেবল-টপ ক্রিকেট

আনন্দমেলা আমাদের খুব ভাল লাগে। ৭ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় 'টেবল টপ ক্রিকেট' খেলাটি দেখে খুব ভাল লাগল। তাই খেলাটি খেলে খুব আনন্দ পেলাম। আমাদের মতো বয়সের ছেলেদের এই খেলাটি বুঝতে কোনও অসুবিধে হয়নি। তবে খেলাটি বাংলায় প্রকাশিত হলে আরও ভাল হত।

*অভিজিৎ দে, আশিস দে*
*ছাতনা, বাঁকুড়া*

# হারানো রত্নের খোঁজে

পৃথিবীর বুকে লুকিয়ে-থাকা অজস্র মণি-মাণিক্যের খোঁজে আজও চলে রোমাঞ্চকর নানা অভিযান। এরকম কয়েকটি অভিযানের কথা জানিয়েছেন **গৌতম চক্রবর্তী**

আচমকা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন মেল ফিশার। নিজের চোখকেও তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না!

এই মুহূর্তে, মেল ফিশার সমুদ্রের অন্তত ৬০০ ফুট নীচে। তাঁর পায়ের কাছে একটা জাহাজের ধ্বংসাবশেষ! ১৬২২ সালে, সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল স্প্যানিশ জাহাজ আটোশা। এই কি সেই আটোশা? যদি তা-ই হয়, তা হলে···

মেল ফিশার এখন তাঁর হৃৎপিণ্ডের প্রতিটি শব্দ স্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছেন। ইতিহাস বলে, আটোশা যেদিন ডুবে গিয়েছিল সেদিন তার পেটের মধ্যে ছিল তাল-তাল সোনা, রুপো, পান্না আর হিরে। এ কি গল্প? হৃৎপিণ্ডের দপদপানি শুনতে-শুনতেই মেল ফিশার মনঃস্থির করে ফেললেন। তিনি এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ঢুকলেন।

১৯৮৫ সালের ২০ জুলাই মেল ফিশার সত্যিই তাঁর স্বপ্নকে হাতের মুঠোয় ধরেছিলেন! বুকের ভেতরে তাল-তাল সোনা, রুপো, পান্না নিয়ে আটোশা সত্যিই এতদিন সমুদ্রের তলদেশে নিশ্চুপ হয়ে পড়ে ছিল। সাড়ে তিনশো বছরেরও বেশি। মেল ফিশার তাকে আবার নিয়ে এলেন পৃথিবীর আলোয়।

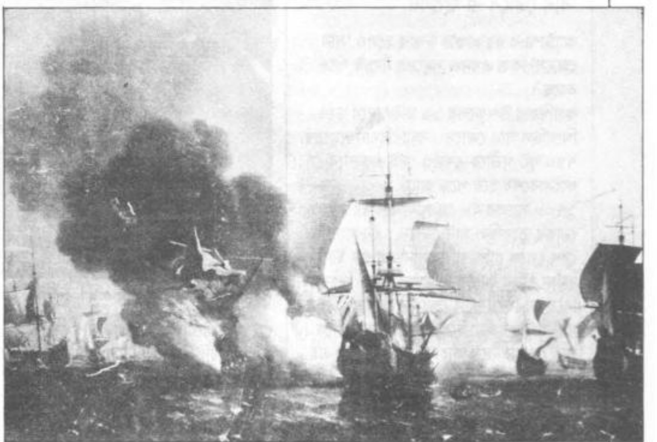

*তাল তাল সোনা আর হিরে-জহরত নিয়ে এভাবেই তলিয়ে গিয়েছিল 'সান জোসে' জাহাজ*

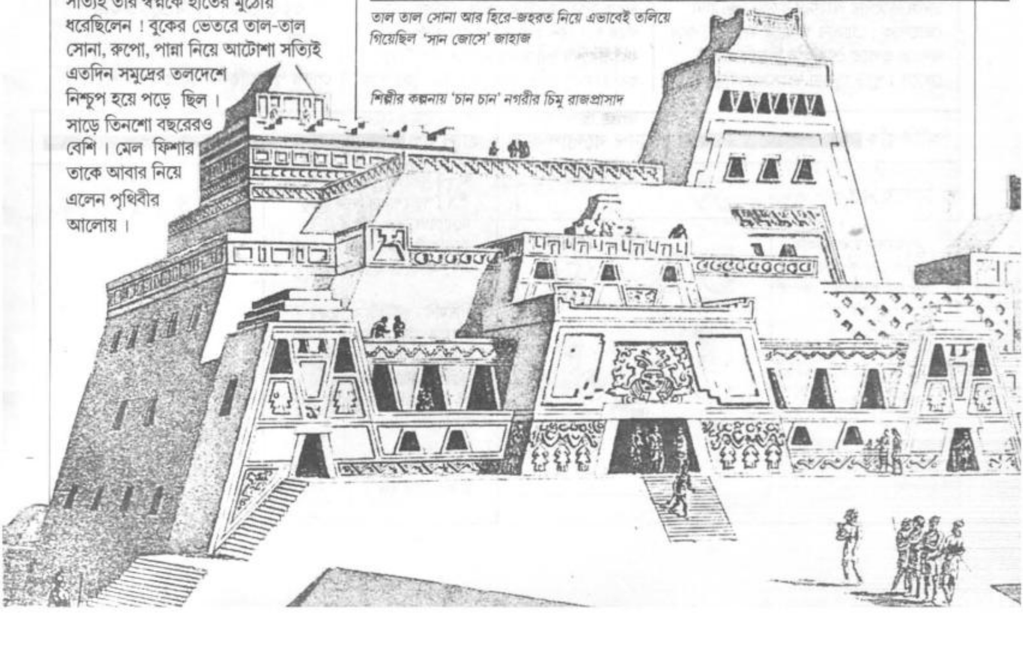

*শিল্পীর কল্পনায় 'চান চান' নগরীর চিমু রাজপ্রাসাদ*

শুধুমাত্র মেল ফিশার নন, গুপ্তধনের খোঁজে আজও ঘুরে বেড়ান হাজার হাজার মানুষ। ক্যালিফোর্নিয়া, পেরু বা স্পেন, সর্বত্র এখনও মানুষের চোখের আড়ালে নাকি রয়ে গেছে অজস্র গুপ্তধন। প্রতিটি গুপ্তধনের কাহিনীই সমানভাবে বিচিত্র, সমানভাবে রোমাঞ্চকর। কিং সলোমন্‌স মাইনস বা টম সইয়ারের যুগ আজও শেষ হয়নি, গুপ্তধনের খোঁজে এখনও পৃথিবীর দিকে দিকে চলছে বিচিত্র সব অ্যাডভেঞ্চার।

## 'সান জোসে'-র গুপ্তধন

আটোশা-র রত্নভাণ্ডার উদ্ধার হলেও 'সান জোসে' কিন্তু এখনও সমুদ্রের নীচেই পড়ে আছে।

কলম্বিয়ার উপকূলের ১৬ মাইল দূরে ডুবে গিয়েছিল সান জোসে। ক্যারিবিয়ান সমুদ্রের ৭৪০ ফুট গভীরে এখনও সেই একভাবে সে ধ্বংসাবশেষ হয়ে পড়ে আছে।

১৭০৮ সালের ২৮ মে পানামা বন্দর থেকে নোঙর তুলেছিল সান জোসে। ইনকাদের দেশ থেকে রাশি-রাশি সোনা-রুপোর ইট, দুর্মূল্য রঙিন কাচের বাতিদান, হিরে, জহরত নিয়ে সে ফিরে যাবে স্পেনের বন্দরে। এইসব মণি-মাণিক্য জমা হবে স্পেনীয় রাজকোষে! সান জোসে নামে জাহাজটি শেষ অবধি এই গুরুদায়িত্ব পালন করতে পারেনি।

১৭০৮ সালের ৮ জুন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় মাঝসমুদ্রে ইংরেজ নৌবাহিনীর কমান্ডার চার্লস ওয়েগার আক্রমণ করেছিলেন সান জোসেকে। গোলার আঘাতে দাউ-দাউ করে জ্বলতে-জ্বলতে শেষ হয়ে গিয়েছিল সান জোসে। পুড়ে যাওয়া ধ্বংসাবশেষটুকু নিয়েই

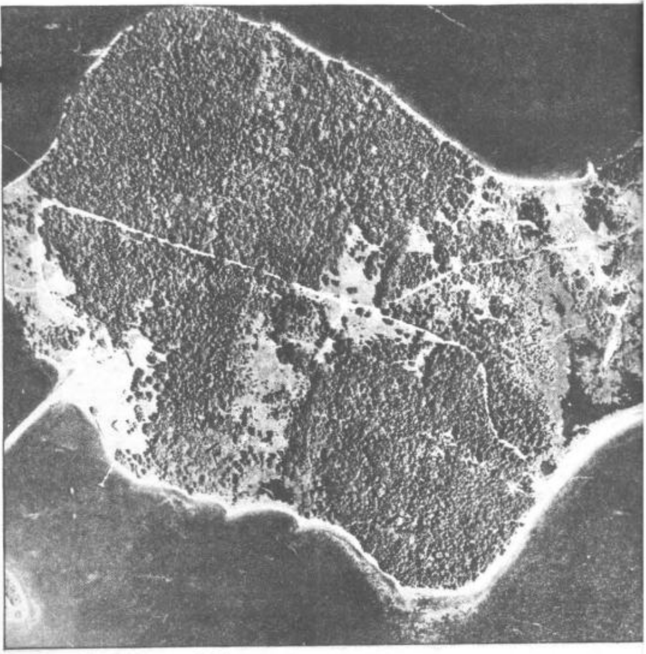

*নোভা স্কটিয়া দ্বীপ। বৃত্তের মধ্যে 'মানি পিট'-এর অবস্থান দেখানো হয়েছে*

সে ডুবে গিয়েছিল সমুদ্রে। আর সেইসঙ্গে ডুবে গিয়েছিল ৬০০ নাবিক আর রাজকোষের উদ্দেশে পাঠানো লক্ষ-লক্ষ হিরে-জহরত, মণি-মাণিক্য।

কলম্বিয়া ও মার্কিন সরকারের নেতৃত্বে আজও চলছে সান জোসে-র খোঁজ। ধারণা, এতে খরচ হবে ত্রিশ লক্ষ ডলার। একটা ধ্বংসাবশেষ খোঁজার জন্য ত্রিশ লক্ষ ডলার হয়তো বড্ড বেশি খরচ, কিন্তু সান জোসেকে যদি সত্যি-সত্যি খুঁজে পাওয়া যায় তা হলে সান জোসে-র ভেতরে যে হিরে-জহরত লুকিয়ে আছে, আজকের বাজারে তার দাম দশ কোটি ডলার!

## যে রত্নভাণ্ডার পিরামিডকেও হার মানায়

পেরুর পুরাতাত্ত্বিকরা জোর কদমে শাবল ও

---

আঁকিবুকি — রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

### মিলিয়ে নিও

এবারে দ্যাখো আঁকার পাতায় বৃত্ত এবং ত্রিভুজের ছড়াছড়ি। দেখেই মনে হচ্ছে, বুঝি অনেক পাখি লুকিয়ে আছে বৃত্ত এবং ত্রিভুজগুলির মধ্যে। আসলে কিন্তু একটিও পাখির কথা ভাবিনি আমি। আগে তোমরা ভাবো। তারপর মিলিয়ে নিও আগামী সংখ্যায়।

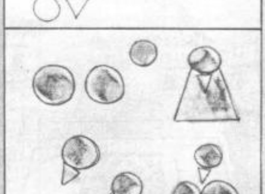

---

হাসিখুশি

মা বললেন, "বুবুন, তোমাকে পড়াশোনার দিকে একটু মনোযোগ দিতে হবে।"
বুবুন বলল, "মা, আমি তো সর্বদা একটু মনোযোগই দিয়ে থাকি।"

দিদিমণি : ফুটকিটা কাগজের কোথায় আঁকলে ঝুমা ?
ঝুমা : ওটা এখনও কাগজে আঁকিনি, ওটা যে আমার পেনসিলের শিসের ওপরই লেগে রয়েছে।

দিদিমণি : আজ তোমার সব অঙ্ক কী করে ঠিক হল ?

রাজু : আজ যে অঙ্ক করবার সময় বাবা আমাকে একটুও সাহায্য করেননি।

দিদিমণি : বলতে পারো কোন মাসে আঠাশ দিন আছে ?
বুবুন : সব মাসে।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

## স্প্যানিশ জাহাজ 'আটোশা'

১৬২২ খ্রিস্টাব্দে সামুদ্রিক ঝড়ে ডুবে গিয়েছিল তাল-তাল সোনা, রুপো নিয়ে। ইনকাদের দেশ থেকে রাশি-রাশি সোনা-রুপোর ইট, হিরে, জহরত নিয়ে 'সান জোসে' নামে জাহাজটি ফিরে যাচ্ছিল স্পেনের বন্দরে, সেও তার কথা রাখতে পারেনি। 'চান চান' নগরীর ধ্বংসাবশেষের ভেতরে লুকিয়ে আছে গোপন রত্নভাণ্ডার।

গাঁইতি নিয়ে কাজে নেমে পড়েছেন। তাঁরা 'চান চান' নগরীর ধ্বংসাবশেষ খুঁজে বার করবেন। এবং চান চান নগরীর রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের অভ্যন্তরে যা লুকিয়ে আছে তা নাকি পিরামিডের গোপন রত্নভাণ্ডারের জলুসকেও তাক লাগিয়ে দিতে পারে!

১৫৭৬ সালের স্পেনীয় রাজকোষের খাতা বলছে, গারসিয়া গুইতেরেজ নামে এক স্পেনীয় বণিক রাজাকে ন'শো পাউন্ড সোনা উপহার দিচ্ছে। সোনায় তৈরি বিভিন্ন জিনিসপত্র। সবচেয়ে অদ্ভুত, সোনায় তৈরি কয়েকটি ছোট-ছোট মাছ। এদের চোখ সবুজ পান্না দিয়ে তৈরি। গুইতেরেজ এক ইনকা গ্রামপ্রধানের সঙ্গে চান চান নগরীর রাজপ্রাসাদের সমাধিকক্ষে পৌঁছেছিল। সেখান থেকে এগুলি নিয়ে এসেছে। পেরুর উপকূল-শহর ট্রুজিলো থেকে মাত্র দু' মাইল দূরে আবিষ্কৃত হয়েছে চান চান নগরীর ধ্বংসাবশেষ।

## মানি পিট-এর রহস্য

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নোভা স্কটিয়া দ্বীপের রহস্যময় ওক গাছের নীচে কী আছে? নোভা স্কটিয়া একটি জনমানবশূন্য দ্বীপ, ওক ও পাইনগাছে ভর্তি। এই দ্বীপে কেউ যায় না, স্থানীয় উপকথায় বলা হয় এটি 'সাক্ষাৎ শয়তানের রাজ্য'! ১৭৯৫ সালের অক্টোবর মাসের এক শীতের সকালে এই দ্বীপে একটি নৌকো এসে থামল। নৌকো থেকে নেমে এল তিনজন যুবক, এরা কাঠুরিয়া। অসমসাহসী এই তিন যুবক এখানে কাঠ কাটতে এসেছে!

ঘুরতে-ঘুরতে এই তিন যুবকের চোখে পড়ে একটি বিশাল ওকগাছ। গাছের একটি ডাল কাটা, মনে হয় কিছুক্ষণ আগে কেউ এই গাছটি কাটছিল। গাছের কাণ্ডটা ভেজা, ফাঁপা ধরনের, মনে হয়, গাছটার নীচে গর্ত করে কেউ কিছু দুর্মূল্য বস্তু লুকিয়ে রেখেছে। অসমসাহসী সেই তিনজন যুবক পরের দিনই শাবল আর গাঁইতি নিয়ে ফিরে এল। সেই রহস্যময় ওকগাছের নীচে কী আছে, তারা দেখতে চায়।

১৯৭২ সালে একটি দল আধুনিক প্রথায় 'মানি পিট'-এর ২৩০ ফুট নীচে পৌঁছয়। জলের নীচে ছবি তুলে দেখা যায় কয়েক খণ্ড কাঠ আর একটা কঙ্কালের হাত! এর জন্য এত?

না, মানি পিট রহস্যের এখনও সমাধান হয়নি। এখন অবধি, এর গহ্বরে প্রাণ হারিয়েছেন ছ'জন। স্থানীয় প্রবাদ, সাতজনের মৃত্যু হলে তবেই জানা যাবে রহস্য। মানি পিট-এর রহস্য কী? কেউ বলে ক্যাপ্টেন কিডের গুপ্তধন, কেউ বলছে মেরি আঁতোয়ানেত-এর স্বর্ণালঙ্কার। সব মিলিয়ে মানি পিট-এর গুপ্তধন আজও এক রহস্য!

## 'সেন্ট্রাল আমেরিকা'-র খোঁজে

দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে লি স্পেন্দ একটা ছোট জাহাজ খুঁজছেন।

জাহাজের নাম 'সেন্ট্রাল আমেরিকা'। সালটা ১৮৫৭। সময়টা আমেরিকার দুঃসাহসিক অভিযাত্রীদের যুগ। ভাগ্যান্বেষীরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে, সেখানে রয়েছে অজস্র সোনার খনি। নিজের সাহস, বুদ্ধি আর পরিশ্রম দিয়ে একটা দল গঠন করে চলে যেতে হবে খনির দিকে, সফল হয়ে ফিরতে পারলে আর কোনও চিন্তা নেই।

এরকম একটা দল সফল হয়ে ফিরে আসছিল।

এই দলের লোকেরা সানফ্রানসিসকোর বন্দর থেকে স্টিমার ছেড়েছে, এখন তারা জলপথে নিউ ইয়র্কে ফিরে যাবে। একটা ছোট জাহাজ, তার নাম সেন্ট্রাল আমেরিকা। এইসব সফল মানুষ ও তাদের সঙ্গের আড়াই টন সোনাকে সেন্ট্রাল আমেরিকা নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে দেবে।

১৮৫৭ সালের ১০ সেপ্টেম্বর সকাল থেকে শুরু হল ঝড়ের তাণ্ডব।

ক্যালিফোর্নিয়ার খনি থেকে তুলে আনা আড়াই টন সোনা এভাবেই জলের নীচে হারিয়ে গেল। গুপ্তধনের সন্ধানে আজও সেন্ট্রাল আমেরিকার তল্লাশ করেন অসংখ্য অভিযাত্রী। *ফোটো : 'লাইফ' পত্রিকার সৌজন্যে*


আনন্দমেলা

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলীর (১৯৫৬) ৮-ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হইল।

১। প্রকাশস্থান ৬ ও ৯, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০০১

২। প্রকাশকাল পাক্ষিক

৩। প্রকাশক ও মুদ্রাকর বিজিৎকুমার বসু, ভারতীয় নাগরিক, ৮, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০০১

৪। অস্থায়ী সম্পাদক অভীক সরকার, ভারতীয় নাগরিক, ৮, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০০১

৫। যে সকল ব্যক্তি এই সংবাদপত্রের মালিক এবং যাঁরা মোট মূলধনের এক শতাংশের অধিক অংশীদার বা শেয়ার গ্রহীতা, তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা।

(ক) মালিক আনন্দ বাজার পত্রিকা লিমিটেড, ৮, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০০১

(খ) মোট মূলধনের এক শতাংশেরও অধিক শেয়ার গ্রহীতা অলকা সরকার, অভীককুমার সরকার, অরুণকুমার সরকার, অর্দীপকুমার সরকার, অশিকুমার সরকার, নাবালক পুত্র অবিরকুমার সরকারের পক্ষে অরুণকুমার সরকার, ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০০১

আমি বিজিৎকুমার বসু এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

বিজিৎ কুমার বসু

১ মার্চ, ১৯৯০ প্রকাশক

**বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে**

## বিজনেস কার্ড কম্পিউটার

এক কথায় বলা যেতে পারে, এ যেন গোটা অফিসটাকে সঙ্গে বয়ে নিয়ে চলা । পশ্চিমের দেশে ভীষণ জনপ্রিয় ক্রেডিট কার্ডের মাপের আট কিলোবাইট তথ্য সঞ্চয়ের ক্ষমতাসম্পন্ন এক আধুনিক কম্পিউটার । যন্ত্রটিতে আট হাজারেরও বেশি অক্ষর বা চিহ্ন সঞ্চয় করে রাখা যেতে পারে । অর্থাৎ, পাঁচশোরও বেশি নাম-ঠিকানা-ফোন নম্বর । এ ছাড়া এতে সঞ্চয় করে রাখা যায় দরকারি নোট, অ্যাপয়েন্টমেন্ট । কোনও তথ্য দ্রুত খুঁজে পাওয়ার জন্য এতে

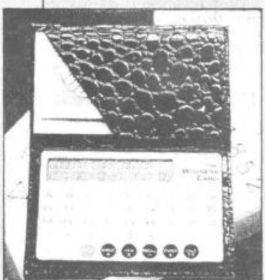

রয়েছে বিশেষ ধরনের অটোমেটিক সার্চ প্রোগ্রাম । আর উপরি পাওনা হিসেবে এর সঙ্গে রয়েছে একটি সম্পূর্ণ ক্যালকুলেটর ।

## গাড়ি চুরির হাত থেকে বাঁচাবে ইলেকট্রনিক্স

এই ইলেকট্রনিক যন্ত্রটির নাম সনিক সেন্ট্রি । স্রেফ প্লাগ গুঁজেই গাড়িতে লাগিয়ে দেওয়া যায় । আবার এক গাড়ি থেকে খুলে নিয়ে অন্য গাড়িতে লাগিয়ে দেওয়া যায় চোখের পলকে । অথচ কাজে মোটেই কম নয় । এর সঙ্গে লাগানো তার পাঁচ ফুট লম্বা হওয়ার ফলে গাড়ি যখন পার্ক করা থাকবে তখন এটা ড্যাশবোর্ডের ওপরে বা সিটে রেখে দেওয়া যাবে অনায়াসে । অন করা অবস্থায় এর মধ্যে লাল আলো জ্বলে দপদপ করে । কোনও ছিঁচকে চোর হয়তো জানলা দিয়ে এই আলো দেখেই সাবধান হয়ে যাবে । আর তা যদি না হয় তা হলে সে গাড়ির দরজা, বনেট বা ক্যারিয়ার খোলামাত্রই গাড়ির ভেতরে যে-আলো জ্বলে ওঠে সেই আলোই চালু করে দেবে ইলেকট্রনিক সনিক সেন্ট্রিকে । আর সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হয়ে যাবে তীব্র অ্যালার্ম—বাজবে একটানা এক মিনিট ধরে । কেবলমাত্র চাবি ঘোরালে তবেই থামবে এর 'চিৎকার' । গাড়ি চুরি বাঁচানো ছাড়াও বিপদে-আপদে সাহায্য করতে পারে এই যন্ত্রটি । যেমন, নির্জন রাস্তায় হঠাৎ গাড়ি খারাপ হয়েছে ? সনিক সেন্ট্রির বিশেষ বোতাম টিপে দিন । HELP শব্দটি ফুটে উঠবে লাল আলোর রেখায় । দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য জ্বলবে দপদপ করে ।

## জাদু-বিছানা

এ-যেন ঠিক জাদুকরের টুপির ভেতর থেকে একটা গোটা বিছানা হাজির করা । বাড়িতে অতিথি এলে কিংবা কোনও অভিযানে বেরিয়ে পড়লেও এই জাদু-বিছানা ব্যবহার করা যাবে সমানভাবে । কারণ এই বিছানা বা খাটিয়া অন্যান্য ক্যাম্প খাট বা স্টিল খাটিয়ার মতো আকারে বড়সড় বা ভারী নয়, অথচ বেশ মজবুত । এই বিছানা গুটিয়ে ফেললে এর মাপ দাঁড়ায় তিন ফুট লম্বা, তিন ইঞ্চি ব্যাসের একটা পাইপের মতো । অর্থাৎ, খুব সহজেই আলমারির কোণে বা গাড়ির ক্যারিয়ারে রাখা যায় । আবার পিঠে ঝুলিয়ে নেবার জন্য স্ট্র্যাপের ব্যবস্থাও আছে । কিন্তু খুলে মেলে ধরলেই এর মাপ দাঁড়াবে তিয়াত্তর ইঞ্চি লম্বা ও সাতাশ ইঞ্চি চওড়া । অর্থাৎ, ছ' ফুট লম্বা মানুষও আরামে ঘুমোতে পারবে এই খাটিয়ায় । আর এর ওজন বহনের ক্ষমতা পাঁচশো পাউণ্ড ! বিছানার ওপরটা নরম, অথচ মজবুত ক্যাম্বিসের কাপড় । কিন্তু এই কাপড়কে টান টান করে

পাঁচশো পাউণ্ড ওজন বহনের ক্ষমতা জুগিয়েছে ইস্পাতের তৈরি লম্বাটে ধরনের তিনটে পায়া । আর নমনীয়তা আনার জন্য রয়েছে ছ'টা ইস্পাতের স্প্রিং । পায়াগুলোর উচ্চতা দশ ইঞ্চি । ফলে ভিজে মাটিতে এই খাটিয়া পাততেও কোনও অসুবিধে নেই । 'হ্যান্ডি বেড' নামের এই 'গুণধর' বিছানার দাম মাত্র পঞ্চান্ন ডলার ।

**ঘটেছে এক আশ্চর্য ঘটনা । সবুজ-সাদা আলোর স**

## আকাশে আলোর খেলা

শীতকালে পৃথিবীর সুদূর উত্তরাঞ্চলে রাতের আকাশে খেলে বেড়ায় দিনের আলো । আমাদের অতি পরিচিত অরোরা বোরিয়ালিস । দিনরাত সেখানে তখন সবুজ-সাদা আলোর ঝলকানি । কিন্তু গত শীতে ঘটেছে এক আশ্চর্য ঘটনা ! সবুজ-সাদা আলোর সঙ্গে এসে মিশেছে লাল আলোর রেখা । আর তা দেখা যাচ্ছে দূর দক্ষিণে ফ্লোরিডা পর্যন্ত ।

ঘটনাটি ব্যাখ্যার আগে জেনে নেওয়া যাক অরোরা বোরিয়ালিস আর অরোরা অস্ট্রালিসের (দক্ষিণ গোলার্ধে অরোরা বোরিয়ালিসের প্রতিরূপ) বিশদ পরিচয় । যখন সূর্যের ফুলকির থেকে তড়িৎস্পৃষ্ট অসংখ্য কণা ছড়িয়ে পড়ে মহাকাশে, তখনই এরা দেখা দেয় । এক সময় এই কণাগুলি এসে পড়ে পৃথিবীকে ঘিরে থাকা চুম্বক আস্তরণে'র সামনে । আর তারপর জমা হয় মেরু অঞ্চলের চারপাশে । সেখানে জমা হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই তাদের ধাক্কা লাগে বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্তরে ভাসমান অণু-পরমাণুর সঙ্গে ।

ঘর্ষণের ফলেই ঝলসে ওঠে আলো । যদিও সারা বছর এরকম হতে থাকে তা হলেও অরোরাদের উজ্জ্বলভাবে দেখা যায় শুধুমাত্র মেরুপ্রদেশের দীর্ঘ শীতের রাতে । কিন্তু গত শীতে লাল আলোর এই বাহারি আবির্ভাবের জন্য দায়ী 'সোলার ম্যাক্সিমাম' নামের একটি বিশেষ প্রক্রিয়া, যা কিনা ঘটে থাকে প্রতি এগারো বছর অন্তর । এ-ক্ষেত্রে সূর্যের উৎক্ষিপ্ত আলোর

## সৌরশক্তিতে জ্বলবে নিরাপত্তা বাতি

রাতের আঁধারে যদি খুটখাট শব্দ কানে আসে, তা হলে দুশ্চিন্তার কথা। এই দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই দিতে পারে 'সোলার সেন্টিনেল'। সৌরশক্তিচালিত এই হ্যালোজেন নিরাপত্তা বাতির আলোর তীব্রতা আটশো ক্যান্ডেলপাওয়ার। খুব সহজেই বাড়ির যে-কোনও জায়গায় এটি লাগিয়ে নেওয়া যায়। এই বাতির পঁচাত্তর ফুটের মধ্যে যদি নড়াচড়া অথবা চলাফেরার শব্দ হয় তা হলে প্যাসিভ ইনফ্রারেড মোশন ডিটেক্টর এই নিরাপত্তা বাতি জ্বালিয়ে দেবে। নড়াচড়ার শব্দ যতক্ষণ স্থায়ী হবে ততক্ষণ বাতি জ্বলতেই থাকবে। আর তা না হলে একটানা তিন মিনিট জ্বলে থাকার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিভে যাবে 'সোলার সেন্টিনেল'। এর ভেতরের রিচার্জেবল ব্যাটারিকে একটি সৌর প্যানেল সারা দিন ধরে চার্জ করে চলে। ফলে বাড়তি বিদ্যুৎ খরচ একেবারেই নেই। সোলার সেন্টিনেল -এর দাম একশো চল্লিশ ডলার।

## ফারাও আমলের ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র

আমেন্‌নাখ্‌ট,— মিশরের বিখ্যাত ফারাও চতুর্থ র‍্যামসেসের রাজত্বকালের এক পণ্ডিত। খ্রিঃ পূঃ ১১৫০ সালে তিনি তৈরি করেন একটি ভূ-তাত্ত্বিক মানচিত্র। টোলেডো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতাত্ত্বিকদের মতে সেই মানচিত্রটি 'বাস্তবের সঙ্গে সুন্দর ও বিস্ময়করভাবে মিলে যায়।' তথ্য অনুসারে, এই মানচিত্রটিই পৃথিবীর প্রাচীনতম ভূ-তাত্ত্বিক মানচিত্র। মূল ছবিটি ষোলো ইঞ্চি চওড়া ও ছ' ফুট লম্বা (যদিও ভেতর থেকে কয়েকটি টুকরো এবং ধারের একটি অংশ বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে না) একটি প্যাপিরাসের গায়ে আঁকা।

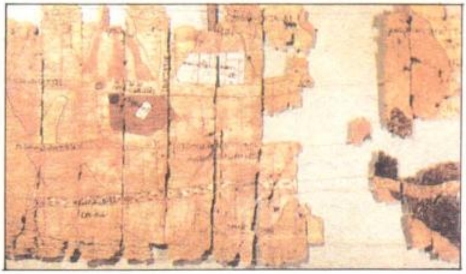

এটি প্রথম পাওয়া যায় ১৮২০ সালের প্রথম দিকে, মিশরের 'সম্রাটদের উপত্যকা' দের এল-মেদিনা'র ধ্বংসাবশেষে। এর স্থান হয় ইতালির টুরিন শহরে মিশরীয় জাদুঘরে। তখন থেকেই একে ঘিরে মিশর-বিশেষজ্ঞদের অসীম আগ্রহ আর কৌতূহল। বহুদিন অবধি ভূ-তাত্ত্বিকরা মানচিত্রটিকে বাস্তবের সঙ্গে মেলাতে তৎপর হননি। তারপর একদিন জেম্‌স্‌ এ· হ্যারেল এবং ভি· ম্যাক্স ব্রডিন একটি প্রতিলিপি নিয়ে হাজির হলেন মিশরের পূর্ব মরুভূমিতে। সেখানে তাঁরা আবিষ্কার করলেন যে, ওয়াদি হাম্‌মামাত অঞ্চলের ভূ-গর্ভস্থ পাথরের অবস্থান, আকৃতি, এমনকী তাদের রং-ও নিখুঁতভাবে মিলে গেছে মানচিত্রের সঙ্গে।

মানচিত্রটি শুধু ভূ-তত্ত্বের ছবিতেই থেমে থাকেনি। আমেন্‌নাখ্‌ট সেখানে তৎকালীন ইতিহাসের কিছু মূল্যবান টীকাও জুড়ে দিয়েছেন। এর মাধ্যমে জানা গেছে, চতুর্থ র‍্যামসেস্‌ ওয়াদি হাম্‌মামাতে অভিযানের সময়ে সেখানকার পাথর সংগ্রহ করে নিয়ে যান ভাস্কর্য এবং মন্দির নির্মাণের জন্য। ফারাও-এর সমাধি-সৌধের জন্যও এই অঞ্চলের পাথর ব্যবহার করা হ'ত।

আমেন্‌নাখ্‌টের যে ছবি পাওয়া যায়, তা এক উৎসুক, কর্মী মানুষের ছবি। কিন্তু যেরকমই হোন না তিনি, এ-কথা ঠিক যে, বহুদূর এগিয়ে ছিলেন মানুষটি। তাঁর তৈরি ভূ-তাত্ত্বিক মানচিত্রের সৃষ্টির পর দ্বিতীয় প্রাচীন ভূ-তাত্ত্বিক মানচিত্রটি দেখা দেয় ১৭৪০ সালে।

মিশেছে লাল আলোর রেখা, দূর দক্ষিণে ফ্লোরিডা পর্যন্ত তা দেখা যাচ্ছে।

ফুলকি বা তড়িৎস্পৃষ্ট কণা এবং গ্যাসের বিস্ফোরণ ইত্যাদি সবকিছুই সর্বাধিক পরিমাণে ঘটে। ১৯৫৭-'৫৮ সাল থেকে অরোরাগুলির মধ্যে সবচেয়ে দর্শনীয় ছিল দুটি। ওই দুটি তারা ১৯৮৮-'৮৯ সালের। এই তথ্য জানিয়েছেন, আলাস্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিওফিজিক্যাল ইনস্টিটিউটের ডেভিড ফ্রিট্‌স। আলাস্কার ক্যানওয়েল হিমবাহের ওপর স্কি করার সময়ে এই ছবিটিও তিনি তোলেন। এই বছরের শীতেও আশা করা যায় আকাশে অরোরার আলোর খেলা হবে চমকপ্রদ। সোলার ম্যাক্সিমাম প্রক্রিয়াটি এবারও ঘটেছে।

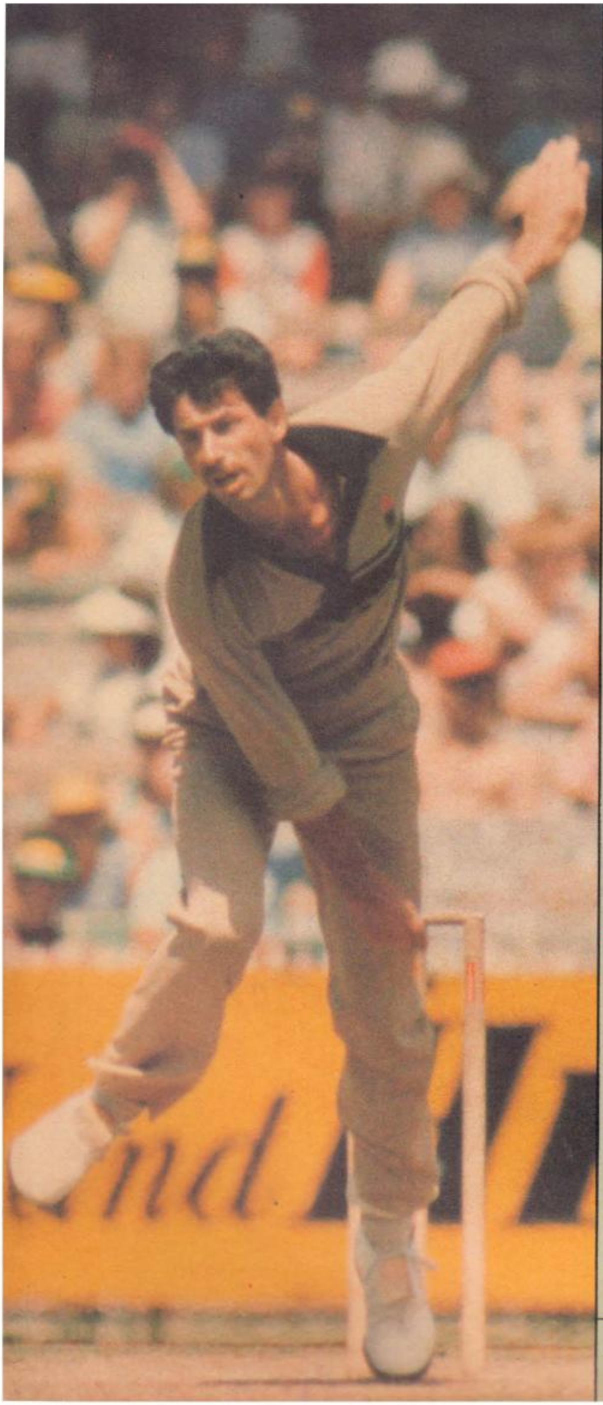

প্রচ্ছদকাহিনী

# নায়ক হ্যাডলি

**চারশো উইকেট নিয়ে রিচার্ড হ্যাডলি স্থাপন করেছেন অতুলনীয় কীর্তি। ক্রিকেট-বিশ্বের তিনিই এখন নায়ক। লিখেছেন**

**তানাজি সেনগুপ্ত**

কতই বা বয়স ছেলেটির। বড়জোর চার কি পাঁচ। স্কুল থেকে ফিরেই রোজ বাড়ির পেছন দিকে চলে যেত ভাই ডেলকে নিয়ে। সেখানে তৈরি করা ছিল একটি কংক্রিট ক্রিকেট পিচ। সঙ্গে থাকতেন আর-একজন, বাবা ওয়াল্টার হ্যাডলি। বাবা নিজে সব সময় ব্যাট করতে চাইতেন। ফলে, ছেলেটিকে শুধু বলই করে যেতে হত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এভাবে বল করে যাওয়ার অভ্যাসই ছেলেটিকে পরবর্তী জীবনে বিশ্বের সেরা এক বোলার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ছেলেটি নিজেই এ-কথা স্বীকার করেছে।

সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে পড়ার বই নিয়ে বসতে হত। দু' হাতে থাকত বই। কিন্তু মন চলে যেত কল্পনার খেলায়। এবং সেই খেলায় ছেলেটি একটি শতরান এবং কমপক্ষে পাঁচটি উইকেট নিতই। বলাবাহুল্য, তার দেশ নিউজিল্যান্ড সর্বদা টেস্টটিও জিতত।

এর সঙ্গে ছিল ধারাবিবরণী দেওয়ার অভ্যাস। পড়ার

*ফোটো : নিখিল ভট্টাচার্য*

## আমি হ্যাডলি

**নাম** : রিচার্ড জন হ্যাডলি
**ডাকনাম** : প্যাডেল্‌স
**জন্ম** : ৩ জুলাই, ১৯৫১
**জন্মস্থান** : ক্রাইস্টচার্চ, নিউজিল্যান্ড
**স্ত্রী** : কারেন হ্যাডলি
**পুত্র** : নিকোলাস ও ম্যাথু
**প্রিয় অন্য খেলা** : গল্‌ফ ও ফুটবল
**আদর্শ বোলার** : ডেনিস লিলি
**শ্রদ্ধেয় মানুষ** : মহাত্মা গান্ধী

ফাঁকে-ফাঁকে এইসব চলত । বাবা দরজায় দাঁড়িয়ে ছেলের এইসব কাণ্ডকারখানা দেখতেন এবং তাঁর প্রচ্ছন্ন সমর্থনও ছিল । ছেলেবেলায় বাবার এই সমর্থনকেই তাঁর জীবনের ভিত বলে মনে করেছেন রিচার্ড হ্যাডলি । ক্রিকেট খেলে যে খ্যাতি ও গৌরব তিনি পেয়েছেন এই সুযোগ এবং সমর্থন না থাকলে তার কিছুই পাওয়া যেত না, বলেছেন হ্যাডলি । চারশো উইকেটের যে ম্যাজিক অঙ্কের আজ তিনি একক অধিপতি, তার শুরুর শুরুটা সর্বদাই আমাদের কৌতূহলের বিষয় ।

রিচার্ড হ্যাডলির বাবা ওয়াল্টার হ্যাডলি নিজে ছিলেন একজন বিখ্যাত ক্রিকেটার । তাই পারিবারিক আবহাওয়াটা সর্বদাই অনুকূল ছিল রিচার্ডের । এখনও রিচার্ডের ব্যাপারে সমান উৎসাহী তাঁর পিতা ।

সমর্থন, উৎসাহ সবই দিয়েছেন বাবা,

শরীর সুস্থ রাখার জন্য চেষ্টার ত্রুটি নেই হ্যাডলির

# আশ্চর্য এক ক্রিকেট-পরিবার

**ওয়াল্টার হ্যাডলির চার ছেলেই ক্রিকেটার । রিচার্ড হ্যাডলির স্ত্রী কারেন মিডিয়াম পেসার । এঁরা কে কতটা সফল জানিয়েছেন আশিস উপাধ্যায়**

*স্ত্রী কারেনের সঙ্গে*

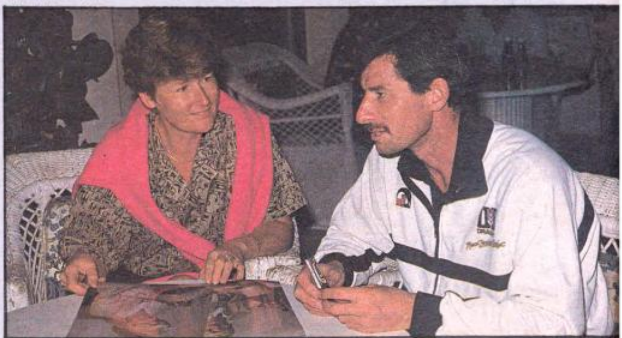

রিচার্ড হ্যাডলিরা পাঁচ ভাই । ব্যারি, ডেল, রিচার্ড, মার্টিন ও ক্রিস্টোফার । চার ভাই-ই ক্রিকেটার । ছোট ভাই ক্রিস্টোফার ভালবাসে সঙ্গীত । ক্রাইস্টচার্চের ল্যাঙ্কাস্টার পার্কে রিচার্ড হ্যাডলি যে-বলে সঞ্জয় মঞ্জরেকরকে আউট করে জীবনের চারশো উইকেট দখল করলেন, পরে সেই বলটি হ্যাডলির হাতে স্মারক হিসেবে তুলে দেন তাঁর পিতা ওয়াল্টার হ্যাডলি । তিনিই হলেন হ্যাডলি-পরিবারের আসল প্রাণপুরুষ । এখন তাঁর বয়স ৭৩ । ১৯৩৭-এ তিনি নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট-দলের হয়ে ইংল্যান্ড সফর করেন । ১৯৪৯-এ ইংল্যান্ড সফরকারী নিউজিল্যান্ড দলের তিনি ছিলেন অধিনায়ক । তিনি অধিনায়ক হওয়ার আগে পর্যন্ত নিউজিল্যান্ড দলকে প্রতিপক্ষ হিসেবে কেউ তেমন পাত্তা দিত না । কিন্তু ওয়াল্টারের নেতৃত্বে নিউজিল্যান্ড দল ১৯৪৯-এ ইংল্যান্ডে যে চারটি টেস্ট খেলেছিল তার সব ক'টিই হয়েছিল ড্র । ওয়াল্টারের অনুপ্রেরণায় বার্ট সাটক্লিফ ও মার্টিন ডনেলির মতো ব্যাটসম্যানরা পরিণত হয়ে উঠেছিলেন । সেই সফরে ওয়াল্টার হ্যাডলিও করেছিলেন মোট ১৪৩৯ রান । গড় ৩৬ । এর মধ্যে ছিল দুটি সেঞ্চুরি । রিচার্ড হ্যাডলির ৪০০ উইকেট

**হ্যাডলি-পরিবার ভালবাসেন ক্রিকেট ও সঙ্গীত । কিন্তু ক্রিকেট মাঠে রিচার্ড হ্যাডলির সাফল্যের জন্য পুরো পরিবারই আরও বেশি করে এখন উঠে এসেছেন পাদপ্রদীপের আলোয় ।**

সঙ্গে-সঙ্গে কঠোর শাসনও ছিল পুত্রের প্রতি । পড়া সম্পূর্ণ না হলে রাতের আইসক্রিমও জুটত না ছেলেদের । তখন হয়তো ব্যাপারটা ভাল লাগত না রিচার্ডের । কিন্তু পরবর্তীকালে বুঝেছেন নিয়ম, শৃঙ্খলা, সংযম ও সভ্যতাবোধের কী দাম । রিচার্ড হ্যাডলি বলেছেন, প্রতিভা থাকলে কিছুদিন খেলা যায় । কিন্তু এগুলো থাকলে খেলাকে আরও দীর্ঘজীবন দেওয়া যায় । শুধু দীর্ঘজীবন নয়, সম্মান, সম্ভ্রম সবই পাওয়া যেতে পারে । ১৯৭২-'৭৩ মরসুমে প্রথম নিউজিল্যান্ড দলে আসেন হ্যাডলি । বিপক্ষে ছিল পাকিস্তান, খেলেছিলেন ওয়েলিংটনে । তখন তিনি নিছকই একজন ফাস্ট বোলার—অনভিজ্ঞ, বলের নিয়ন্ত্রণ বড় একটা ছিল না । ফলে শুরুটা যে বিরাট জমকালো ছিল, তাও নয় । শুরুর প্রথম তিন বছর তিনি হামেশাই দল থেকে বাদ পড়েছিলেন । ভেঙে পড়েননি

দখল করার ঐতিহাসিক মুহূর্তটির সাক্ষী থাকার জন্য তাঁর আত্মীয়-পরিজনরা মাঠে উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন না শুধু রিচার্ডের দাদা ডেল। তিনি তখন অবশ্য ক্রিকেট ম্যাচই দেখছিলেন। ল্যাঙ্কাস্টার পার্ক থেকে অল্প কিছুটা দূরে হ্যাগলি ওভাল মাঠে

হ্যাডলি পরিবার: বাঁ দিক থেকে ওয়াল্টার, ওয়াল্টারের স্ত্রী লীলা, ডেল, রিচার্ড, ব্যারি ও রিচার্ডের স্ত্রী কারেন,(নীচে) হ্যাডলিপুত্র নিকোলাস

সেদিন নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মহিলা ক্রিকেট-দলের তৃতীয় টেস্ট চলছিল। ডেল নিউজিল্যান্ড মহিলা ক্রিকেট-দলের কোচ। দিনের শেষে নিউজিল্যান্ডের মেয়েরা হেরে যায়। তার জন্য ডেলের মন খারাপ হলেও, ভাই রিচার্ডের ঐতিহাসিক কীর্তি স্বচক্ষে দেখার জন্য মাঠে উপস্থিত থাকতে পারলেন না, এটাই তাঁকে আরও বিষণ্ণ করে তুলেছিল। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৩ এই ক' বছর নিউজিল্যান্ডের হয়ে ২৬টি টেস্ট

খেলেছেন ডেল। তিনিও ফাস্ট বোলার। তিনি ও রিচার্ড হ্যাডলি একসঙ্গে নিউজিল্যান্ডের হয়ে ১০টি টেস্ট খেলেছেন। তাঁরা একসঙ্গে শেষবার টেস্ট খেলেন ১৯৭৮-এর ফেব্রুয়ারিতে, ওয়েলিংটনে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। সেই প্রথম নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ড হেরে যায়। ম্যাচে রিচার্ড নিয়েছিলেন ১০টি উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে নিয়েছিলেন ২৬ রানে ৬ উইকেট। ইংল্যান্ড মাত্র ৬৪ রানে অল আউট হয়ে গিয়েছিল।

রিচার্ডের চেয়ে চার বছরের বড় ডেলই একদিক থেকে রিচার্ডের সাফল্যের প্রথম সিঁড়িটি তৈরি করে দিয়েছিলেন।

নিউজিল্যান্ডের প্লাঙ্কেট শিল্ডের খেলার ঠিক আগের ঘটনা। 'মোয়ার' নিয়ে বাগানের ঘাস ছাঁটতে গিয়ে ডেলের গোড়ালি ওই যন্ত্রের মোটরের সঙ্গে আটকে যায়। তাঁর জায়গায় দলে আসেন রিচার্ড হ্যাডলি। প্রথম ম্যাচেই তিনি হ্যাটট্রিক করেন। তারই সুবাদে তিনি নিউজিল্যান্ড 'বি' দলের হয়ে অস্ট্রেলিয়া সফরে অন্তর্ভুক্ত হন। হ্যাডলির জয়যাত্রার সেই শুরু, আজও যা অব্যাহত আছে।

রিচার্ডের বড় দাদা ব্যারি হচ্ছেন ব্যাটসম্যান। স্পিন বলও করতেন। প্রুডেনশিয়াল কাপে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নিউজিল্যান্ডের হয়ে খেলেছিলেন তিন হ্যাডলি— ব্যারি, ডেল ও রিচার্ড। মার্টিন হ্যাডলিও সিনিয়ার দলের হয়ে ক্রিকেট খেলেছেন। তবে তার বেশি আর যেতে পারেননি। ছোট ভাই ক্রিস্টোফারও খেলার ভক্ত। তবে তিনি খেলেন সঙ্গীত নিয়ে। ডেল হ্যাডলিও ভাল গিটার বাজান। 'টারেগা ফোর' নামের একটি সাঙ্গীতিক দলের তিনি সদস্য ছিলেন। দলটি এক বেতার প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়, পরে জার্মানিও সফর করে। টারেগা ফোর -এর রেকর্ডও আছে।

রিচার্ড হ্যাডলির স্ত্রী কারেন মিডিয়াম পেসার। তিনি নিউজিল্যান্ড মহিলা ক্রিকেট-দলের অধিনায়ক হয়েছিলেন। ১৯৭৩-এ স্থানীয় মহিলাদের এক ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় মাত্র ১২ রান দিয়ে তিনি পেয়েছিলেন ১০টি উইকেট।

রিচার্ড। বোলিং নিয়ে রীতিমত চিন্তাভাবনা করেছেন সেইসময়। অনুশীলন বাড়িয়ে দিয়েছেন। যাঁরা প্রথমে উৎসাহ দিয়েছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই ধরে নিচ্ছিলেন হ্যাডলির ক্রিকেট-জীবন শেষ।

১৯৭৬ সালের শুরুটা হ্যাডলির হল আরও খারাপ। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে হ্যাডলির উইকেটের সংগ্রহ প্রায় শূন্য। সহ-খেলোয়াড়দের কাছেও প্রায় উপেক্ষণীয়। কিন্তু অদ্ভুতভাবে ভারতের বিপক্ষে ওয়েলিংটন টেস্টে টসের ঠিক আগে হ্যাডলি জানতে পারলেন, দলে আছেন তিনি। আনন্দিত হওয়ার চেয়েও বিস্মিত হয়েছিলেন বেশি। ওই বিস্ময়ই আগুন হয়ে ঝরে পড়ল মাঠে। বেদির দলকে প্রায় একাই ছিন্নভিন্ন করে দিলেন তিনি। প্রথম ইনিংসে চারটি, ম্যাচে মোট এগারোটি উইকেট নিলেন। ভারতীয় দলকে ইনিংস পরাজয়ের তিক্ত স্বাদ পেতে হল। এই ম্যাচের বোলিংই হ্যাডলির জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

পরবর্তীকালে এরকম 'টার্নিং' ম্যাচ বহু খেলেছেন হ্যাডলি। প্রকৃতপক্ষে সত্তর দশকের শেষ থেকে এই নব্বই দশকের শুরু পর্যন্ত যে ক'টি টেস্টে নিউজিল্যান্ড দল ভাল ফল করেছে, তার অধিকাংশই হ্যাডলির একক কৃতিত্বে। ষাট দশকের প্রথম থেকে সত্তরের মাঝামাঝি পর্যন্ত নিউজিল্যান্ডকে

কোনও দেশই হিসেবের মধ্যে আনেনি। বলা যায়, প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের খেলোয়াড়দের ব্যাট এবং বলের গড় ভাল করার কাজে সাহায্য করাই ছিল নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটারদের প্রধান কাজ। বিভান কংডন, গ্লেন টার্নার-এর মতো ভাল ক্রিকেটার যে ছিলেন না তা নয়, কিন্তু এঁরা ব্যতিক্রম। নিউজিল্যান্ডকে মর্যাদা এবং জয় দুটোই এনে দিতে লাগলেন রিচার্ড হ্যাডলি। শুধু নিজের কৃতিত্বকেই বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া নয়, একই সঙ্গে দেশকে টেনে তোলার অসাধারণ দায়িত্ব আর ক'জন ক্রিকেটার পালন করেছেন, তাতে সন্দেহ আছে।

হ্যাডলির জীবনের প্রথম দিনগুলো কেমন কেটেছিল ? হ্যাডলি জানিয়েছেন, "নিউজিল্যান্ডের হয়ে যেদিন আমি প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলি, সেদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি আজ যেখানে রয়েছি, কোনওদিন সেখানে পৌঁছতে পারব। দলে স্থান পাওয়ার চেষ্টাই তখন করে যাচ্ছি। একটা করে ম্যাচ খেলছি আর শুধু ভাবছি পরের ম্যাচটায় খেলার সুযোগ পাব কি না।" এই 'টেনশন' এবং মানসিকতা নিয়েই লড়াই করে গেছেন হ্যাডলি, প্রাথমিক অবস্থায় দিনের পর দিন। আজ নিউজিল্যান্ডের সর্বাধিক টেস্ট খেলার কৃতিত্ব তাঁরই।

ভারতের বিরুদ্ধে বিধ্বংসী বোলিং করে ১৯৭৬-এ নিউজিল্যান্ডকে জেতানো যদি হ্যাডলির জীবনের প্রথম টার্নিং পয়েন্ট হয়, তবে দ্বিতীয় অবশ্যই ইংল্যান্ডে কাউন্টি ক্রিকেটে খেলার সুযোগ। ১৯৭৮-এ তিনি নটিংহ্যামশায়ারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন। মাত্র ছ' সপ্তাহ তিনি সেই মরসুমে খেলেন। কিন্তু অমূল্য অভিজ্ঞতা নিয়ে ফেরেন। পৃথিবীর সেরা ব্যাটসম্যানদের বিরুদ্ধে বল করার অভিজ্ঞতা এখানেই পান হ্যাডলি।

*গোড়ালির আঘাতই বারবার হ্যাডলিকে ভোগায়। ড্রেসিংরুমে পায়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে বসে থাকতে হয়*

## বিশ্বসেরাদের দৃষ্টিতে

### ওভারের ছ'টা বল করে ছ'রকম

সুনীল গাওস্কর

জীবনে কম বোলারের সম্মুখীন হইনি। তাঁদের দোষ-গুণ সবই খুব কাছ থেকে দেখেছি। হ্যাডলিও তার ব্যতিক্রম নয়। হ্যাডলির যে ব্যাপারটা আমায় মুগ্ধ করেছে তা হল, ধারাবাহিক ভাল বল করে যাওয়ার ক্ষমতা। ও একই গতিতে সারাদিন বল করে যেতে পারে। সকালের প্রথম ওভারে চকচকে, নতুন লাল বলটা নিয়ে যে গতিতে বল শুরু করে, বিকেলের পড়ন্ত আলোয় পুরনো বল নিয়ে ঠিক সেই একই গতিতে শেষ ওভারটা করে যায়। গতির এতটুকু পরিবর্তন নেই। হ্যাডলির বলে বৈচিত্র্যও কম নয়। ওভারে ছ'টা বল করে ছ'রকম। আর এত উইকেট নিতে ও কত রান খরচ করেছে ? খুবই কম। এরকম কৃপণ বোলার ক'জন আছে !

হ্যাডলির একটা ব্যাপার খুবই প্রশংসনীয়। নিজেকে সে ঘষে মেজে তৈরি করেছে। ইংল্যান্ডের কাউন্টি ক্রিকেটে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে যতটা পারে শিখেছে। আর সেটাকে প্রকাশ করেছে নিজের খেলায়। হ্যাডলি প্রচণ্ড 'সিরিয়াস'। আন্তরিক সাধনার কোনও তুলনাই নেই। ওর রান-আপ চমৎকার, ফলো থ্রু দুর্দান্ত, অ্যাকশন অসাধারণ। বিপক্ষ দলে খেললেও ওর সঙ্গে মাঠে থাকাই একটা স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। অন্তত আমার তো তাই মনে হয়।

### আমার দেখা অন্যতম সেরা বোলার

ডেভিড গাওয়ার

হ্যাডলিকে শ্রেষ্ঠ সম্মান জানাতে পারি এই বলে যে, সেরা সময়ে তাকে ডেনিস লিলির কাছাকাছি মানের বোলার মনে হয়েছে। সবসময়েই সে প্রথম শ্রেণীর বোলার, বলের ওপর ওর কী নিয়ন্ত্রণ ! ওকে দেখে বার বার আমার মনে হয়েছে, আমাদের কেউ কেন ওরকম বল করতে পারে না। ১৯৮১ সালে নটিংহ্যামশায়ারের সাফল্যে হ্যাডলির কৃতিত্ব অনেকখানি। ১৯৭৮-এর পর থেকেই ব্যাটিংয়ে হ্যাডলি মনোযোগী হয়। দুর্দান্ত জোরে বল মারতে পারে। আর, ওর বলের তো কোনও তুলনাই নেই। সবচেয়ে বড় কথা, হ্যাডলি ছাড়া নিউজিল্যান্ডের আক্রমণ কখনওই হিংস্র হয়ে উঠতে পারে না। ওর মতো হিংস্র, অথচ ঠাণ্ডা মাথার বোলার আর দেখিনি। আমি হ্যাডলির প্রথম সাক্ষাৎ পাই ১৯৭৮-এর সিরিজে। ফাইনাল টেস্টে, লর্ডস-এ আমাদের জয়ের জন্য যখন দরকার মাত্র ১২০ রানের, তখন হ্যাডলির বোলিং ছিল দেখবার মতো। এখনও দারুণ গতিতে চলেছে হ্যাডলি।

## শ্রদ্ধা করি
ভিভ রিচার্ডস

হ্যাডলি সম্বন্ধে আমার ধারণা খুবই উঁচু। কেন, তা বলছি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ফাস্ট বোলারদের আমি ছোট করছি না। কিন্তু তারা প্রত্যেকে সবসময়েই সমযোগ্যতার আরও দু'একজন বোলারকে পাশে পেয়েছে। ফলে কখনওই দলের আক্রমণের দায়িত্ব একা কারও ঘাড়ে চেপে যায়নি। হ্যাডলিকে ঠিক এর বিপরীত অভিজ্ঞতার সামনে পড়তে হয়েছে। সে-ই দলের স্ট্রাইক বোলার। এত বোঝা নিয়েও হ্যাডলি নিজেকে ঠিক রেখেছে। ক্রমাগত বাড়িয়ে নিয়ে গেছে নিজেকে। হ্যাডলিকে আমি অভিনন্দন জানাতে বাধ্য। রিচার্ড হ্যাডলি সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। অনেকেই জানেন, আমি আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলে থাকি। আমার মনে হয়, বোলাররা মাথায় চাপার আগেই আমি তাঁদের ছত্রখান করি। তা না হলে আমি গুটিয়ে যেতে বাধ্য হব। আমার এই ক্রিকেট 'দর্শন' সবসময় যে কাজে লেগেছে তা নয়, তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সাফল্য এনেছে। এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে ইয়ান বথামের খুব মিল। সাধে কি আর আমরা দুজনে খুব বন্ধু! হ্যাডলির ক্ষেত্রে আমার এই দর্শন পালটাতে বাধ্য হয়েছি। ওকে মারা খুব শক্ত। কারণ ওর হাতে অনেক রকম বল আছে। মার খাওয়ার পরের বলটাই অন্যরকম করে। আর সত্যিই যদি কেউ সেরকম পিটোতে পারত তাহলে হ্যাডলি আজ এই দুর্দান্ত কীর্তির নায়ক হত না।

## এই বয়সেও হ্যাডলি অতুলনীয়
মোহিন্দর অমরনাথ

হ্যাডলির বয়স প্রায় চল্লিশ হতে চলল। ব্যাটসম্যানের পক্ষে যদিও বা সম্ভব, ক'জন বোলার, বিশেষত ফাস্ট বোলারের পক্ষে এখনও টেস্টম্যাচে খেলে যাওয়া যে কী শক্ত, যাঁদের ক্রিকেট সম্বন্ধে একটু ধারণা আছে তাঁরাই তা বোঝেন। অথচ অবলীলাক্রমে হ্যাডলি লড়াই করে যাচ্ছে এবং রীতিমত দাপটের সঙ্গে। হ্যাডলির বড় বৈশিষ্ট্য, ওকে আমি কখনও নেগেটিভ বোলিং করতে দেখিনি। প্রত্যেকটা বলই ও ব্যাটসম্যানকে খেলাতে চায়। সুইংটা এতই নিয়ন্ত্রিত যে মন্থর উইকেটেও ওর সাফল্য প্রশ্নাতীত। যখনই বয়স বেড়েছে, হ্যাডলি রান-আপ কমিয়ে দিয়েছে, কিন্তু বলের গতি একটুও কমেনি। ফলে উইকেট পেতেও অসুবিধা হয়নি। গ্রেট বোলার কি সহজে হয়েছে রিচার্ড হ্যাডলি?
হ্যাডলির চেহারাটা কেউ লক্ষ্য করেছেন? ছ'ফুট চেহারায় এখনও এতটুকু মেদ জমেনি। সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করে পুরো মন-প্রাণ ঢেলে দিয়েছে ক্রিকেটের প্রতি। হ্যাডলিই একমাত্র প্রতিভাবান ক্রিকেটার আমি বলব না, কিন্তু বলতে বাধ্য, অনুকরণ করতে হলে ক্রিকেট-নিষ্ঠ হ্যাডলিকেই করা ভাল। সে কখন কী বল করবে, তা বড় ব্যাটসম্যানও সব সময় বুঝতে পারে না। এটা ওর বড় গুণ।

পরবর্তীকালে তিনি তাই বারবার ফিরে এসেছেন কাউন্টি ক্রিকেট খেলতে। ১৯৮০তে পায়ের গোড়ালিতে আঘাত পান হ্যাডলি। এবং নটিংহ্যামশায়ারের পক্ষে বাইশটি ম্যাচের মধ্যে মাত্র সাতটি ম্যাচ খেলেন। পেশাদার ক্রিকেটার হিসেবে টাকা নিচ্ছেন, অথচ খেলতে পারছেন না, এই অনুশোচনায় হ্যাডলি তাঁর চুক্তির মাঝপথেই খেলা ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে আসতে চান। এই সময়ই ঘটে হ্যাডলির ক্রিকেট-জীবনের আর-এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।
শেষ ম্যাচটি ছিল টেণ্ট ব্রিজে, সানডে লিগের খেলা। গোড়ালিতে আঘাত, তাই রান-আপটা অনেক কমিয়ে বল করলেন হ্যাডলি। আগে প্রায় পঁচিশ পা দৌড়ে এসে বল করতেন। কিন্তু রান-আপ কমিয়ে জোর দিলেন সুইং এবং টাইমিং-এর ওপর। সেই ম্যাচে ১২ রানে পেলেন ছ'টি উইকেট। ম্যাচের শেষে নটিংহ্যামশায়ারের চেয়ারম্যান তাঁর কাছে ছুটে এলেন, বললেন, "রিচার্ড, তুমি রান-আপ কমিয়ে বল করলেও আগামীবার আবার ফিরে এসো। আমরা তোমাকে চাই।" হ্যাডলির কাছে এটা ছিল আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার দারুণ একটা ঘটনা। এবং রান-আপ কমিয়েও যে তাঁর বলের ধার এতটুকুও কমেনি এটাও এক স্বস্তিদায়ক মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত রইল।
১৯৮১-তেই আবার হ্যাডলি ফিরে এলেন কাউন্টি খেলতে। এটা তাঁর জীবনের একটি স্মরণীয় বছর। পেলেন ১০০টি উইকেট। নটিংহ্যামশায়ার কাউন্টি চ্যাম্পিয়ান হল, ক্লাবের ৫৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম। আবার হ্যাডলি প্রমাণ করলেন, শর্ট রান আপেও বলে

*ব্যাটের দাপটেও কিছু কম যান না*

*কপিল খুশি, হ্যাডলির সঙ্গে তাঁর নামও উচ্চারিত হয়*

আগুন জ্বালানো যায়, দলকে জয়ের পথে নিয়ে যাওয়া যায় । পরবর্তী সময়ে এই রান আপ নিয়ে নিউজিল্যান্ডে সমালোচনার সামনে পড়েন হ্যাডলি । সাংবাদিক, কর্মকর্তা, এমনকী সতীর্থ ক্রিকেটাররাও হ্যাডলির পেশাদারিত্ব নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন । কিছুদিনের মধ্যেই আবার তিনি প্রমাণ করেন, ক্রিকেট শুধু তাঁর পেশাদার জীবনের অঙ্গ নয়, তাঁর নিজেরই জীবন ।
কাউন্টি খেলার অভিজ্ঞতায় হ্যাডলি শুধু যে তাঁর বোলিংয়েরই উন্নতি ঘটিয়েছেন তা নয়, ১৯৮১ থেকেই ব্যাটিংয়েও নজর দিতে শুরু করেন । এর আগে নিজেকে অলরাউণ্ডার হিসেবে ভাবতেনই না হ্যাডলি । তাঁর প্রথম এবং একমাত্র কাজ ছিল বল করা । কিন্তু '৮১-তে নটিংহ্যামশায়ারের অধিনায়ক ক্লাইভ রাইস তাঁকে ব্যাটে নজর দিতে বলেন এবং ব্যাটিং অর্ডারে হ্যাডলিকে তুলে আনেন আট নম্বর থেকে ছ' নম্বরে । ছ' নম্বর মানে দায়সারা ব্যাটিং নয় । দলের প্রয়োজনে রান জোগানোর দায়িত্বটা থেকেই যায় । স্ট্রোক করে খেলতেই হবে । বাধ্য হয়ে হ্যাডলি ব্যাটিংয়ে সময় দিতে থাকেন এবং সে-বছর ব্যাটে ৯০০ রান পেয়েছিলেন তিনি । হ্যাডলি বলেন, "আগে শেষের দিকে নামতাম, ঝড়ের বেগে মেরে যা রান তোলা যায় সেটাই দেখতাম । কয়েকটা বাউণ্ডারি হলে তো কথাই নেই । কিন্তু আগে নেমে আমাকে অনেক বাছাই করে বল মারতে হত, ব্যাটের মাঝখান দিয়ে খেলতে লাগলাম এবং সঠিক টাইমিংয়ের চেষ্টা করলাম ।" হ্যাডলি এর পর কাউন্টিতে কয়েকটি সেঞ্চুরিও পেলেন এবং ১৯৮৪-তে হল 'ডাবল'—এক হাজার রান এবং একশো উইকেট । প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে ব্যাটিংয়ে গড় দাঁড়ায় ৩০ । হাতেনাতে এই সাফল্য ব্যাটিংয়ের প্রতি হ্যাডলির মনোভাবটাই বদলে দেয় । ক্রমশ অলরাউণ্ডারের স্বীকৃতি পাওয়ার দিকে এগোতে থাকেন তিনি ।
রিচার্ড হ্যাডলির আদর্শ ক্রিকেটার হলেন আর-এক অলরাউণ্ডার, বিশ্ব ক্রিকেটের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব সার গারফিল্ড সোবার্স । কেন ? হ্যাডলির মতে, ক্রিকেটের প্রতি সোবার্সের ভালবাসাই আলাদা । প্রতিভার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর আছে নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা, যা তাঁকে মুগ্ধ করেছে । ব্যাটে-বলে-ফিল্ডিংয়ে সমান সাফল্য সোবার্সের এবং যে-কোনও একটি দিয়েই তিনি পৃথিবীবিখ্যাত হতে পারতেন ।

> **হ্যাডলি জানিয়েছেন, "নিউজিল্যান্ডের হয়ে যেদিন আমি প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলি, সেদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি আজ যেখানে রয়েছি, কোনওদিন সেখানে পৌঁছতে পারব । একটা করে ম্যাচ খেলছি আর শুধু ভাবছি পরের ম্যাচটায় খেলার সুযোগ পাব কি না ।"**

## চার প্রতিদ্বন্দ্বী বোলার

| | হ্যাডলি | বথাম | কপিলদেব | ইমরান |
|---|---|---|---|---|
| জন্ম | ৩-৭-৫১ | ২৪-১১-৫৫ | ৫-১-৫৯ | ২৫-১১-৫২ |
| টেস্ট জীবন শুরু | ১৯৭৩ | ১৯৭৭ | ১৯৭৮ | ১৯৭১ |
| টেস্ট খেলেছেন | ৮১ | ৯৪ | ১০৫ | ৮২ |
| উইকেট পেয়েছেন | ৪০৬ | ৩৭৩ | ৩৬২ | ৩৫৮ |

* পরিসংখ্যান ভারত-নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্ট পর্যন্ত

# তিন প্রতিদ্বন্দ্বীর চোখে

## হ্যাডলির ফ্যান আমি

কপিলদেব

হ্যাডলিকে ঈর্ষা করা যায় না, হ্যাডলির সম্বন্ধে আলোচনা করাটাও আমার অর্থহীন মনে হয়। খেলোয়াড়ের পারফরম্যান্সই তাঁর হয়ে কথা বলে। সুতরাং হ্যাডলির অসাধারণ পারফরম্যান্সের পর তাঁকে নিয়ে আলোচনা করার আমি কে? হ্যাডলিকে আমি যত দেখেছি, ততই তাঁর গুণমুগ্ধ হয়ে পড়েছি। অনেকে আমাকে হ্যাডলির প্রতিদ্বন্দ্বী বলেন। বথাম, ইমরানের কথা আমি বলতে পারব না, কিন্তু আমি বোলার হ্যাডলির ধারেকাছেও যাই না। সত্যকে স্বীকার করতে আমার দ্বিধা নেই। গতির সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত সুইং মিশিয়ে একনাগাড়ে হ্যাডলি এতদিন কী করে বল করে যাচ্ছেন সেটাই আমার কাছে বিস্ময়ের। আর হ্যাডলির কী সংযম। খুব কাছ থেকে আমি তো কয়েকবার দেখেছি। খেলার জন্য এরকম আত্মনিবেদন আমি খুব কম খেলোয়াড়ের মধ্যেই দেখেছি। অবশ্য সেজন্যই হ্যাডলি আজ এভারেস্টের চূড়ায়।

## পিটিয়েও ওঁর ধৈর্য নষ্ট করা যায় না

ইয়ান বথাম

বল করার চেয়ে ব্যাট করতে আমি কম ভালবাসি না। এবং নিজেকে আমি আক্রমণাত্মক ব্যাটসম্যান হিসেবেই ভাবি। আমার ধারণা, বলটাকে যথেচ্ছ পেটানোর জন্যই ব্যাট হাতে পেয়েছি। পৃথিবীর বহু বোলারই আমার হাতে মার খেয়েছে। কিন্তু একজনের ক্ষেত্রে আমাকে কথাটা খুব সতর্ক হয়ে বলতে হচ্ছে। বোলার হ্যাডলিকে যে আমি মার দিইনি তা নয়, কিন্তু কদাচ। সবচেয়ে বড় কথা, দুমদাম দু'-একটা শট নিয়েও আমি ওঁর ধৈর্য নষ্ট করতে পারিনি। বরং হ্যাডলির লাইন ও লেংথ আরও ভাল হয়েছে। প্রচণ্ড 'স্ট্যামিনা' হ্যাডলির। একনাগাড়ে একই মানে এতদিন ধরে বল করে যাচ্ছে—শ্রদ্ধা করতে আমি বাধ্য। লিলির পরেই, হ্যাডলি বিশ্বসেরা বোলার।

## স্বপ্নের বোলার

ইমরান খান

হ্যাডলির কোনও তুলনা আছে বলে আমার মনে হয় না। বথাম ও কপিলদেবও অনেক উইকেট পেয়েছে। পেয়েছি আমিও। কিন্তু হ্যাডলির কৃতিত্ব অনেক বেশি বলে মনে হয়। ওর বোলিংয়ের গড়ের দিকে তাকালেই ব্যাপারটা বোঝা যায়। শুধু যে সর্বাধিক উইকেটই পেয়েছে তা নয়, সবচেয়ে কম রান দিয়ে উইকেটগুলো সংগ্রহ করেছে। বেশ কিছুদিন হল নিউজিল্যান্ড দলটাকে ও একাই নিজের কাঁধে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি নিশ্চিত, ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করলে হ্যাডলিকে নিয়ে যেরকম মাতামাতি হত, তা অন্য ক্রিকেটারদের পক্ষে কল্পনা করা সম্ভবই নয়। ইংল্যান্ডের হয়ে খেললে হ্যাডলির সাফল্য আরও বেশি হত, উইকেট বেশি পেত। এই বয়সেও ও যেভাবে উইকেটের পর উইকেট দখল করে যাচ্ছে তা ভাবলে অবাক হই। স্বপ্নের বোলার বলতে যা বোঝায় রিচার্ড হ্যাডলিকে আমার তাই মনে হয়।

ইয়ান বথামের ৩৭৩টি টেস্ট-উইকেটের বিশ্বরেকর্ডটি হ্যাডলি ভেঙেছিলেন ভারতের বিরুদ্ধে ১৯৮৮-'৮৯ সিরিজে বাঙ্গালোরে। অরুণলালকে আউট করে হ্যাডলি তাঁর ৩৭৪-তম টেস্ট উইকেটটি পান। সেই বলটি হ্যাডলি যত্নের সঙ্গে নিজের সংগ্রহে রেখে দিয়েছেন।

হ্যাডলি মনে করেন, সোবার্সের ব্যক্তিত্বও সমান চিত্তাকর্ষক।

সোবার্সও একটি মস্ত স্বীকৃতি দিয়েছেন হ্যাডলিকে। তাঁর মতে, যে চারজনকে এখন অলরাউন্ডার বলা হয়, তাঁদের মধ্যে সেরা হলেন হ্যাডলি। অর্থাৎ ইয়ান বথাম, রিচার্ড হ্যাডলি, ইমরান খান এবং কপিলদেবের মধ্যে হ্যাডলিই প্রথম। হ্যাডলি নিজেকে ধন্য মনে করলেও এটা যথার্থ নয় বলেছেন। তাঁর বক্তব্য, অলরাউন্ডার হিসেবে ইমরান সেরা। বলে হ্যাডলির নিজের ওপর যথেষ্ট আস্থা, কিন্তু ব্যাটে তিনি কপিল, ইমরান, বথামের পরে নিজেকে স্থান দিয়েছেন।

পাঁচ বা ততোধিক উইকেট হ্যাডলি বহুবার নিয়েছেন। কিন্তু জীবনের সেরা বোলিং মনে করেন '৮৬-তে গাব্বায় প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। প্রথম ইনিংসে তিনি অস্ট্রেলিয়ার ন'টি উইকেট নেন, ম্যাচে মোট পনেরোটি।

সবচেয়ে হতাশাজনক মুহূর্তটিও ওই অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষেই। ১৯৮৭-তে মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়ার ন'টি উইকেট ফেলে দিয়েও ম্যাচ বের করে আনতে পারেনি

# তিনশো উইকেট-ক্লাবের সদস্যরা

তিনশো উইকেট ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ফ্রেডি ট্রুম্যান। তারপর তাঁর রেকর্ড ভাঙেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ল্যান্স গিব্‌স। দেখতে দেখতে এই ক্লাবের সদস্য-সংখ্যা দাঁড়িয়েছে আট। এঁদের মধ্যে বথাম খেলছেন না। ৪০০ টেস্ট-উইকেটের ম্যাজিক অঙ্কে পৌঁছনোর সম্ভাবনা এখন কপিল দেবেরই সবচেয়ে বেশি।

**ইয়ান বথাম**

৯৪টি টেস্টে ৩৭৩টি উইকেট নিয়েছেন। ইংল্যান্ড দল থেকে বাদ পড়ায় বথাম আরও অনেক রেকর্ড গড়তে পারলেন না।

**ইমরান খান**

৮২টি টেস্টে ইমরান পেয়েছেন ৩৫৮টি উইকেট। বলের চেয়ে ইমরানের ব্যাটের ধারই এখন বেশি।

**ফ্রেডি ট্রুম্যান**

প্রথম ৩০০-র বেশি উইকেট পান ইংল্যান্ডের ফাস্ট বোলার ট্রুম্যান। ৬৭টি টেস্টে ৩০৭টি উইকেট তিনি পেয়েছেন।

**ল্যান্স গিব্‌স**

স্পিনার হিসেবে একমাত্র গিব্‌সই পেয়েছেন ৩০০-র বেশি উইকেট। ৭৯টি টেস্টে তাঁর শিকার ৩০৯।

**কপিল দেব**

১০৫টি টেস্টে তাঁর সংগ্রহ ৩৬২টি উইকেট। কপিল এখনও খেলছেন। ৪০০ উইকেটের বাধা তিনিও পেরিয়ে যেতে পারেন।

**বব উইলিস**

ইংল্যান্ডের ফাস্টবোলার উইলিস ৯০টি টেস্টে ৩২৫টি উইকেট পেয়েছেন। উইলিস বলেছেন, "লিলির চেয়ে বেশি উইকেট আমি পেতে চাই না। লিলিই সেরা।"

**ডেনিস লিলি**

ক্রিকেটবোদ্ধারা বলেন, ফাস্ট বোলারদের মধ্যে লিলিই সর্বশ্রেষ্ঠ। মাত্র ৭০টি টেস্টে ৩৫৫টি উইকেট নিয়েছেন তিনি।

**ম্যালকম মার্শাল**

ব্যাটসম্যানদের আতঙ্ক হচ্ছেন ফাস্ট বোলার মার্শাল। ৬৬টি টেস্টে ৩২৬টি উইকেট তাঁর সংগ্রহ। ৪০০-র বাধা ভাঙার ক্ষমতা রাখেন মার্শাল।

নিউজিল্যান্ড । অস্ট্রেলিয়ার জেতার জন্য দরকার ছিল ৩০ রান, আর নিউজিল্যান্ডের কেবলমাত্র শেষ উইকেট । পাঁচ ওভার বল করেও ওই শেষ উইকেটটি পাননি হ্যাডলি অ্যান্ড কোং । যদি পেতেন তা হলে শুধু ম্যাচটি যে জেতা যেত তা নয়, সিরিজ সমান-সমান হত এবং ট্রান্সতাসমানিয়ান কাপ নিউজিল্যান্ডের কাছেই থাকত । ওই হতাশার কথা এখনও ভোলেননি হ্যাডলি । টানা আঠারো বছর নিউজিল্যান্ডের হয়ে বল করে যাচ্ছেন হ্যাডলি এবং প্রথম কয়েকটা বছর বাদ দিয়ে ধারাবাহিক সাফল্যও পাচ্ছেন তিনি । একে-একে একশো, দুশো, তিনশো উইকেটের বাধা পেরোলেন । নিউজিল্যান্ডের কোনও বোলার তাঁকে অতিক্রম করতে পারবে এটা ট্রুম্যানের অবিশ্বাস্য ছিল । সে-বাধাও অতিক্রম করলেন হ্যাডলি । বথামকে টপকে ৩৭৪টি উইকেট নিয়ে করলেন বিশ্বরেকর্ড । সর্বাধিক উইকেট-প্রাপক টেস্ট ক্রিকেটে । ভারতের মাটিতে বিশ্বরেকর্ড করার পর হ্যাডলির প্রতিক্রিয়া ছিল একেবারে খেলোয়াড়োচিত । আনন্দ, আবেগ, উচ্ছ্বাস সবই ছিল । কিন্তু পরের দিনই জানালেন, আজ থেকে আবার সেই দশটা-পাঁচটার কাজ । আবার উইকেটের সন্ধান । চাই আরও উইকেট ।

### পরিসংখ্যানে হ্যাডলির ৪০০

| বিপক্ষ | টেস্ট | উইকেট | স্বদেশ | বিদেশ |
|---|---|---|---|---|
| অস্ট্রেলিয়া | ২২ | ১২৩ | ৪৬ | ৭৭ |
| ইংল্যান্ড | ১৮ | ৮১ | ২৭ | ৫৪ |
| ভারত | ১৩ | ৬৩ | ৩২ | ৩১ |
| ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ১০ | ৫১ | ৩৬ | ১৫ |
| শ্রীলঙ্কা | ৬ | ৩৭ | ১০ | ২৭ |
| পাকিস্তান | ১২ | ৫১ | ৪১ | ১০ |
| মোট | ৮১ | ৪০৬ | ১৯২ | ২১৪ |

*হ্যাডলির সাফল্যে সবাই খুশি*

হ্যাডলি বলেছেন, তিনশো উইকেট ক্লাবের সব সদস্যের কাছেই তিনি কৃতজ্ঞ । উইলিস, বথাম, কপিলদেব, ইমরান, গিব্‌স—সবাই তাঁকে দুরূহ লক্ষ্যে পৌঁছবার প্রেরণা দিয়েছেন । সবসময়ই তাঁর কাছে একটা 'টার্গেট' রেখেছেন এঁরাই ।

এতদিন ধরে হ্যাডলি নিজেকে যে ধরে রেখেছেন, চোট আঘাত অগ্রাহ্য করে খেলে যাচ্ছেন, এর রহস্য কী ? হ্যাডলি জানিয়েছেন, এক কথায় এর উত্তর দেওয়া অসম্ভব । নিজেকে ফিট রাখার জন্য যেটুকু ব্যায়াম করা দরকার, এখন শুধু তাই করেন । "আসলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার আগে এত বেশি প্র্যাকটিস করেছিলাম যে, তার ফল এখনও পাচ্ছি ।" হ্যাডলি কৃতজ্ঞ কাউন্টি ক্রিকেটের কাছেও । বিশ্বসেরা বোলারদের সেখানে দেখেছেন । পরিশ্রম করার সঙ্গে-সঙ্গে চোখ দুটোও খোলা রেখেছিলেন তিনি । খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখেছেন সেরা বোলারদের বোলিং অ্যাকশন । যেটুকু শেখার নিঃশব্দে শিখে নিয়েছেন ।

এ-ব্যাপারে হ্যাডলির আদর্শ বোলার হলেন ডেনিস লিলি । লিলিকে সর্বকালের সেরা ফাস্ট বোলার বলে মনে করেন তিনি । দুর্দান্ত

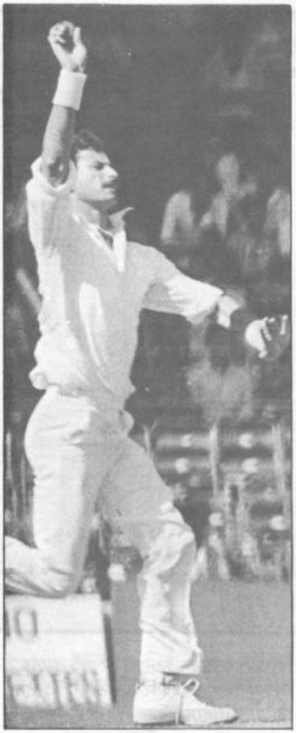

টেকনিক, গতি এবং বাতাসে বল নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করার ক্ষমতা আছে লিলির । প্রথমদিকে আঘাতজনিত সমস্যা ছিল লিলির এবং ছিল পিঠের ব্যথা । কিন্তু সব প্রতিকূলতা জয় করেছেন লিলি । হ্যাডলির মন্তব্য, ওই ধরনের আঘাত থাকলে অন্য যে-কোনও খেলোয়াড় সরে দাঁড়াতেন । কিন্তু লিলির দক্ষতা প্রশ্নাতীত । এবং যদি তিনি ওয়ার্ল্ড সিরিজ কাপ ক্রিকেট না খেলতেন এবং পিঠের আঘাতে না ভুগতেন তবে পাঁচশো উইকেট নেওয়া তাঁর পক্ষে কোনও সমস্যাই হত না । এবং সেটা হত সব বোলারেরই স্বপ্ন । তিনি থাকতেন সব বোলারেরই ধরাছোঁয়ার বাইরে । আদর্শের প্রতি যথার্থ সম্মান ও সমাদর হত সেটা ।

হ্যাডলি মূলত কোন ধরনের বোলার ? আগে হ্যাডলি গতির ওপর জোর দিতেন । কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর বোলিং হয় লাইন এবং লেংথ নির্ভর । চেষ্টা করেন সিমের ওপর বলটা বাতাসে মুভ করাতে । তাঁর বোলিংয়ের আসল ব্যাপার হল ছন্দ । এবং অবশ্যই, টাইমিং । গতির সঙ্গে নিখুঁত লেংথ এবং অবশ্যই সুইং, যা দিয়ে পৃথিবীর প্রায় সব ব্যাটসম্যানকেই বোকা বানিয়েছেন তিনি । নিউজিল্যাণ্ডের একমাত্র ম্যাচ উইনিং প্লেয়ার হলেও এখন পর্যন্ত হ্যাডলিকে দলের অধিনায়কত্ব দেওয়া হয়নি । আশ্চর্যের হলেও ব্যাপারটি সত্য ! কিন্তু এতে হ্যাডলির কোনও

ক্ষোভ নেই । কারণ তিনি যে সম্মান পেয়েছেন, আজ পর্যন্ত নিউজিল্যাণ্ডের কোনও অধিনায়কই তা পাননি ।

চার শতাধিক উইকেট নিলেন হ্যাডলি । এর মধ্যে সেরা উইকেট কোনটি ? হ্যাডলির মতে, গ্রেগ চ্যাপেলের, ক্রাইস্টচার্চের ল্যাঙ্কাস্টার পার্কে স্লিপে কোনির হাতে ক্যাচ দিয়েছিলেন গ্রেট গ্রেগ । বলটা প্রায় কিছুই বুঝতে পারেননি তিনি ।

বুঝতে পারেননি সঞ্জয় মঞ্জরেকরও. কয়েকদিন আগে নিজের মাঠে হ্যাডলি যখন রূপকথার নায়ক হলেন, চারশো উইকেট নিয়ে । ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে মঞ্জরেকরের ব্যাট-প্যাডের ফাঁক গলে হ্যাডলির তীব্র গতির ইনসুইঙ্গার স্ট্যাম্প উপড়ে দেওয়া মাত্র হ্যাডলি উঠে গেলেন সতীর্থদের কাঁধে । উঠলেন এমন উচ্চতায়, যেখানে পরবর্তী কেউ হয়তো পৌঁছবেন,কিন্তু প্রথম হওয়ার একমাত্র কৃতিত্বটি লেখা থাকবে রিচার্ড হ্যাডলির নামের পাশেই ।

দীর্ঘ যাত্রাপথ এখন প্রায় শেষের দিকে । প্রায় সব লক্ষ্যই পূর্ণ । কিন্তু হ্যাডলির মতো মহান বোলারের কি লক্ষ্যের শেষ আছে ? এঁরা নিজেরাই নিজেদের লক্ষ্য তৈরি করেন । এবং তা অতিক্রম করেন । সুতরাং রিচার্ড হ্যাডলি কখন, কোথায়, কীভাবে অবসর নেবেন সে জল্পনায় সময় না কাটানোই ভাল ।

দীর্ঘ যাত্রাপথ এখন প্রায় শেষের দিকে । প্রায় সব লক্ষ্যই পূর্ণ । কিন্তু হ্যাডলির মতো মহান বোলারের কি লক্ষ্যের শেষ আছে ? এঁরা নিজেরাই নিজেদের লক্ষ্য তৈরি করেন । এবং তা অতিক্রম করেন । সুতরাং রিচার্ড হ্যাডলি কখন, কোথায়, কীভাবে অবসর নেবেন সে জল্পনায় সময় না কাটানোই ভাল ।

টাকাকড়ি

# দেশে-দেশে টাকার আবির্ভাব : পশ্চিম এশিয়ায় ও ইউরোপে

কীভাবে টাকা এল ? প্রথম সোনা ও রুপোর টাকা কারা ব্যবহার করেছিল ?
**ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়**-এর গবেষণা ।

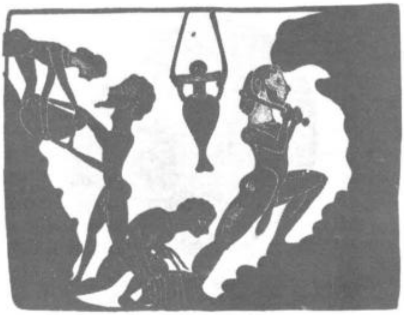

*করিন্থের কাছে পসিডনের মন্দিরে পাওয়া ফলকে তখনকার সমাজচিত্র : জাহাজে মাটির পাত্রে মুদ্রা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ; খনি থেকে তোলা হচ্ছে ধাতু ; মৃৎশিল্পের কিছু নিদর্শন*

কে বা কারা প্রথম টাকা বা মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন তা নিয়ে প্রাচীন হেলেনীয় (Hellenic) এবং পরবর্তীকালের হেলেনায়িত (Hellenistic) ও রোমক (Roman) জগতে নানা বিতর্ক হয়েছিল । এর ইঙ্গিত পাওয়া যায় আনুমানিক দ্বিতীয় শতাব্দীর পণ্ডিত জুলিয়াস পোলাক্স রচিত 'ওনোমাস্তিকন' গ্রন্থে (৯,৮৩) । এখানে উদ্ধৃত সবচেয়ে প্রাচীন ব্যক্তি জেনোফানেস (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী)-এর মতে টাকার প্রবর্তন করেন লিডীয়রা । এই ধারণার সমর্থন মেলে হেরোডটাস-এর ইতিহাসে । খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর এই গ্রন্থে লেখা হয়েছে যে, "লিডীয়রাই প্রথম সোনা ও রুপোর টাকার ব্যবহার শুরু করেছিল ।" (১,৯৪) ।

প্রাচীন লিডিয়া ছিল এখনকার তুরস্কের পশ্চিমাংশের সীমানাভুক্ত এক অঞ্চল । গিগেস-এর (Gyges) রাজত্বকালে (আনুমানিক ৬৮৭-৬৫২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) লিডিয়া এক সাম্রাজ্যে পরিণত হয় । আনুমানিক ৬৫২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এই সাম্রাজ্যের এফেসুস শহরের বিখ্যাত আর্টেমিস দেবীর মন্দির বহিরাগত

*আইওনিয়াতে (উত্তর-পশ্চিম এশিয়া) নির্মিত খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর ইলেকট্রাম মুদ্রা ।*

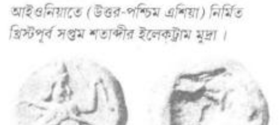

*পারস্যের স্বর্ণমুদ্রা "দারিক"*

কিম্মেরীয় বা সিম্মেরীয়দের আক্রমণে ধ্বংস হয় । পরে এটি পুনর্নির্মিত হয়েছিল । ১৯০৪-৫ খ্রিস্টাব্দে প্রাক-পুনর্নির্মাণ যুগের ধ্বংসস্তূপে উৎখননের সময় নানা চিহ্নযুক্ত ৮৭টি ইলেকট্রামের খণ্ড এবং কয়েকটি চিহ্নবিহীন পিণ্ড পাওয়া যায় । এগুলি ২২০ গ্রেন বা ১৪·২৫৬ গ্রামের ফিনিসীয় স্টেটার (Stater) নামের তৌল বা ওজনরীতির বিভিন্ন ভগ্নাংশের সমতুল্য ওজনের । অর্থাৎ, এগুলি নির্দিষ্ট ওজনরীতি অনুযায়ী তৈরি । এদের মধ্যে চিহ্নহীন পিণ্ডগুলি ধাতব বিনিময় মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল বলে মনে করা যায় । কিন্তু চিহ্নযুক্ত খণ্ডগুলি নিশ্চয়ই টাকা বা মুদ্রা । এখানে ওই চিহ্ন খণ্ডগুলির ওজন ও মানের জামিনদার । এই থেকে জানা যায়, প্রাচীন লিডীয় অঞ্চলে খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে এক ধরনের আদিম টাকার প্রচলন হয়েছিল ।

লোহার পেরেক দিয়ে এই·খণ্ডগুলির একদিক চিহ্নিত করা হত । অথবা কোনও দণ্ডের সাহায্যে ধাতব খণ্ডগুলির একদিকে ছাপ দিয়ে এক বা একাধিক খাঁজকাটা গর্ত (incuse) করে দেওয়া হত । অন্য দিকটি হত চিহ্নবিহীন ও অমসৃণ বড়জোর আঁচড়ের মতো দাগ কাটা । সম্ভবত ছাপ মারার সুবিধার জন্য এগুলিকে একটু গরম করে নেওয়া হত । এইরকমই কিছু খণ্ড গিগেসের সময় তৈরি হয়েছিল বলে মনে করা হয় । অবশ্য এগুলি যে রাজার টাঁকশালেই তৈরি এমন কোনও নিশ্চিত প্রমাণ নেই । কোনও দায়িত্বশীল বণিক বা বণিক সম্প্রদায়ও

কেনাবেচার সুবিধার জন্য এগুলি তৈরি করে থাকতে পারেন । এই প্রসঙ্গে হেলিকারনাসুসে আবিষ্কৃত আনুমানিক ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের এক শ্রেণীর মুদ্রা উল্লেখযোগ্য । এগুলির একদিকে নকশাখচিত খাঁজকাটা গর্ত, আর অন্যদিকে হরিণের ছবি সহ একটি গ্রিক লেখ 'ফিনোস এমি সেমা', অর্থাৎ 'আমি ফ্যানেসের চিহ্ন' । এই ফ্যানেস কোনও রাজা নন, হয়তো কোনও দায়িত্বশীল বণিক অথবা মুদ্রাব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত কোনও ব্যক্তি । এ ছাড়াও আর-এক ধরনের মুদ্রা পাওয়া যায় । সেখানে একদিকে তিনটি খাঁজকাটা গর্ত এবং অন্যদিকে রাজকীয় চিহ্ন সিংহের সম্মুখভাগ । এ ছাড়া কয়েকটিতে এক লেখ আছে, যাতে বোধ হয় রাজা অল্যাত্তেসের (খ্রিস্টপূর্ব ৬১০-৫৬১) উল্লেখ আছে ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, লিডীয় অঞ্চলে নির্দিষ্ট ওজনের খণ্ড বা পিণ্ডকে আদিম মুদ্রায় বা টাকায় রূপান্তরিত করতে প্রথমে পেরেক ঠুকে চিহ্ন দেওয়া হত বা খাঁজকাটা গর্ত করা হত । এই গর্তে অনেক সময় ছোট আকারের নকশা খোদাই করা থাকত । ধাতব দণ্ডের যে অংশ দিয়ে আঘাত করে গর্ত করা হত তার উপরে থাকত ওই নকশার নঞর্থক রূপ (negative impression) । ছাপ দেওয়ার পর তার বাস্তব রূপ(positive impression) ফুটে উঠত গর্তের মধ্যে । পরে এই নকশা ছাড়াও দায়িত্বশীল ও বিশ্বাসভাজন কোনও ব্যক্তি বা ব্যবসায়িক শ্রেণীর (guild) অভিজ্ঞান ব্যবহার করা হত । বোধ হয় নামমুদ্রায়

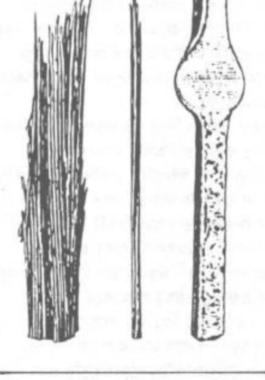

আর্গসের হেরার মন্দিরে আবিষ্কৃত লোহার শিক ও পাত, যা একসময় ছিল বিনিময়ের মাধ্যম

সাইরাকিউসের তামা বা ব্রোঞ্জের মুদ্রা (আনুমানিক ৪১০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) ।

আক্রাগসের তামা বা ব্রোঞ্জের মুদ্রা (আনুমানিক ৪২০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) ।

(seal) উৎকীর্ণ ছবিই এখানে ব্যবহার করা হত । কিছু পরে রাজ্যের সব অঞ্চলেই সমানভাবে টাকা ব্যবহারের সুবিধার জন্য রাজার ছাপ ব্যবহার চালু হয় ।

লিডিয়াতে যে ইলেকট্রাম ব্যবহার করা হত তা ওই অঞ্চলেরই এক খনিজ দ্রব্য । এটি সোনা ও রুপো মিশ্রিত একটি ধাতু । ইলেকট্রামে সোনা ও রুপোর কোনও নির্দিষ্ট আনুপাতিক হার ছিল না । ফলে এগুলির আপাতমূল্য বা ঘোষিতমূল্য ঠিক থাকলেও খাঁটি মূল্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া সম্ভব ছিল না । এই অসুবিধে দূর করবার জন্য লিডিয়ার রাজা ক্রেসুস বা ক্রেসাস (৫৬১-৫৪৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) ফিনিসীয় স্টেটার ওজনের ইলেকট্রাম মুদ্রার বদলে আলাদা-আলাদাভাবে রুপো ও সোনার মুদ্রার প্রচলন করেন । এই খণ্ডগুলিতে নকশা সমেত খাঁজকাটা গর্ত ছাড়াও সিংহ ও বলদের সম্মুখভাগ দেখা যায়। সোনার খণ্ডগুলি ব্যাবিলনীয় স্বর্ণ স্টেটার (১২৬ গ্রেনের) বা তার ভগ্নাংশ ওজনের । রুপোর খণ্ডগুলি ব্যাবিলনীয় রৌপ্য স্টেটার ১৬৮ গ্রেন বা তার ভগ্নাংশ ওজনের । নির্দিষ্ট ওজন ও মানের ছোট-ছোট রৌপ্য বা স্বর্ণখণ্ড নিয়ে নিয়মিত বাণিজ্যের, বিশেষত দূরপাল্লার বাণিজ্যের অনেক সুবিধা । ইজিয়ান সাগরের পূর্ব ও পশ্চিম তীরের মধ্যে সামুদ্রিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এর সুবিধা আরও বেশি । ফলে মুদ্রার ব্যবহার ছড়িয়ে গেল পূর্ব তীর থেকে পশ্চিম তীরে এবং তীরবর্তী দ্বীপমালায় ।

খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ ইজিনা দ্বীপে এবং ক্রমে-ক্রমে সাইক্লোডেস, ইজিয়ান ও স্পোরাডেস দ্বীপপুঞ্জে এবং গ্রিসের অন্তর্গত ইউবিয়া, আথেন্স, মাগারা, করিন্থ প্রভৃতি অঞ্চলে টাকার প্রচলন হল । আর্গসের রাজা ফিডন টাকা প্রবর্তনের আগে দ্রব্য অর্থ বা নির্দিষ্ট ওজনের ধাতুর দ্রব্য হিসেবে ব্যবহৃত লোহার শিক হেরার মন্দিরে উৎসর্গ করেছিলেন, এটা যেন পুরনো বিনিময় মাধ্যমকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাদ দিয়ে নতুন এক মাধ্যমকে গ্রহণ করা । পুরনো মাধ্যমে শিকগুলির নাম ছিল 'ওবল' (obolos) । কিছু ওবলে (সাধারণত ছ'টি) একটা মুঠি ভর্তি হত, যাকে গ্রিক ভাষায় বলা হত, দ্রাখ্‌মি (drachme), যার অর্থ 'মুঠো ভর্তি' । নতুন মাধ্যমে ক্ষুদ্রতম রৌপ্যমুদ্রার নাম হল 'ওবল' এবং ছয় ওবল মূল্যে এক রৌপ্য দ্রাখ্‌মার সমান বলে স্বীকৃত হল ।

গ্রিসের পশ্চিমে ইতালিতে (সাইবারিস, মেটাপনটাম ইত্যাদিতে) ও সিসিলিতে (সাইরাকিউসে) রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন হয় খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই । একই কথা বলা যায় উত্তর আফ্রিকার ভূমধ্যসাগরবর্তী গ্রিসীয় বা হেলেনীয় উপনিবেশ সাইরিন সম্পর্কে । এদিকে এগুলিরও পূর্বে ইজিয়ান সাগরের পূর্বদিকের আইওনীয় (বা য়োন) বা উপনিবেশগুলির সঙ্গে টাকার পরিচয় হয়ে গেছে (খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে) ।

এইভাবে পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপের হেলেনীয় সভ্যতাশ্রিত অঞ্চলে খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে যে মুদ্রাব্যবস্থার প্রচলন হল তা ছিল প্রধানত রৌপ্যভিত্তিক । রুপোর মুদ্রার নাম ওবল এবং দ্রাখ্‌মা । ছয় ওবলে এক দ্রাখ্‌মা ; কিন্তু সব অঞ্চলে দ্রাখ্‌মার ওজন এক ছিল না । আথেন্সের দ্রাখ্‌মা, যা ক্রমে-ক্রমে মানের উৎকর্ষে বিভিন্ন বাণিজ্য-কেন্দ্রে বিনিময়ের মাধ্যম হয়ে উঠেছিল, তার ওজন ছিল ৬৭·২ গ্রেন । এক শ্রেণীর বিখ্যাত আথেনীয় দ্রাখ্‌মায় একদিকে দেখা যায় দেবী আথিনাকে এবং অন্যদিকে প্যাঁচা ও গ্রিক লেখ 'আথি' (Athe) । একসময় বহু দেশে মানের উৎকর্ষের জন্য এর চল হয়েছিল । (ক্রমশ)

ধারাবাহিক উপন্যাস

# উদাসী রাজকুমার

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

মাঝরাত থেকেই বৃষ্টি পড়ছে ঝমঝমিয়ে, বাতাস বইছে শনশনিয়ে। শীত পড়েছে জবর। এইসব রাতে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোতেই মজা লাগে। অনেকেই ঘুমোয় বটে, কিন্তু সকলের পক্ষে সেই আরাম জোটে না। কারাগারের রক্ষীদের সারারাত জেগে থাকতে হয়। কখনও একটু ফাঁকি দিয়ে যে ঝিমিয়ে নেবে, তারও উপায় নেই। রক্ষীদের ওপরেও পাহারা দেবার জন্য থাকে অন্য রক্ষী।

রাজকুমার দৃঢ়কে যে-কক্ষটিতে রাখা হয়েছে, সেখানে পৌঁছতে হলে তিনজন প্রহরীকে পার হয়ে যেতে হয়। এ ছাড়া দু'জন প্রহরী একসঙ্গে পায়ের শব্দে পাথর কাঁপিয়ে সমস্ত দুর্গটা ঘুরে বেড়ায়। অন্য প্রহরীরা এই দু'জনের নাম দিয়েছে শুম্ভ-নিশুম্ভ, এদের গায়ে যেমন জোর, হাতিয়ারেরও তেমন শক্তি। কোনও রক্ষীকে সামান্য ফাঁকি দিতে দেখলেই এই শুম্ভ-নিশুম্ভ কঠিন শাস্তি দেয়। শীত কিংবা গ্রীষ্ম কোনও সময়েই এই শুম্ভ-নিশুম্ভের ক্লান্তি নেই।

পাহাড়ের ওপর এই দুর্ভেদ্য দুর্গের মধ্যে রোদ বা বৃষ্টি আসতে পারে না বটে, কিন্তু শীতের বাতাস কোনও বাধা মানে না।

প্রত্যেক প্রহরীর সামনে দাউ দাউ করে মশাল জ্বলছে। তারা সেই আগুনে হাত সেঁকছে বসে বসে। সারারাত তো আর কোনও কাজ নেই, শুধু জেগে বসে থাকা।

একজন প্রহরী হঠাৎ একটা শব্দ পেয়ে সচকিত হয়ে সামনের দিকে তাকাল। দূরে একটা ছায়ামূর্তি দেখে সে তুলে নিল বর্শাটা।

ক্রমে ছায়ামূর্তিটা কাছে এলে চিনতে পারল সে। এও আর একজন রক্ষী, এর নাম বজ্রপাণি। সে একটা পা টেনে টেনে হাঁটছে। গায়ে একটা কম্বল জড়ানো। প্রহরীটি একটু অবাক হল, বজ্রপানির তো এই সময়ে ঘুরে বেড়াবার কথা নয়। সে আজ থেকে বন্দীদের ঘরে খাবার দেবার ভার পেয়েছে। সে কাজ হয়ে গেছে অনেক আগে, এখন তো তার নাকে তেল দিয়ে ঘুমোবার সময়!

রক্ষীটি জিজ্ঞেস করল, "কী হে, বজ্রপাণি, অসময়ে এখানে এলে কী মনে করে?"

বজ্রপাণি ছদ্মনামে জয়পাল বলল, "এত শীত, কিছুতেই ঘুম আসছে না। মনে হয় যেন বিছানার নীচে বরফের চাঁই! তবু হেঁটে বেড়ালে গা গরম হয়!"

রক্ষীটি বলল, "যা বলেছ ভাই ! এরকম শীত সারা জন্মে দেখিনি ! আঙুলের ডগাগুলো যেন ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে।"

জয়পাল বলল, "তবু তো তোমার এখানে মশালের আগুন আছে, একটুখানি হাত সেঁকে নি', কী বলো ?"

রক্ষীটি বলল, "হ্যাঁ, বোসো, বোসো, একটু গল্প করা যাক !"

জয়পালের ডান পায়ের পাতায় একটা ন্যাকড়া বাঁধা। সে বেশ কষ্ট করে বসল। আগুনের ওপর হাত রেখে বলল, "একে পায়ে ব্যথা, তার ওপর এমন শীত, এর মধ্যে কি আর ঘুমোবার উপায় আছে ?"

রক্ষীটি জিজ্ঞেস করল, "পায়ে কিসের ব্যথা ? চোট লাগল কোথায় ?"

জয়পাল বলল, "চোট লাগাইনি। কিন্তু কী যে একটা পোকা কামড়াল কে জানে ! পা-টা অনেকখানি ফুলে গেছে। অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে !"

রক্ষীটি বলল, "সে কী হে,বজ্রপাণি,কিসে কামড়াল, দেখি, দেখি, ন্যাকড়াটা খোলো তো, জায়গাটা দেখি একবার।"

জয়পাল ন্যাকড়াটা খুলে পা-টা ছড়িয়ে দিল সামনের দিকে।

রক্ষীটি ঝুঁকে দেখতে যেতেই জয়পাল দু' হাতে চেপে ধরল তার গলা। রক্ষীটি ছটফট করতে লাগল,কিন্তু টুঁ শব্দটি বার করতে পারল না। জয়পাল তাকে বজ্রআঁটুনি দিয়ে ধরে রাখল। এক সময় রক্ষীটি জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেই জয়পাল তাকে শুইয়ে দিল এক অন্ধকার কোণে।

পায়ে আবার ন্যাকড়া জড়িয়ে জয়পাল এবার গেল আরও খানিকটা দূরে দ্বিতীয় প্রহরীটির দিকে। তাকেও ওই একই ভাবে অজ্ঞান করে ফেলতে বেশি সময় লাগল না।

তৃতীয় প্রহরীটিকে নিয়ে খানিকটা মুশকিল হল।

সে একটু গম্ভীর ধরনের, গল্প করতে চায় না। জয়পালের পায়ের ব্যথা সম্পর্কেও সে কোনও আগ্রহ দেখাল না।

জয়পাল চায় নিঃশব্দে কাজ সারতে। প্রহরীটিকে একেবারে মেরে ফেলতেও চায় না। কিন্তু লোকটি একটু অসাবধানী না হলে সে তার গলা টিপে ধরবে কী করে ? বেশি সময়ও নষ্ট করা যাবে না।

সুতরাং বাধ্য হয়েই সে চলে যাবার ভান করে, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের তলোয়ারের উলটো পিঠ দিয়ে তৃতীয় প্রহরীটির মাথায় একটা আঘাত করল। সেই এক আঘাতেই লুটিয়ে পড়ল প্রহরীটি। তার আর জ্ঞান ফিরবে কি না কে জানে !

সেই প্রহরীর কোমর থেকে তার তলোয়ারটি খুলে নিয়ে জয়পাল এগিয়ে গেল রাজকুমার দৃঢ়র ঘরের দিকে।

সন্ধের সময় এই রাজকুমারের সঙ্গে খানিকটা কথা হয়েছে।

জয়পাল আত্মপরিচয় দিয়ে রাজকুমারকে তার মায়ের বার্তা জানিয়েছিল।

এখন সে ভিতরে এসেই বলল, "রাজকুমার, চলুন !"

দৃঢ় ঘুমিয়ে ছিল, আচমকা জেগে উঠে সে প্রথমে কিছুই বুঝতে পারল না। সব যেন সে ভুলে গেছে। সে অবিশ্বাসের সুরে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাব !"

জয়পাল বলল, "চলুন, দেরি করার সময় নেই। আপনি মুক্তি পেতে চান না ? এখন কেউ আমাদের বাধা দিতে পারবে না !"

দৃঢ় যেন খানিকটা ভয় পাওয়া গলায় বলল, "এই দুর্গে অনেক প্রহরী, আমি চক্ষে দেখতে পাই না। বাইরে বেরিয়ে তাদের সঙ্গে লড়াই করব কী করে ! তোমার সঙ্গে গেলে আমরা দু'জনেই মরব।"

জয়পাল বলল, "আপনি ভয় পাচ্ছেন কুমার ? এখন গভীর রাত, বাইরে অন্ধকার। আপনি তো অন্ধকারের মধ্যে ঠিকই দেখতে পান। আপনি লড়তে পারবেন না ? সিংহের বাচ্চা সিংহই হয়। আপনি কার ছেলে সেটা ভেবে দেখুন। আপনার মাকে উদ্ধার করবেন না ? আপনার বাবার হত্যার শোধ নেবেন না ?"

দৃঢ় বলল, "এখন গভীর রাত ? অন্ধকার ? আমি যে এখানে দিন আর রাতের কোনও তফাতই দেখতে পাই না। হ্যাঁ, আমি অন্ধকারের মধ্যে যেতে পারব। কিন্তু জয়পাল, দিনের আলো ফুটলে কী হবে ? তখন যে আমার চোখে খুব ব্যথা করবে ?"

জয়পাল বলল, "দিনের আলোয় আমি আপনার চোখ বেঁধে দেব। আমি আপনার হাত ধরে নিয়ে যাব। আর দেরি করবেন না, চলুন।"

দু'জন দুটি খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে সাবধানে বাইরেটা একবার দেখে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ঘর থকে। কোথাও কোনও শব্দ নেই। জয়পাল মনে মনে হিসেব করে নিয়েছে যে শুম্ভ-নিশুম্ভর সারা দুর্গটা একবার ঘুরে এখানে আসতে এখনও খানিকটা দেরি আছে, তার আগেই প্রবেশদ্বারের কাছে পৌঁছতে হবে।

রাজকুমার দৃঢ় অন্ধকারের মধ্যে বেশ সাবলীলভাবে এগিয়ে যেতে লাগল। জয়পাল তার হাত টেনে বলল, "অত তাড়াতাড়ি নয়, কুমার। হঠাৎ কেউ এসে পড়লে বিপদ হবে।"

দৃঢ় বলল,"আমার মা কোন দিকে আছেন ? আমি শীঘ্র সেদিকে যেতে চাই। কতদিন মাকে দেখিনি। আমি আর ধৈর্য ধরতে পারছি না।"

জয়পাল বলল, "আপনার মায়ের কাছে যাওয়া এখনই কি ঠিক হবে ? ওদিকে পাহারা অনেক বেশি। আমরা ধরা পড়ে যেতে পারি।"

দৃঢ় বলল, "মাকে উদ্ধার না করে আমি একা পালাব ? তুমি বলছ কী জয়পাল ?"

জয়পাল বলল, "আমার মনে হয়, আগে আপনার একা চলে যাওয়াই ভাল, আপনি বাইরে গিয়ে দলবল জুটিয়ে একটা সৈন্যবাহিনী তৈরি করবেন। তারপর উদ্ধার করবেন আপনার মাকে। সেটাই ভাল হবে।"

দৃঢ় বলল, "মাকে ছেড়ে আমি একা কিছুতেই যাব না। একবার' অন্তত মায়ের সঙ্গে দেখা করতেই হবে !"

জয়পাল বলল, "চলুন, ওদিকটায় কিছুটা এগিয়ে দেখা যাক।"

তৃতীয় প্রহরী এখনও উপুড় হয়ে পড়ে আছে। কোনও সাড়াশব্দ নেই। জয়পাল আর দৃঢ় তাকে পার হয়ে চলে এল।

দ্বিতীয় প্রহরীটিকে জয়পাল চিত করে ফেলে গিয়েছিল, এখন সে উপুড় হয়ে আছে। জয়পাল আবার তার গলা চেপে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিল। ওর এক্ষুনি জ্ঞান ফেরার সম্ভাবনা নেই।

এখন প্রহরীটির কাছে আসতেই দূরে পাওয়া গেল এক জোড়া ভারী জুতোর শব্দ। জয়পাল বলল, "সর্বনাশ ! শুম্ভ-নিশুম্ভ-এর মধ্যে এদিকে এসে গেছে।"

শুম্ভ-নিশুম্ভ প্রত্যেকটি প্রহরীর কাছে এসে দেখে যে,তারা জেগে আছে কি না। সুতরাং ওরা দু'জন এখানে আসবেই জয়পাল মুহূর্তে একটা উপায় ভেবে নিল।

পাশেই দুর্গের একেবারে ওপরের গম্বুজে ওঠার সিঁড়ি। রাজকুমার দৃঢ়কে সে টেনে এনে দাঁড় করিয়ে দিল সেই সিঁড়ির পাশে। তারপর নিজে সে মশালটার কাছে বসে গেল প্রহরী সেজে। কম্বলটা দিয়ে মাথা ঢেকে রাখল অনেকখানি। শুম্ভ-নিশুম্ভ এসে তাকেই এখানকার প্রহরী মনে করবে।

দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে সে গুনগুনিয়ে একটা গান গাইতে লাগল।

জুতো খটখটিয়ে শুম্ভ-নিশুম্ভ নামের সেই দৈত্যের মতন দুই প্রহরী এসে দাঁড়াল জয়পালের পাশে। জয়পাল যেন ওদের দেখতেই পায়নি এমনভাবে গান গেয়েই চলল।

শুম্ভ হেঁড়ে গলায় হেসে বলল, "কী হে, খুব শীত করছে বুঝি? গান গাইলে শীত কমে?"

জয়পাল তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানিয়ে বলল, "আজ্ঞে না, তবে গান গাইলে ঘুম আসে না।"

নিশুম্ভ বলল, "ভাল, ভাল, গানের চর্চা করা ভাল, তবে আগে কোনওদিন তোমাকে গান গাইতে শুনিনি!"

শুম্ভ বলল, "এদিককার অন্য দু'জন প্রহরীর খবর কী? তাদের কোনও সাড়াশব্দ নেই কেন! তারা বুঝি ঘুমিয়েছে?"

জয়পাল উত্তর দিল, "না, না, তাদের সঙ্গে এই তো একটু আগেই আমার কথা হল। আমরা তিনজনেই মাঝে-মাঝে জায়গা বদলাবদলি করছি, তাতে গা গরম হয়।"

নিশুম্ভ বলল, "ভাল, ভাল, শীতের মধ্যে গা গরম করা ভাল। ওরা জেগে আছে, তা হলে আর ওদিকে গিয়ে কী হবে?"

শুম্ভ বলল, "তা ঠিক, তা হলে ওদিকে আর যাবার দরকার নেই। আর একটা চক্কর দিয়ে আসি, তারপর না হয় ওদের সঙ্গে বসা যাবে। ওহে, তুমি গান করো, আমরা চলি।"

শুম্ভ আর নিশুম্ভ পেছন ফিরে কয়েক পা মাত্র গেছে, এমন সময় অজ্ঞান প্রথম প্রহরীটি জ্ঞান ফিরে পেয়ে উঃ উঃ শব্দ করে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে শুম্ভ আর নিশুম্ভ আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "কিসের শব্দ হল, কে উঃ বলল?"

জয়পাল মরিয়াভাবে বলল, "আজ্ঞে আমি। হঠাৎ আমার পেটটা ব্যথা করে উঠল, আমার অম্লশূল আছে কি না। তাই যখন তখন পেট ব্যথা করে।"

শুম্ভ বলল, "অম্লশূল? বেশি করে তেতো খাবে। উচ্ছে আর করলা।"

জয়পাল বলল, "নিশ্চয়ই খাব। আপনি বলছেন যখন।"

শুম্ভ-নিশুম্ভ দ্বিতীয়বার যাবার জন্য পা তুলতেই প্রথম প্রহরী আবার চেঁচিয়ে উঠল, "উঃ, মরে গেলাম! এক বিশ্বাসঘাতক আমার গলা টিপে ধরেছিল!"

শুম্ভ আর নিশুম্ভ সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার উঁচিয়ে ধরল।

জয়পাল বুঝতে পারল যে আর উপায় নেই। সে এক লাফে চলে এল গম্বুজের সিঁড়ির পথে। রাজকুমার দৃঢ়র হাত ধরে দ্রুত উঠতে লাগল ওপরের দিকে।

এই সিঁড়িটা উঠে গেছে গম্বুজের মাথায়। সেখানে ছোট্ট একটা গোল ছাদ। তারপর আর কিছু নেই। একদিকে খাড়া দেওয়াল নেমে গেছে, অনেক নীচে বয়ে যাচ্ছে একটা নদী। এখান থেকে পালাবার কোনও পথ নেই, শুম্ভ আর নিশুম্ভ ধেয়ে এলে তাদের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করতে হবে। বাঁচার একমাত্র পথ শুম্ভ আর নিশুম্ভকে হত্যা করা।

জয়পাল বলল, "কুমার, আমরা কিছুতেই ধরা দেব না, যদি মরতে হয়, যুদ্ধ করেই মরব।"

রাজকুমার দৃঢ় বলল, "ওরা তো মোটে দু'জন। তবে ভয় কিসের?"

শুম্ভ প্রথমে উঠে এসে জয়পালকে বলল, "ওরে শয়তান, তুই আমাদের চোখে ধুলো দিবি, ভেবেছিস।"

জয়পাল তার তলোয়ার তুলে শুম্ভকে বাধা দিয়ে বলল, "ইনি আমাদের যুবরাজ। আমাদের প্রিয় মহারাজ মহাচূড়ামণির পুত্র। যুবরাজকে অন্যায়ভাবে বন্দী করে রাখা হয়েছে।"

শুম্ভ হা-হা করে হেসে উঠে বলল, "এখন আবার মিথ্যে কথা বলে আমাদের ভোলাতে চাস! আমাদের যুবরাজের নাম তীক্ষ্ণ, তা কে না জানে!"

নিশুম্ভ এই সময় এসে আক্রমণ করল দৃঢ়কে। চারজনে লড়ে যেতে লাগল সেই ছোট্ট ছাদে। তলোয়ারের ওপর তলোয়ারের আঘাতে ছিটকাতে লাগল আগুনের স্ফুলিঙ্গ। শুম্ভ আর নিশুম্ভ খুব সাহসী আর অভিজ্ঞ যোদ্ধা। রাজকুমার দৃঢ় বহুদিন হাতে তলোয়ার ধরেনি। জয়পাল প্রাণপণে লড়ে গিয়েও সামলাতে পারছে না। এ-পক্ষের পরাজয় নিশ্চিত।

আরও দু'জন প্রহরী উঠে এল গম্বুজের চূড়ায়।

জয়পাল জানে, ধরা দিলে তাদের চরম অত্যাচার ও অপমান সহ্য করতে হবে। তারপর মৃত্যু। মরতে যদি হয়ই তা হলে শুধু শুধু এদের হাতে ধরা দেওয়া কেন?

সে চিৎকার করে বলে উঠল, "রাজকুমার, আমরা জিততে পারব না। নদীতে লাফ দাও!"

সে আগে ঠেলে দিল রাজকুমার দৃঢ়কে, তারপর নিজে ঝাঁপিয়ে পড়ল অন্ধকার অতলে।

শুম্ভ আর নিশুম্ভ দৌড়ে এসেও তাদের ধরতে পারল না। প্রাচীর ধরে ঝুঁকেও দেখা গেল না সেই দু'জনকে। (ক্রমশ)

*ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়*

ডাইভিং মানে শুধুমাত্র মাথা নিচু করে জলে ঝাঁপ দেওয়া নয়। এটা বড় মাপের একটা শিল্প। দেহসৌষ্ঠব, সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ইত্যাদি সবকিছুই এখানে রীতিমত প্রয়োজনীয়। আন্তর্জাতিক ডাইভিং প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীরা সাধারণত ৩ মিটার (প্রায় ১০ ফুট) স্প্রিংবোর্ড এবং ১০ মিটার (৩৩ ফুট) হাইবোর্ড থেকে জলে ঝাঁপ দেন। প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের অবশ্য একটু নিচু স্প্রিংবোর্ড থেকে ঝাঁপানো শুরু করা উচিত। তাকে প্রথমে জলের নীচে মাথা রাখা শিখতে হবে। 'সুইমিং বাথ'-এর পাশ থেকে শরীরটা আলতো করে বাতাসে ছেড়ে জলে দাঁড়িয়ে 'ডাইভ' করতে হবে, 'বাথ'-এর জলের নীচের জিনিসপত্র কুড়িয়ে নিতে হবে। শ্বাসরুদ্ধ না হয়েও সে যখন জলের নীচে থাকতে পারার মতো আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে পারবে, তখনই সে 'এন্ট্রি ডাইভ' দেওয়ার ছাড়পত্র পাবে।
খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে পায়ের আঙুল দিয়ে বোর্ডের ধারটা চেপে ধরতে হবে। দুই হাঁটু সোজা রেখে ডাইভার এবার কোমরটাকে সামনের দিকে বাঁকিয়ে দেন। হাত দুটোকে দু'পাশে এমনভাবে ছড়িয়ে দেন, যাতে হাত দুটো কাঁধের সঙ্গে একই সমতলে থাকে। হাত দুটো অবশ্য এমনভাবে সামনে রাখা হয় যাতে হাতের তালু দুটো জলের দিকে মুখ করে থাকে। এবার জলের নীচে কোনও একটা বিন্দুতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে, পায়ের আঙুল দিয়ে স্প্রিংবোর্ডে চাপ দিয়ে ডাইভার শরীরটাকে ছেড়ে দেন। দেহ যত সোজা হতে থাকে, তিনি হাত দুটোকে তত তাঁর কানের দু' পাশে নিয়ে আসেন এবং মাথাটা নীচের দিকে ঝুঁকিয়ে দিতে থাকেন। এইভাবে 'ডাইভার' একটি সরলরেখা সৃষ্টি করে জলের মধ্যে পড়তে থাকেন।
শিক্ষার্থীকে প্রথমে এই ডাইভিং কায়দাটি ভালভাবে রপ্ত করতে

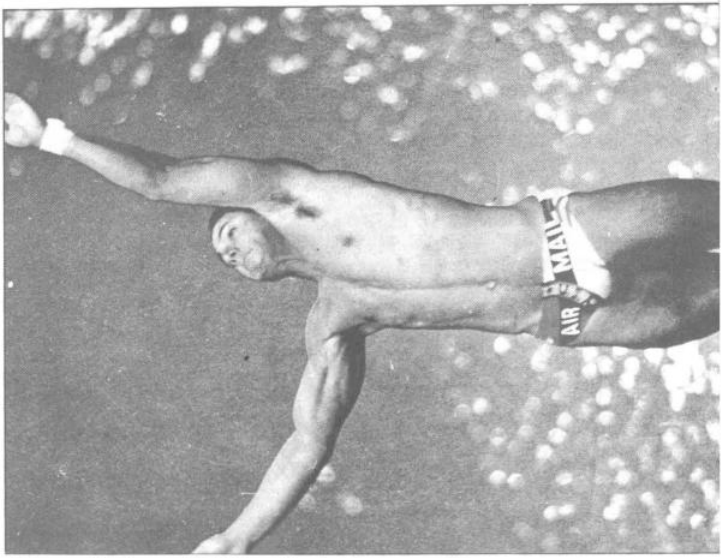


*ডাইভিং-এর শ্রেষ্ঠ শিল্পী গ্রেগ লুগানিস (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)*

# ডাইভিং এক বড় মাপের শিল্প

## হাইবোর্ড থেকে জলে ঝাঁপ দেওয়ার মধ্যে আছে সাহস ও সৌন্দর্য

হবে। প্রথমে কোমরটাকে অল্প বাঁকিয়ে পায়ের আঙুল দিয়ে সজোরে চাপ দেওয়া অভ্যাস করতে হবে, শেষে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে লাফানো অভ্যাস করতে হবে। এইবার সে 'সোয়ালো ডাইভ' দেওয়ার উপযুক্ত হয়েছে। এই ডাইভটি মূলত এক মিটার স্প্রিংবোর্ডে অভ্যাস করা হয়। ডাইভার প্রথমে কাঁধের সামনে হাত দুটো নিয়ে আসেন, তারপর হাত দুটো পাশে এনে ফেলে দেন। এবার তিনি হাত দুটো ওপরে তুলে নাড়াতে থাকেন, আস্তে-আস্তে সোয়ালো ডাইভ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হন। এন্ট্রি ডাইভের মতো এখানেও তিনি হাত দুটো বন্ধ রাখেন। এই একই ভঙ্গিতে 'পাইক ডাইভ' এবং 'টাক ডাইভ' শুরু করা হয়। পাইক ডাইভ-এ ডাইভার কোমরটাকে বাতাসে উঁচু করে তুলে হাত দিয়ে পায়ের আঙুল স্পর্শ করেন, তারপর সোজা হয়ে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য তৈরি হন। টাক ডাইভ-এ ডাইভার সোজা হওয়ার আগে পা দুটোকে দেহের নীচে মুড়ে ঢুকিয়ে দেন।
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় স্প্রিংবোর্ড ডাইভিংকে মূলত পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয় : (১) ফরওয়ার্ড ডাইভ (৩½ পাক ডিগবাজি খেতে হবে), (২) ব্যাকওয়ার্ড ডাইভ, (৩) রিভার্স (ডাইভার বোর্ডের সামনে মুখ করে থাকেন, কিন্তু জলে ঝাঁপান পিছন দিক দিয়ে), (৪) ইনওয়ার্ড (ডাইভার পেছন দিকে মুখ করে থাকেন, কিন্তু সামনের দিক দিয়ে ঝাঁপ দেন), (৫) টুইস্টিং ডাইভ। ডাইভিং প্রতিযোগিতায় প্রতিটি প্রতিদ্বন্দ্বীকে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় নানারকম ডাইভ দেখাতে হয়। কিছু ডাইভ বাধ্যতামূলক, কয়েকটি প্রতিদ্বন্দ্বীর ব্যক্তিগত ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ডাইভ-এর একটি নির্দিষ্ট 'প্রতিবন্ধক-মাত্রা' রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ২½ পাক ডিগবাজি খাওয়া রিভার্স ডাইভিং-এর প্রতিবন্ধক-মাত্রা ফরওয়ার্ড ডাইভিং-এর চেয়ে বেশি। বিচারকরা প্রতিযোগীদের প্রাপ্ত নম্বরকে প্রতিবন্ধক-মাত্রা দিয়ে গুণ করেন। বড়বড় ডাইভার এই কারণেই শক্ত-শক্ত ডাইভ দিতে আগ্রহী।

ডাইভিং বেশ জটিল খেলা, নিয়মিত অনুশীলন এবং প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধান দরকার। সুযোগ পেলে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরাও এই খেলায় কৃতিত্ব দেখাতে পারে। ১৯৬৮ সালে ব্রিটিশ বালক ব্রায়ান ফেল্পস মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে, ইউরোপের হাইবোর্ড চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল। তার প্রতিদ্বন্দ্বীরা তখন অনেকেই তার বাবার বয়সী।

## প্রশ্ন

(১) মার্টিনা নাভ্রাতিলোভার আত্মজীবনীর নাম কী ? **অঙ্কুর ঘোষ**, হিন্দু স্কুল ।

(২) সদ্য সমাপ্ত ভারত টেস্ট সিরিজে কোন দু'জন খেলোয়াড় তাঁদের জীবনের শততম টেস্ট খেলেছেন ? **পার্থ দত্ত**, সেন্ট হেলেন স্কুল ।

(৩) জার্মান সিলভার-এ শতকরা কত ভাগ সিলভার থাকে ? **বিক্রমজিৎ চক্রবর্তী**, মেদিনীপুর ।

(৪) ইংরেজি ছবি 'সিদ্ধার্থ'-এর সুরকার কে ছিলেন ? **বাপ্পা বসু**, কলকাতা ৪৬ ।

(৫) বাংলা সাহিত্যে কে প্রথম অকাদেমি পুরস্কার পান ? **লিপি ভট্টাচার্য**, বারাসাত ।

(৬) ইহুদিদের উপাসনা-গৃহকে কী বলা হয় ? **মৈত্রেয়ী সান্যাল**, বেলডাঙা ।

(৭) সত্যজিৎ রায়ের 'তিন কন্যা' ছায়াছবির তিনটি গল্পের নাম কী ? **সমীর রায়**, চেতলা ।

(৮) টিভি সিরিয়াল মহাভারতে শিখণ্ডীর ভূমিকায় কে অভিনয় করেছেন ? **নাম নেই** ।

(৯) 'গোল্ডেন গেট' গ্রন্থটির লেখক কে ? **ডোডো দাশগুপ্ত**, কলকাতা-১৪ ।

(১০) ভারতের কোন রাজ্যে লোকসভার আসন সর্বাধিক ? **আবদুর রব**, বর্ধমান ।

(১১) জালালউদ্দিন, ওয়াসিম আক্রম (পাকিস্তান), ব্রুস রিড (অস্ট্রেলিয়া) ও চেতন শর্মার (ভারত) মধ্যে মিল কোথায় ? **মিতা দে**, চেতলা ।

(১২) ১৯৮৯ সালে শান্তির জন্য কে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ? **সৌম্যেন মন্ডল**, ভোগপুর ।

(১৩) ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নাম কী ? **তমাল সাহা**, কল-৯ ।

(১৪) ভারতের সর্বকনিষ্ঠ টেস্ট ক্রিকেটার কে ? **রাজীব হাজরা**, রসুলপুর ।

(১৫) 'নিষিদ্ধ নগরী' কোনটি ?

নিল ও'ব্রায়েন

**দোলনচাঁপা সেনগুপ্ত**, ঝাড়গ্রাম ।

(১৬) মহাভারতে অর্জুনকে যুদ্ধে একমাত্র কে পরাস্ত করেছিলেন ? **দেবাশিস মাইতি**, মেচেদা ।

(১৭) এবারের নিউজিল্যান্ড সফরে ভারতীয় ক্রিকেট-দলের ম্যানেজার কে ? **অজয় পাল**, বেহালা ।

(১৮) বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় অবস্থিত ? **রিনা দেব**, কলকাতা-১৭

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

## গত সংখ্যার উত্তর

(১) Cricket Life. সম্পাদক ইমরান খান ।
(২) মাইকেল গ্রস।
(৩) প্যানথেরোলিও ।
(৪) পিতা উইলিয়ম ব্রাগ ও পুত্র লরেন্স ব্রাগ । পদার্থবিজ্ঞানে ।
(৫) পারদ ও ব্রোমিন ।
(৬) জর্জ বার্নার্ড শ ।
(৭) রমেশচন্দ্র দত্ত ।
(৮) তমস ।
(৯) কেনিয়ার ।
(১০) জওহরলাল নেহরুর ।
(১১) কৃষ্ণসেন, চিত্রসেন, বৃষকেতু। সত্যসেন, সুষেণ নামও পাওয়া যায়।
(১২) ব্রাজিলের মারাকানা স্টেডিয়াম ।
(১৩) ফ্রাঙ্ক ।
(১৪) বরিস বেকার ।
(১৫) গুফি পেন্টাল ।
(১৬) ব্রোঞ্জ ।
(১৭) সত্যজিৎ রায় ।
(১৮) স্বর্ণযুগ ।
(১৯) ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর মিলিত প্রবাহের নাম ।

ইমরান খান

জওহরলাল নেহরু

বরিস বেকার

মাইকেল গ্রস

কুইজ

## বিষয় : কলকাতা

### প্রশ্ন

(১) কলকাতার সবচেয়ে পুরনো মেয়েদের কলেজ দুটি কী কী ?
(২) কলকাতার কোন অঞ্চল দোমিনিক লাপিয়ের-এর 'সিটি অব জয়' উপন্যাসের পটভূমি ?
(৩) 'পূর্ণ' সিনেমার প্রাচীন নাম কী ?
(৪) কলকাতা শহরের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা 'ব্যান্ড-পার্টি'কে কী বলেন ?

রবার্ট ক্লাইভ

(৫) 'রসমালাই' কে আবিষ্কার করেছিলেন ?
(৬) নেলসন ম্যান্ডেলা পার্ক কোথায় ?
(৭) কলকাতা চিড়িয়াখানার উদ্বোধন কে করেছিলেন ?

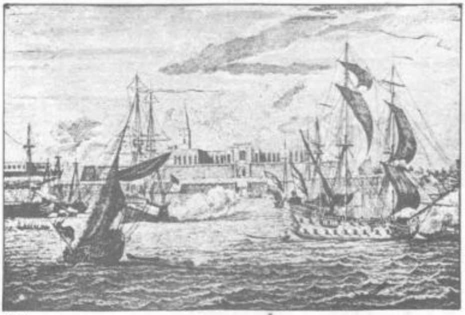

(ক)

### প্রশ্ন

(ক) পুরনো কলকাতার কোন জায়গার ছবি ?
(খ) নদী, না নালা ? কিসের ছবি ?
(গ) সদ্য প্রকাশিত এই বইটির নাম 'কুইজিক্যাল' রাখা হল কেন ?

(গ)

(খ)

ছবির পরিচয় : (ক) গঙ্গার তীরে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম। (খ) টালির নালা। (গ) কলকাতাকে বলা হয়েছে 'কুইজে ভারতের রাজধানী'। বইটি থেকে জানা যায়, ২৩ বছর আগে কলকাতাতেই প্রথম প্রকাশ্যে কুইজের অনুষ্ঠান হয়েছিল। আর এখন সর্বত্র কুইজ সমাদৃত হয়েছে।

মহাজাতি সদন

(৮) বিড়লা তারামণ্ডলকে কোন বিখ্যাত স্থাপত্যের আদলে গড়া হয়েছে ?
(৯) সিমলা স্ট্রিট (অধুনা ডঃ নারায়ণ রায় সরণি) নামের উৎস কী ?
(১০) কর্নেল রবার্ট কিড-এর অক্লান্ত চেষ্টায় এবং অদম্য উৎসাহে এই শহরে একটি প্রধান দ্রষ্টব্য জায়গা গড়ে উঠেছিল। জায়গাটির নাম কী ?
(১১) এই শহরের প্রাচীনতম সমাধিটি রেজা বিবির সমাধি। এটি কোথায় অবস্থিত ?
(১২) সুমাত্রা বালি কোথায় রয়েছে ?
(১৩) মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর কে স্থাপন করেছিলেন ?
(১৪) কোন ফুটবল খেলোয়াড়কে 'কুট্টি' বলে ডাকা হত ?
(১৫) কোন বাঙালি লেখকের ডাকনাম 'তাতা' ?
(১৬) নিউ মার্কেটের মাঝখানে রাখা বন্দুকটা কোন যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত হয়েছিল ?
(১৭) ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের জায়গায় আগে কী ছিল ?
(১৮) রবীন্দ্র সরোবরের শিশু-উদ্যানে রাখা টয় ট্রেনটির নাম কী ?
(১৯) কার চেষ্টায় 'চিলড্রেন'স লিটল থিয়েটার' (সি এল টি) গড়ে উঠেছিল ?
(২০) কলকাতাকে কে প্রথম 'প্রাসাদের শহর' বলেছিলেন ?

উত্তর : (১) বেথুন কলেজ ও ভিক্টোরিয়া কলেজ। (২) পিলখানা। (৩) রসা সিনেমা। (৪) 'ফু-ফু' ব্যান্ড। (৫) কে সি দাস। (৬) মেয়ো রোড (গুরু নানক সরণি) এবং চৌরঙ্গি-র (জওহরলাল নেহরু রোড) সংযোগস্থলে। (৭) প্রিন্স অব ওয়েলস সপ্তম এডওয়ার্ড। (৮) সাঁচি স্তূপ। (৯) শিমুল গাছ। (১০) বোটানিক্যাল গার্ডেন্স। (১১) আরমেনিয়ান গির্জাতে। (১২) হুগলিতে। (১৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (১৪) শিবাজি ব্যানার্জি। (১৫) সুকুমার রায়। (১৬) বুয়র যুদ্ধ। (১৭) প্রাচীন নগর কারাগার। (১৮) স্বপ্নপুরী। (১৯) সমর চ্যাটার্জি। (২০) রবার্ট ক্লাইভ।

*[এবারের সব প্রশ্নই নিল ও' ব্রায়ান ও ডেরেক ও' ব্রায়ান লিখিত 'কুইজিক্যাল— দ্য ক্যালকাটা কুইজ বুক' থেকে নেওয়া হয়েছে। কলকাতার ইতিহাস, মানুষ, জীবন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এই বইয়ে কলকাতার ওপর পাঁচশোরও বেশি প্রশ্ন রয়েছে। ]*

Amela—4 (7.3.90)

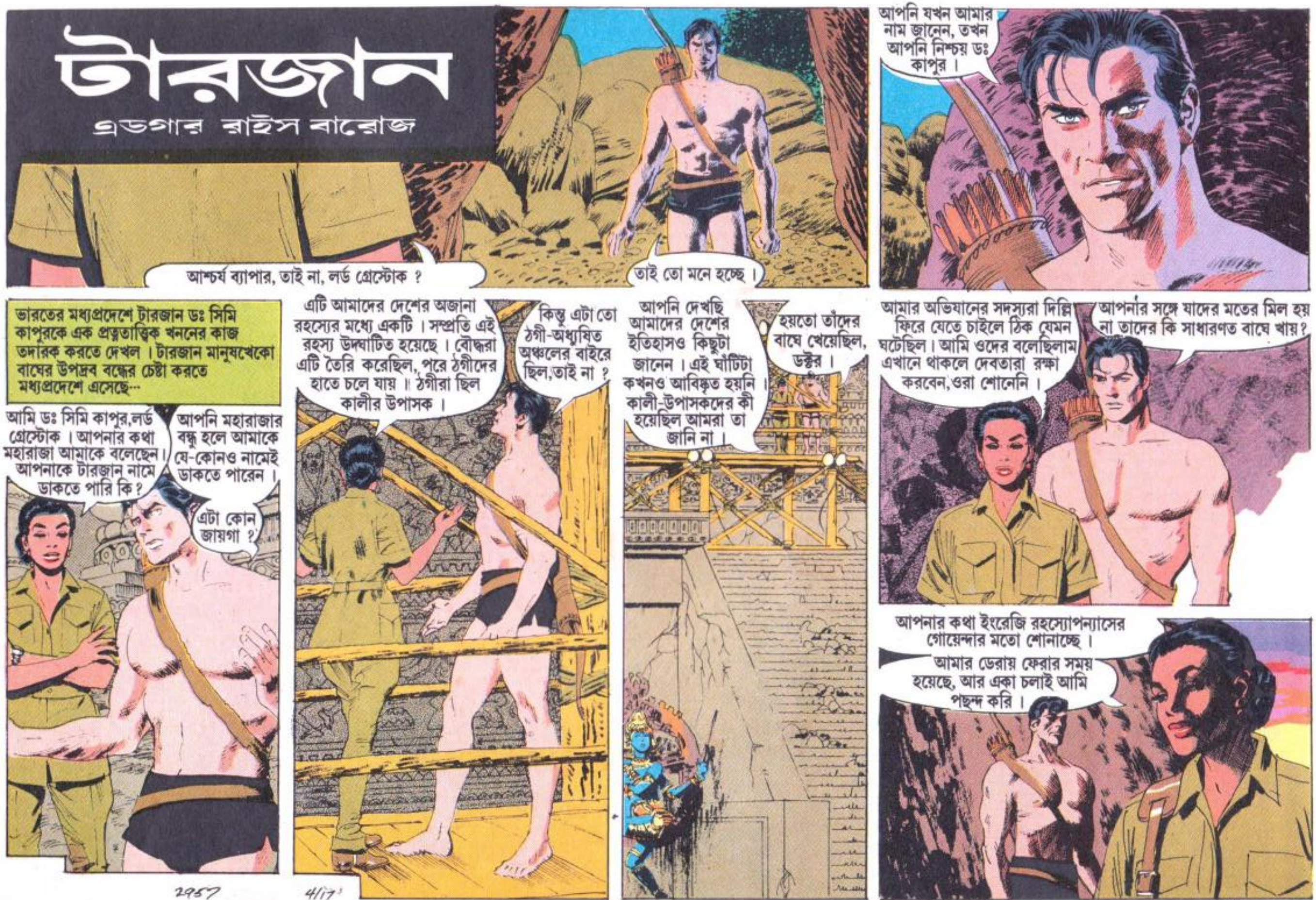


(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ইতিহাসের গল্প

# সিংহাসনের উত্তরাধিকার

চিত্রা দেব

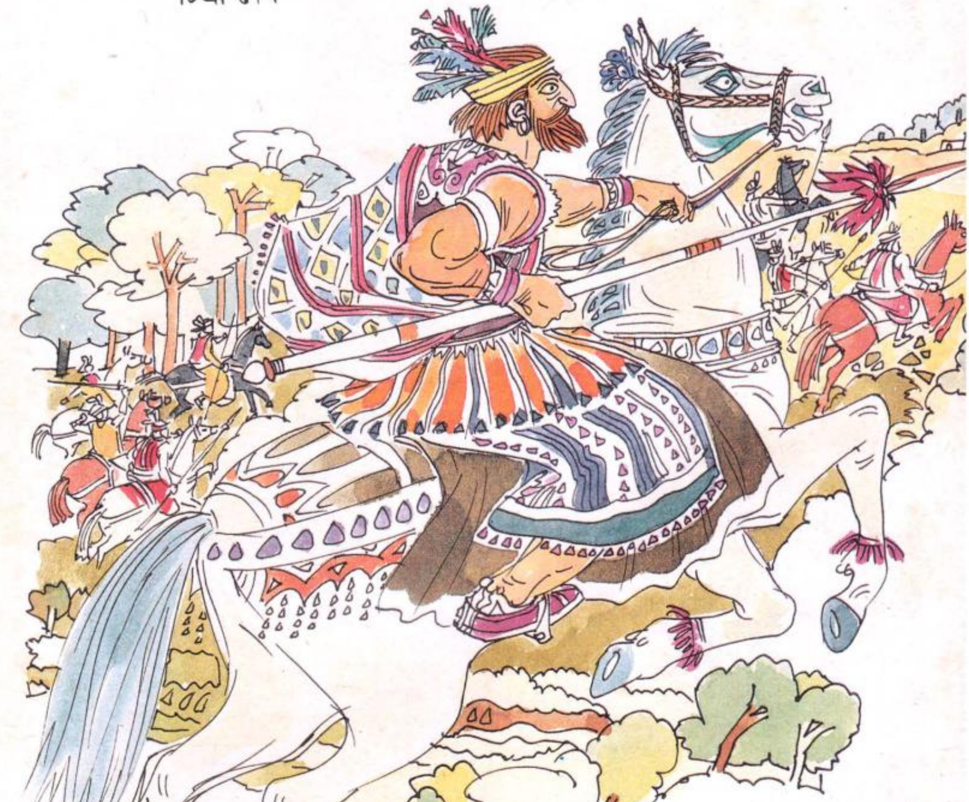

আমরা ইতিহাসে পড়ি ভারতের পশ্চিম সীমান্তে বারবার বিদেশী হানার কথা। শক, হূন, পাঠান, মুঘল—সকলেরই এদেশে আসার এবং আক্রমণের পথটা ছিল প্রায় একইরকম। কিন্তু আমাদের দেশে সব বিদেশী যে পশ্চিম থেকেই এসেছিলেন তা নয়, পুব দিক থেকেও আক্রমণ হত। আজ সেইরকম এক রাজবংশের কথাই বলব। পূর্বাঞ্চলে বিদেশীরা আসতেন বর্মা থেকে, শ্যাম থেকে, ভুটান থেকে, হয়তো বা চিন থেকেও। শ্যাম থেকে সানবংশীয় রাজারা কবে যে ব্রহ্মদেশের মৌলং-এ রাজ্যপাট সাজিয়ে বসে ছিলেন, তার হিসেব আমাদের না রাখলেও চলবে। মনে রাখব, মৌলং থেকে হঠাৎ একদিন চাও সুকাফা গোঁফে চাড়া দিয়ে, তীর-ধনুক উঁচিয়ে পদার্পণ করলেন এখনকার উজনি অসমে অর্থাৎ নাগা পাহাড়ের আশপাশ দিয়ে শিবসাগর জেলায়। তখন এসব জায়গার অন্য নাম ছিল। চাও সুকাফা নামটা বেশ জমকাল নয় কি? মানে হল, 'মহারাজা স্বর্গের বাঘ মহাশয়'। চারপাশের ঘন জঙ্গলে নামটিও বেশ

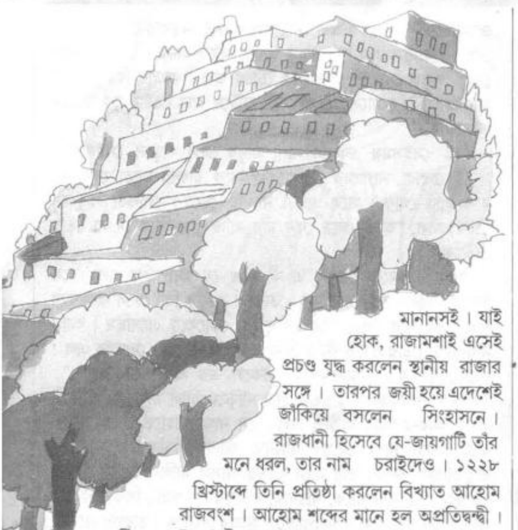

মানানসই। যাই হোক, রাজামশাই এসেই প্রচণ্ড যুদ্ধ করলেন স্থানীয় রাজার সঙ্গে। তারপর জয়ী হয়ে এদেশেই জাঁকিয়ে বসলেন সিংহাসনে। রাজধানী হিসেবে যে-জায়গাটি তাঁর মনে ধরল, তার নাম চরাইদেও। ১২২৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন বিখ্যাত আহোম রাজবংশ। আহোম শব্দের মানে হল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। পরবর্তীকালে এই নামই হয়েছে প্রথমে আসাম, পরে অসম।

আহোম রাজবংশ প্রায় ছ'শো বছর এদেশে রাজত্ব (১২২৮-১৮২৫) করেছিলেন, চাও সুকাফা থেকে স্বর্গদেব যোগেশ্বর পর্যন্ত উনচল্লিশজন রাজা। আহোমদের নিজস্ব ভাষা ছিল, ধর্ম ছিল, সামাজিক রীতিনীতিও ছিল। রাজাদের নিয়মকানুনও ছিল বিচিত্র রকমের। যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। পৃথিবীর সব দেশে যেমন নিয়ম আছে রাজার ছেলে রাজা হয়, ছেলে না থাকলে ভাই কিংবা নিকটবর্তী কেউ এবং তারপরে আবার তার ছেলে। আহোমদের মধ্যে ঠিক এ-নিয়ম ছিল না। সেখানে প্রজাদের এবং মন্ত্রীদের কিছুটা অধিকার ছিল রাজা নির্বাচনের। রাজার ছেলেই যে রাজা হবেন তা নয়, একটুখানি রাজরক্ত যাঁর শরীরে বইছে, তিনিই রাজা হতে পারতেন। কিন্তু একটা শর্ত ছিল, আহোমদের যিনি রাজা হবেন তাঁর শরীর নিখুঁত এবং সুন্দর হতে হবে। অন্ধ, খঞ্জ, মূক, বধির তো নয়ই, কারও আঙুলটা একটু বাঁকা, নাকটা বোঁচা, কানটা একটু কাটা হলেও চলবে না। তাই মনে হয়, যিনি যখন সিংহাসনে বসতেন, তিনিই চেষ্টা করতেন সিংহাসনের অন্য দাবিদারদের কান কেটে দিতে। শোনা যায়, রাত্তিরবেলা রাজা নিজে জেগে থেকে পাহারা দিতেন, পাছে কোনও শত্রু আসে। একবার এক রাজা তাঁর মামাকে নিয়ে রাত জেগে পাহারা দিচ্ছেন, কাকা, ভাই বা ভাইপোকে তো আর বিশ্বাস করা যায় না, তাঁরা রাজবংশের লোক, তাই মামা কিংবা শ্বশুরকেই তাঁরা বিশ্বাস করতেন বেশি। তা সেই ভাগনে-রাজা ঘুম থেকে উঠে মামার সঙ্গে জায়গা বদল করতে এসে দ্যাখেন, মামা সেখানে বসে-বসেই ঘুমোচ্ছেন। কী সর্বনাশ! এ যে বিশ্বাসঘাতকতা। ভাগনে-রাজা খাপ থেকে তলোয়ার খুলে কোপ দিলেন মামার গলায়।

ভারতীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে আহোম রাজারা ধীরে-ধীরে বদলাচ্ছিলেন। তাই সপ্তদশ রাজা গ্রহণ করলেন এদেশীয় নাম। আহোম রাজাদের সকলের নামের শুরুতে থাকত সু, মানে বাঘ আর শেষে ফা, মানে স্বর্গ। সব রাজাই স্বর্গের বাঘ। সুকাফা, সুতিফা, সুখাংফা প্রভৃতি এক-এক নামের অর্থ বড় বাঘ—ভয়ঙ্কর বাঘ, হিংস্র বাঘ, এই আর কি।

সপ্তদশ রাজা নাম নিলেন স্বর্গদেব প্রতাপ সিংহ। নামের অর্থ বদলাল না, 'স্বর্গদেব' কথাটিও রইল, আর রইল বাঘের বদলে সিংহ। অনেক নতুন নিয়ম হল। রাস্তাঘাট, সেতু তৈরি হল। নতুন রাজধানী উঠে এল গড়গাঁও-এ। তৈরি হল রাজবাড়ি বা কারেং।

যাক, যে-সময়ের কথা বলছি তখন আহোম রাজ্যে খুব বিপদ। একদিকে মুঘল আক্রমণের ভয়, অপরদিকে দুই মন্ত্রী—বড় গোহাইন আর বুড়া গোহাইনের নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে ঝগড়া। এই সময় সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা নিয়ে যিনি উঠে এলেন তিনি লালুকসোলা বড় ফুকন। বয়স্ক রাজাকে হত্যা করা হল। সিংহাসনে বসানো হল চোদ্দ বছরের কিশোর সুলিকফাকে। আহোমরা তাকে বলত লোরা রাজা বা খোকা রাজা। লালুকসোলা তার সঙ্গে হঠাৎ নিজের পাঁচ বছরের মেয়ের বিয়ে দিয়ে রাজার শ্বশুর হয়ে বসলেন। রাজ্য নিজের হাতে চালাবেন বলেই ফন্দি করে ছোট রাজাকে সিংহাসন দেওয়া। নিজের গায়ে রাজরক্ত থাকলে নিজে বসতেন সিংহাসনে। বুঝল সবাই কিন্তু কী আর করবে? যে-দেশের যা নিয়ম।

জামাইয়ের সিংহাসন নিষ্কণ্টক করবার জন্য লালুকসোলা ঘোষণা করলেন, দেশের যেখানে যত রাজবংশের লোক আছে সবাইকে ধরে আনা হোক। রাজার চর বেরোল চারদিকে। কত রাজা দু-চারদিন মাত্র রাজত্ব করেছেন। কিন্তু তাঁদের বংশধররাও রাজা হতে পারেন বলে সবাইকে ধরে আনা হল। এবার শুধু কান কেটে ছেড়ে দেওয়া নয়, সবাইকে মেরে ফেলা হল। শিশু-বৃদ্ধ কেউ বাদ গেল না। লালুকসোলা নিশ্চিন্ত হয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। এবার যা খুশি করা যেতে পারে। লুটেপুটে নেওয়া যাক যার যা কিছু আছে। কিন্তু দু' দিন পরেই গুপ্তচর একটা সাঙ্ঘাতিক খবর নিয়ে হাজির হল।

"কী খবর?"

"আজ্ঞে, গোবররাজার ছেলে গদাপাণিকে ধরা যায়নি।"

"গোবররাজা? কে সে? সেই চারদিনের জন্য যে রাজা হয়েছিল? সেই লোকটার ছেলে?"

"হ্যাঁ হুজুর। কৃষক হলেও গদাপাণি রাজার ছেলে। শুধু তাই নয়, গদাপাণি দেখতে-শুনতেও খুব সুন্দর। নিখুঁত মানুষ। গায়ে খুব জোর।"

"এখনই বেরিয়ে পড়ো। জ্যান্ত হোক, মরা হোক, গদাপাণিকে চাই-ই চাই। না হলে দেশের লোক তাকেই রাজা খাড়া করে আমাকে সরাতে আসবে।"

রাজার লোকজন ছুটল চারদিকে। বেচারা গদাপাণি। সহজ, সরল, সাহসী যুবক। ঘরে তার স্ত্রী সুন্দরী জয়মতী আর সোনার টুকরোর মতো তিন ছেলেমেয়ে। বড়টির বয়স দশ-বারো, মেজোটিও ছেলে। কোলের মেয়েটির বয়স তিন বছর। খানিকটা ধানি জমি, মাথা গোঁজার ভিটে, তরিতরকারির জন্য উঠোন। জয়মতী সব কিছু তকতকে করে রাখে। মাটির বারান্দায় ছোট একটি তাঁত, সে নিজেই দরকারমতো কাপড় বা গড়া বুনে নেয়। গদাপাণি চাষ করে। সুখী গেরস্ত। তার বাবা যে-কোনও সময় চারদিনের জন্য রাজা হয়েছিলেন, সেকথা মনেও পড়ে না। তবু দুঃসংবাদ কানে আসে। জয়মতী তাঁত বুনছিল। সেই শোনে। তারপর পড়িমরি করে ছুটে যায় ধানখেতের দিকে, "ওগো, তুমি শিগগির পালাও। রাজার চর বেরিয়েছে। তোমাকে ধরতে আসছে।"

"সে কী? কোথায় পালাব?"

"ওই নাগা পাহাড়ের জঙ্গলে পালিয়ে যাও। ওরা যদি তোমাকে ধরে ফেলে...।" কেঁদে ফেলে জয়মতী।

"কী হবে?" ভয়ে অস্থির হয়ে ওঠে গদাপাণি। সে তো আর সত্যিকারের রাজা নয়, সাধারণ মানুষ। ভয়টাই বড় হল।

লাঙল-টাঙল ফেলে ছুটতে লাগল নাগা পাহাড়ের দিকে। ঘন অরণ্য, বুনো জীবজন্তু, অজগর সাপ, তার ওপর হিংস্র নাগা মানুষেরা। তবু নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার জন্য গদাপাণির নাগা পর্বতে পালানো ছাড়া উপায় কী?

জয়মতী ফিরে এল বাড়িতে। কোথায়ই বা যাবে। লাইথেপনা বড় গোহাইনের মেয়ে। চব্বিশজন ভাই আছে তার। কিন্তু এই বিপদের দিনে তাকে কে আশ্রয় দেবে? কবে যে সে বাপের বাড়ি থেকে বিয়ে হয়ে মুগার রিয়া-মেখলা পরে গদাপাণির ঘর করতে এসেছে তাও মনে পড়ে না। তা ছাড়া যদি গদাপাণি ফিরে আসে? তাই সে নিজের বাড়িতেই রইল। সঙ্গে কোলের মেয়েটি। ছেলেদেরও সে বলল, "তোরা যেখানে পারিস পালা বাবা। কেউ জিজ্ঞেস করলেও পরিচয় দিবি না।"

প্রাণভয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল দুটি ভাই। রাজার চর এল জয়মতীর কাছে। লাঠি ঠুকে বলল, "তোর স্বামী কোথায় গেছে বল।"

জয়মতী বলল, "রাত্তিরে খেয়েদেয়ে শুয়ে ছিল ঘরে। সকালবেলায় উঠে কোথায় যে গেল দেখতে পাচ্ছি না।"

লালুকসোলার কাছে খবর গেল কোথাও নেই গদাপাণি, তার ছেলে দুটোও নেই। ঘরে আছে শুধু জয়মতী আর মেয়েটা। হুকুম হল, "ওদেরই ধরে নিয়ে এসো।"

জয়মতী এল, সঙ্গে মেয়ে। শুরু হল জেরা। মারধর। প্রথমে মারতে শুরু করল কারেং-এর লিগড়ি বা দাসীরা। তারপর লালুকসোলা হুকুম দিলেন, "কোড়া লাগাবে রাজার জল্লাদ। দেখি কেমন করে কথা না বলে থাকতে পারে।"

জয়মতী প্রথমদিকে চাষি-বউয়ের মতোই কাকুতিমিনতি করে বলেছিল লিগড়িদের, "আমি জানি না গো দিদি, আমাকে তো কিছু বলে যায়নি।" কিন্তু তারপর তারা যখন তার ছোট মেয়েটাকে মারধর করতে শুরু করল, তখন থেকে সে কথা বলাই বন্ধ করে দিল। তার চোখের সামনে মার খেতে-খেতে মেয়েটা মরেই গেল। জয়মতীর চোখের জলও শুকিয়ে গেল।

রাজার আদেশবলে জয়মতীকে এবার নিয়ে যাওয়া হল একটা খোলা মাঠে, জারেঙ্গা পোথারে। সেইখানে খোলা মাঠে বিচার হবে জয়মতীর। গাছপালা নেই সেখানে। একটা খুঁটি পুঁতে তাতে জয়মতীকে বাঁধা হল। জল নেই, খাবার নেই, নড়বার-চড়বার উপায় নেই। রাজার জল্লাদ শুধু চাবুক মারছে মাঝে-মাঝে। দেশের লোক ভেঙে পড়ল সেখানে। সকলের চোখে জল। রাজার বিরুদ্ধে ঘৃণা আর ভয়। চৈত্র মাসের রোদে মাটি ফাটছে আর তেষ্টায় বুক ফাটছে জয়মতীর।

ঠিক সেইসময় একজন নাগা মানুষ এসে দাঁড়াল সেইখানে। বিরাট চেহারা, নাগাদের পোশাকে-পালকে রাজার মতো দেখাচ্ছে, মুখে দাড়ি-গোঁফ। সঙ্গে একটা নাগিনী মেয়ে। লোকটা কিছুক্ষণ দেখে বলল, "অ্যাই মেয়ে কেন মার খাচ্ছিস, দেখিয়ে দে না তোর স্বামীকে।"

জয়মতী চমকে উঠল। এ কী? এ যে গদাপাণির গলা। সে চিনতে পারল নাগা পুরুষটিকে। তারপর যতটুকু বিষ ঢেলে কথা বলা যায়, সেই সুরে বলল, "কে রে তুই? কোত্থেকে এসেছিস। আমি মরি-বাঁচি, তোর তাতে কী? চিনি না, শুনি না, দয়া দেখাতে এল! বেরো, দূর হ। আমার স্বামী থাকলে এর প্রতিকার করবে।"

গদাপাণি কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বুঝল, জয়মতী তাকে আর-একবার বাঁচিয়ে দিল। সে নাগা পাহাড়ে গিয়ে অনেক কষ্টে একটা নাগা মেয়ের বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছে। নাগাদের মাতৃতান্ত্রিক সমাজ, তার মানে বাড়ির আসল মালিক হচ্ছে মা আর মেয়েরা। ছেলেরা থাকে, খায়দায়, ফাইফরমাশ খাটে, শিকার করে। এমনই এক নাগা মেয়ে গদাপাণিকে আশ্রয় দিয়েছে। তারপর এসেছে গদাপাণিকে নিয়ে, জারেঙ্গা পোথারে। মাথা নিচু করে ফিরে গেল গদাপাণি।

চোদ্দদিন অমানুষিক যন্ত্রণা সয়ে খিদে-তেষ্টা আর মার খেতে-খেতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল জয়মতী। শেষ অবস্থা দেখে জল্লাদই টিপে ধরল তার গলা। সেদিনটা হল ১৬০১ শকের ১৩ চৈত্র, শুক্লা ত্রয়োদশী, বৃহস্পতিবার (১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দ)।

গদাপাণি হয়তো কোনওদিনই আহোম রাজার সিংহাসনে বসত না, সিংহাসনের ওপর তার লোভও ছিল না। কিন্তু জয়মতীর মৃত্যুই বদলে দিল সেই সামান্য সহজ-সরল মানুষটাকে। একলা গদাপাণি দুটি বছর ধরে দেশের মানুষকে জড়ো করল, সকলকে বোঝাল। সামান্য কৃষকবধূ হয়ে জয়মতী এত সাহস দেখিয়ে গেল আর সহায়সম্বলহীন বলে পুরুষমানুষ হয়ে বসে থাকবে গদাপাণি? তাও কি হয়? ১৬৮১ সালে স্বর্গদেব গদাধর সিংহ নামে যিনি সিংহাসনে বসলেন তিনি আর কেউ নন, আমাদের পূর্বপরিচিত গদাপাণি। জয়মতী বলেছিল 'তার স্বামী প্রতিকার করবে।' সে কথাও ভোলেনি গদাপাণি। লোরা রাজা তো খুন হল। আর মহামন্ত্রী লালুকসোলা? রাজার শ্বশুর? তাঁর ছিল এক ছেলে। মন্ত্রী তখন ছেলেকে কোথাও পাঠাতে পারলে বাঁচেন। ছেলেঅন্ত প্রাণ। গদাপাণি ছাড়বে কেন? প্রবাদ—মন্ত্রীর ছেলেকে মেরে তার মাংস লালুকসোলাকে খেতে বাধ্য করেছিল গদাপাণি। চরম শাস্তি দিয়েছিল তার স্ত্রীর হত্যাকারীদের।

আর জয়মতীর ছেলে? ছোট ছেলের খবর পাওয়া যায় না। কিন্তু সেই দশ-বারো বছরের ছেলেটি যে প্রাণভয়ে লুকিয়ে-লুকিয়ে থেকেছে, মায়ের কাছে যেতে পারেনি, সেই ছেলেই হচ্ছেন স্বর্গদেব রুদ্রসিংহ। তিনি রাজধানী তুলে আনলেন রঙপুরে, জারেঙ্গা পোথারে। তেষ্টায় বুক ফেটেছিল জয়মতীর, ছেলে মায়ের সেকথা স্মরণ করে পঁয়তাল্লিশ দিনে তৈরি করলেন বিশাল দিঘি। জয়সাগর। আহোম রাজারা কেউ নেই, কিন্তু জয়সাগর আজও জয়মতীর গল্প শোনায়।

*ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়*

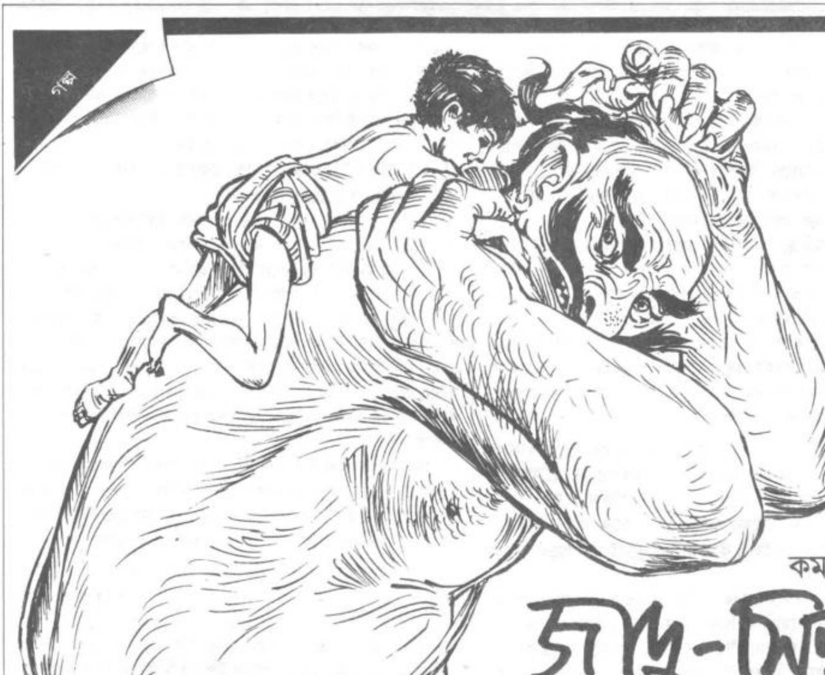

কমল চক্রবর্তী

# জাদু-সিন্দুক

“হ্যাঁচ্চো” করতেই দরজা খুলে গেল। বুবকাদের এই জাদু-দরজাটা বছর দু'-তিন আগে ছোটমামা পশ্চিম জার্মানি থেকে নিয়ে আসেন। বুবকার ক্লাস থ্রি-র জন্মদিনের উপহার।

মা-বাবা দু'জনেই অফিসে বেরোবেন। কাজের লোক দু'-দু'বার দু'রকম বুদ্ধিতে চুরি করে বুবকাদের ঘরের দামি-দামি জিনিসপত্তর নিয়ে উধাও হয়েছে। একবার তো বুবকাকে প্রায় সঙ্গে নিয়ে যায়। শেষে ছেলেধরাদের কাছেই বেচে দিত। শেষ পর্যন্ত পাশের ফ্ল্যাটের মুখার্জিকাকিমা হঠাৎ বেরিয়ে আসায়, কাজের লোক ওরফে চোর, প্রেশার কুকার, দেওয়াল ঘড়ি, দম-দেওয়া পুতুল, চিজ্ আর জ্যামের পুঁটলিটা নিয়ে ধীরেসুস্থে নেমে যায়।

সে যাক, ছোটমামা দরজা এনে দিলেন। বললেন, “সব জার্মানিদের ভোজবাজি বুবকা, 'হ্যাঁচ্চো' বললে দরজা খুলে যাবে, 'বাবা গো' বললে দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। তবে তোমরা তিনজন ছাড়া অন্য কেউ যেন না জানতে পারে। জানলেই ডানা গজাবে।”

ওহ্ কী যে মজা হয়েছিল। গভীর রাতে অন্য ফ্ল্যাটের সবাই যখন ঘুমিয়ে, বুবকা, বুবকার বাবা-মা, তিনজনে কেবল হ্যাঁচ্চো আর বাবা গো বলতে লাগল। পাশে দাঁড়িয়ে ছোটমামা ফিকফিক হেসে গেলেন।

“বল বুবকা, কেমন এনেছি ? মন দিয়ে লেখাপড়া করলে পরের বার আরও মজার ব্যাপারস্যাপার হবে।”

বুবকার তখন অন্য কোনও দিকে লক্ষ নেই। একমনে হ্যাঁচ্চো আর বাবা গো করে যাচ্ছে। আর নিজে-নিজেই হেসে খুন হচ্ছে। সে দরজা দু'পাশ থেকে অনেক করে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখেছে কিছুতেই বুঝতে পারেনি কী ব্যাপার।

সেই থেকে অবশ্য কাজের লোক রাখার রেওয়াজ এ-বাড়িতে উঠে গেছে। কিন্তু এর একটা ঝামেলার দিকও আছে। রোববার ওরা সবাই চিড়িয়াখানা দেখতে গিয়েছিল, ফিরে এসে দ্যাখে, দরজা খোলা। মা ভেবেছেন নিশ্চয় দরজার ভোজবাজি ফেল মেরেছে তাই চোর ঢুকেছে। পরে বাবা ঠিক খানা-তল্লাশি করে বের করলেন। পাশের বাড়ির মুখার্জিকাকিমার সর্দি হয়েছে। উনি নিজের ফ্ল্যাট থেকে বেরোবার মুখেই ঠিক হেঁচে ছিলেন। সেই হ্যাঁচ্চোতেই দরজা খুলে গেছে। নেহাত ওদের দরজায় একটা পরদা আছে, আরও নেহাত ওদের ফ্ল্যাটটা কুড়ি তলায়। এইসব কারণে দরজা খোলা থাকা সত্ত্বেও এবারের মতো চুরি হল না।

একদিন হয়েছে কি, বৃষ্টিতে ভিজে বাবার বেশ ঠাণ্ডা লেগেছে। যখন-তখন ফটাস্ করে হ্যাঁচ্চো বেরিয়ে আসছে। আর দরজা যেই হ্যাঁচ্চো শুনছে অমনি দুম করে খুলে যাচ্ছে। ফের উঠে বাবা গো বলে বন্ধ করা। কিন্তু কতক্ষণ ওইভাবে খোলা-বন্ধর খেলা চালানো যায় ? শেষে মা বাবার মুখে রুমাল চাপা দিয়ে শোবার ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। বাবা ড্রইংরুমে বসে একটা বই ওলটাচ্ছিলেন। সেটা মা আর হতে দিলেন না। বুবকা খুব একচোট খিলখিল হেসে ফেলল, “যাও, আরও ভেজো, কেমন শাস্তি!”

হ্যাঁচ্চো তো বুবকারও হয়, মায়েরও হয়। তবে খুব মিনমিনে, এমন যে দরজা শুনতে পায় না। কিন্তু বাবা, উঃ, যেন কামান দাগা! হ্যাঁচ্চো না, যেন গোলা।

ঠিক এমনই একদিন মজা হয়েছিল, ছোটমাসি বেড়াতে এসেছেন, রাতে থেকে গেলেন। দরজা বন্ধ করতে গিয়ে মা ঠিক একটু জোরে বাবা গো বলে ফেলেছেন, আর শুনবি শোন ঠিক ছোটমাসি। অমনি চেপে ধরলেন, "দিদিভাই, কেন তুমি বাবা গো বললে?" ছোটমাসি চোখ ছলছল করে প্রায় কেঁদে ফেললেন।

"না, মানে এমনিই," মা কোনও মতে ধামাচাপা দিতে চাইছেন। "ও কিছু নয়, ওই আরশোলা দেখে..."

"না, তা বললে হবে কেন? আরশোলা দেখলে সে তো আমিই বাবা গো বলতুম। ত্রিসীমানায় কিচ্ছু নেই, বলো তবে বললে কেন?"

"না না, এমনই, বুকে একটা হাঁফ ধরেছিল, তাই বাবা গো বললুম," মা খুব ইনিয়েবিনিয়ে একটা কিছু জুতসই কথা খুঁজছেন, পেলে তো? শেষে কিছু না পেয়ে বললেন, "ওই বাবা গো'টা জিজ্ঞেস করিস না, বরং কাল তোকে দুটো আইসক্রিম খাওয়াব।"

যাই হোক ওই ছোটমাসির বাবা গো সন্ধান বন্ধ হল। আসলে সত্যি কথাটা বলা যাবে না। নিষেধ। পরে একবার মা ছোটমামাকে বললেন, "কী দুটো শব্দ দিয়েছিস, কেবল হাঙ্গামা হয়।"

ছোটমামা বললেন, "যখন দরজা তৈরি হচ্ছে তখন ওদেশের মেকানিকরা দুটো শব্দ চাইল। কী করা, এই দুটোই মনে পড়ল। বাবা গো কী ফ্যাচাং।"

তারপর দু'-তিন বছরে আরও দু'-তিনটে জন্মদিন পেরোল। বুবকা আরও দু'-তিনটে জার্মানি ম্যাজিক পেয়ে গেল। নিজের মনে স্কুল থেকে ঘরে ফেরে। দরজায় দাঁড়িয়ে চারধারে তাকিয়ে আস্তে হ্যাঁচ্চো বলে, বাবা গো বলে, জুতো জামা ব্যাগ কোনওমতে নামিয়ে সোজা রান্নাঘরে। যেখানে ভেলভেটের ঢাকায় যত্নে রাখা ম্যাজিক বেসিন। যে বেসিনের ওপর দশটা স্টিলের কল চকচক করছে। মা রোজ ঘুমোতে যাবার আগে কলগুলো মেজেঘসে ধুয়েমুছে চকচক করে রাখেন।

বুবকা সোজা বেসিনের কাছে চলে যায়। দশটা কল দিয়ে দশরকম পানীয় বেরোয়। ড্রিঙ্কিং আইসক্রিম, পাইন আপেল জুস্‌, চকোলেট, কোকো, মিল্কশেক্‌, ঘন এলাচ দুধ, কেওড়ার শরবত, আখের রস, কমলালেবুর রস, গোলাপ জল লস্যি, তাজা খেজুর রস আর ঠাণ্ডা জল ফাউ।

কলের নীচে গেলাস ধরলেই অমনি কল খুলে যাবে। এক মিনিটে গেলাস ফেনায় ভরে যাবে। বাবা বলেন, "বুবকা, তোমার ছোটমামা ভাল জিনিস দেয়নি। কারণ এতে চা-কফি পড়ে না।"

বুবকা বলে, "ও আমি তৈরি করে দিচ্ছি, দ্যাখোই না।"

এই বলে এক গেলাস কোকো-চকোলেট ভরে তাতে এক চামচ কফি ঘেঁটে, বাবাকে দিল।

বাবা বললেন, "খাচ্ছি, কেবল তোমার তৈরি বলে। কিন্তু এ-জিনিস চলবে না।

এ-যন্ত্রও সাবধানে রাখতে হয়। কারণ অন্য কেউ দেখলে সর্বনাশ[১]। বুবকার জন্মদিনে বন্ধুরা তো নানারকম শরবত খেতে-খেতেই ঘেমে যায়। আর অবাক হয়ে দু'হাতে গেলাস, ছুটন্ত বুবকাকে দেখতেই থাকে। একজন কোকো মল্ট পেল তো অন্য একজন ঘন এলাচ দুধ। কমলারস এক হাতে, অন্য হাতে গোলাপের গন্ধ-ভরা লস্যি। উঃ, প্রথম আধঘণ্টা তো শরবতের নেশায় মাতোয়ারা।

বুবকা একবার করে রান্নাঘরে ঢোকে আর ইচ্ছেমতো গেলাস ভরে গুনগুন করে 'ধন ধান্য পুষ্প ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা'।

ক্লাস সিক্স-এ ওঠার সময় বুবকা একটা কাণ্ড করে বসল। ক্লাসে ফিফ্‌থ হল ঠিকই, তবে অঙ্কে আর ইতিহাসে হাইয়েস্ট। ছোটমামাকে চিঠি লিখল, 'এবারও তোমার কথা রাখা হল না। তবে দুটো পেপারে মেরে দিয়েছি। 'উচ্চৈঃশ্রবা' আর 'ঐরাবত'।' ছোটমামা ফার্স্ট না বলে, বলেন, উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত।

ছোটমামা লিখলেন, 'তোমার 'ম্যাজিক বক্স' গতকাল পেলুম। কাউকে জানিও না। সময় লেগেছে ছ'মাস। কারণ, বাংলা ভাষা বোঝে এমন ম্যাজিক বক্স এখানে তৈরি হয় না। ফলে আমায় আলাদা করে গিয়ে রোজ-রোজ দেখাশোনা করতে হয়েছে। একটু বেশি সময় নিল, কিন্তু যা তৈরি হয়েছে, দেখলেই বুঝবে। যেসব ছেলেরা ইংরেজি পড়তে পড়তে বাংলা ভুলে গেছে, তাদের কিন্তু মহা বিপদ হবে। যদি কোনও কারণে, 'ছাত', 'ছাদ', বা পাউরুটি-মাখনকে ব্রেড বাটার বলো, বাক্স উত্তর দেবে না। যেমন মজার তেমনি গণ্ডগোলে। শীতেই যাব। তখন সব রহস্য উন্মোচন হবে। আগেভাগে আর কিছু লিখছি না।'

বুবকা সাত-পাতাল হিজিবিজি ভেবে অস্থির। কেমন যন্ত্র, কী যন্ত্র! উঃ ছোটমামার যা কাণ্ড! কোনও হদিস পায় না। রাতে শুয়ে-শুয়ে কতক্ষণ ধরে যে স্বপ্ন দ্যাখে। ছোটমামাকে চিঠি লেখে, "ছবি এঁকে পাঠাও কেমন দেখতে। আর তর সইছে না।

'বুল্টুর বাবা আমেরিকা থেকে একটা টিভি এনে দিয়েছেন। সেই টিভিতে যে-কোনও অঙ্কের প্রশ্ন ঢুকিয়ে দিলেই পুরো অঙ্কটা স্টেপ বাই স্টেপ পরদায় ভেসে ওঠে। ডলডলির বাবা হংকং থেকে এমন যন্ত্র এনেছেন যে, হাত-পা-মাথা সব টিপে দেয়। কুচির জ্যাঠা জন্মদিনে ওকে এমন একটা খেলনা উপহার দিয়েছেন ভাবতে পারবে না, সেটা একটা ছোটখাটো এরোপ্লেন। কুচি বাগানে সেই প্লেনে চড়ে একতলার সমান উঁচুতে গোটা বিকেল উড়ে বেড়ায়। আমাদের কাউকে-কাউকে মাত্র একদিন একটু করে উড়তে দিয়েছে। একপাক ঘুরতে-না-ঘুরতেই নীচ থেকে সুইচ টিপে নামিয়ে দিয়েছে। কুচির হিংসে ভঙ্গ করতে তোমার সাহায্য চাই ছোটমামা। আমার যন্ত্রটা যদি প্লেন হয়, ভাল। যদি বাগান ছাড়িয়ে এদিক-ওদিক-সেদিক টুঁ মারা যায় তো আরও ভাল হয়। দু'জন একসঙ্গে বসতে পারলে আরও ভাল।' বুবকার ইচ্ছে কুচির হিংসেকে জিভেগজা করে কাচুম-মাচুম খেয়ে ফেলে।

বুবকা পরের চিঠিতে লিখল, 'জানি তুমি নিশ্চয় একটা কিছু নতুন আনবে। তবে রাঙার বাবার মতো লোহার মানুষ এনো না। সন্ধেয় ওরা যখন সবাই বাড়ি ফেরে, তখন লোহার মানুষ হেঁটে-হেঁটে এসে স্যালুট করে। চা-ওমলেট-টোস্ট করে খাওয়ায়। ঘর ঝেড়ে দেয়। রাতে মশারি টাঙিয়ে দেয়।'

ছোটমামা লিখলেন, 'সেসব কিছু নয় রে বোকা। এক্কেবারে 'জাদু সিন্দুক'। সারা পৃথিবী জুড়ে মাত্র পাঁচখানা তৈরি হয়েছে। এ-দেশের ছেলেপুলেরাই এখনও পর্যন্ত দ্যাখেনি। সে খুব মজার।'

বুবকা পরের চিঠিতে লিখল, 'সত্যি ছোটমামা, শোনার পর থেকে ঘুম, নাওয়া-খাওয়া সব উঠে গেছে, একটু খুলে বলো জিনিসটা কী? না-জানা পর্যন্ত কিছু ভাল লাগছে না।'

ছোটমামা লিখলেন, 'এ জিনিস বলে বোঝাবার নয়। দেখার। কেবল দেখার। শীতে যাচ্ছি, তখন হবে। আর তো মাত্র দু'-তিন মাস। একটু দাঁতে-দাঁত চেপে ক'টা দিন কাটিয়ে দে। তারপর উড়নতুবড়ি, ইলালা, বিলালা, মণ্ডা-মেঠাই। কুল গুলগুল

কি-লা-লা।'

পুজোর তিনটে দিন একটাও ঠাকুর ঠিকমতো দেখা হল না। পুজোর নতুন গল্পের বই পড়ে রইল। দু'-একটা কমিকস্ পড়তে-না-পড়তেই ই-লা-লা-লা হয়ে যায়। বাইরে জানালা দিয়ে তাকালে বি-লা-লা-লা। আচ্ছা মজা করল ছোটমামা। আমার যে মনের জোর কম বুঝতে পারো না? কী হাল্কা পলকা, ভূত-ভূতে আমি। নিজেকে একটা উচ্চিংড়ে কাঁটাওয়ালা মনে হয়। ঘুটঘুটে উড়ুক্কু ঝিংকি-টিংকি।

পুজোর পর বুবকা, বাবা, মা শিলং বেড়াতে গেল। এমন যে চেরাপুঞ্জি— যেখানে সর্বদা মেঘ গা-ঘষাঘষি করে, দূরে-দূরে পাহাড়, মউসিমাই ফল্‌স্ কিচ্ছু ঠিকমতো উপভোগ করা গেল না। কবে ছোটমামা আসবে গুনতে গুনতে দিন যায়।

বুবকা একটা ছোট ক্যালেন্ডারও তৈরি করেছে। যে ক্যালেন্ডারের শেষ তারিখ বাইশ ডিসেম্বর। আরম্ভ আঠারোই সেপ্টেম্বর। ছোট নোটবুক। রোজ ঘুমোতে যাবার সময় একটা করে তারিখ কেটে দেয়। কচ্ছপও নয়, শামুকের মতো দিন গড়ায়। তাও যেন খোঁড়া শামুক। ওহ্ একদম নড়ে না।

বাইশ ডিসেম্বর বুবকার জন্মদিন। ছোটমামা সেদিন দুপুরে আসবেন। মা, বাবা, বুবকা গিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে আসবে। ততদিন অঙ্কে ছোট-ছোট ভুল হবেই। পেরু কিংবা কুয়েতের রাজধানী ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক। এবং কিছুতেই মনে পড়বে না সাহাবাদ কিংবা বুন্দেলশাহি কেন বিখ্যাত।

মাঝে-মাঝে কেবল পশ্চিম জার্মানি থেকে চিঠি আসতে লাগল, 'ভাবিস না, যন্ত্রের দেখাশোনা চলছে। সে যে কী ব্যাপার বলে বোঝানো যাবে না। চোখে দেখতে হবে।'

ফের একটা চিঠি এল, 'বুবকা একটাও ইংরেজি অক্ষর কথায় মেশাবে না, তা হলেই গণ্ডগোল হয়ে যাবে। যন্ত্র অন্য ভাষা একেবারে জানে না, বোঝে না। কেবল, আ মরি বাংলা···।'

এসব চিঠি যে কতটা বিষাক্ত সেকথা ছোটমামার বোঝার ক্ষমতা নেই। কারণ বুবকা সিক্স-এ পড়ে। বুবকার হাত-পা-মাথা আজকাল যখন-তখন ঝিমঝিম করে। মাঝে-মাঝে দিনেদুপুরে সরষেফুল দেখতে পায়। একেবারে মনে হয় একটা লিকলিকে বিছে যত্রতত্র ঘুরঘুর করছে। এসব বিদেশে থাকা মানুষজন বুঝতে পারবে না। তারা সারাক্ষণ চিজ্ আর আইসক্রিম খেয়ে মাথা ঠাণ্ডা রাখে।

শেষ পর্যন্ত ছোটমামা জন্মদিনের দুপুরে এলেন। জাদু সিন্দুক বুবকার হাতে তুলে দিয়ে সব বুঝিয়ে পড়িয়ে, দুরস্ত করে, দু'-দশদিন হিল্লি-দিল্লি করে উড়ে গেলেন। এবং যাবার সময় বলে গেলেন, "সাবধানে হাত দিও। আরও একটা মজার ব্যাপার ক্লাস সেভেনের জন্মদিনে দেব'খন। সেটাও অর্ডার দিয়েছি, তবে বাংলা, ইতিহাস এবং সমাজবিজ্ঞানে 'উচ্চৈঃশ্রবা', 'পাঞ্চজন্য' এবং 'মন্দার পর্বত' হতে হবে। শুধু একটা কথা মনে রেখো, ও সিন্দুক ইংরেজি বা হিন্দি বললে কোনও কাজ করবে না, সবটাই বাংলায় বলতে হবে। যেমন ধরো, 'হ্যালো, গুডমর্নিং', সিন্দুক চুপ। এবার তুমি যদি বলো 'ওগো সিন্দুক, সুপ্রভাত', সিন্দুক সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দেবে 'প্রভাত-প্রভাত'।"

এমনই আরও অনেক উদাহরণ দিয়ে ছোটমামা পাখিপড়া করে গেছেন। শুধু কি তাই, যদি বলো, 'জায়গাটা শুনশান' বা 'রামু বহুত ভাল ছেলে' ব্যস, লাল আলো জ্বলে থাকবে ওই 'শুনশান' কিংবা 'বহুত' বলার জন্য। সবটা টানটান বাংলায় বলতে হবে।

"কী জ্বালা! ছোটমামা একদম ঘাবড়ে দিচ্ছ, ইমপসিব্‌ল্।"

"হল না। ইমপসিব্‌ল্ বলিস না, বলবি অসম্ভব। কেমন?"

"শেষে দেখছি এটা একটা হুজ্জুতি না করে যায় না।"

"উহুঁ হুজ্জুতি আবার কী, গণ্ডগোল বলো।"

"জাস্ট এক্সকিউজ মি ছোটমামা, তোমার জাদুকরকে দেখার আমার বিন্দুমাত্র ক্রেজ্ নেই। তুমি ওটা রিটার্ন করে দাও কিংবা অন্য কাউকে প্রেজেন্ট করো। বহু ছেলেপুলে পাবে। ছোটমাসির পুপু, মেজোমামার কুলু, বড়মামার গোলা— এরা সব নেক্সট ওয়েটিং লিস্টে। একটা কুইজ কনটেস্ট করে ফাস্ট প্রাইজ দিয়ে দিতে পারো। বহুত বড়িয়া হবে।"

ছোটমামা শুধু বললেন, "বুবকা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। তোর জন্য এনেছি। তুই এতক্ষণ যা বললি সবটাই আমি টেপ করেছি। একবার বাজাব, শুনবি? সময় আছে?"

এই বলে ক্যাসেট চালিয়ে দিলেন। ছোটমামা একের-পর-এক ধরিয়ে গেলেন, "দ্যাখ, কীসব যা-তা করেছিস। জাস্ট্ এক্সকিউজ্ মি, ক্রেজ্, রিটার্ন, প্রেজেন্ট্ নেক্স্ট্, ওয়েটিং লিস্ট, কুইজ কনটেস্ট, ফাস্ট প্রাইজ, বহুত বড়িয়া। তিন লাইন কথা বলেছিস তাতে গুনে দ্যাখ ক'টা অন্য ভাষা।"

"এই যে 'লাইন' বললে ওটা কি বাংলা শব্দ? আমি কি পারব? বেশ, বলছ, ট্রাই করব।" এই বলে বুবকা পাগলা বেসিন থেকে দু'জনের জন্য দু'গেলাস আপেল জুস নিয়ে এল।

প্রথম প্রথম অবশ্য খুব অসুবিধে হয়েছে। দুটো-চারটে করে অন্য ভাষা মিশে যেত, এখন সাবধানে বলে-বলে অভ্যেস হয়ে গেছে। তা ছাড়া জাদু সিন্দুকের সবটা জানার পর ওইটুকু ভাষার হার্ডল থোড়াই থাকে।

এখন স্কুল থেকে সময়মতো ফেরা বুবকার প্রধান কাজ। আগে স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে সারাদিন থেকে যেতেই ভাল লাগত। কোথায় গেল সেসব দিন।

ওহ্, দরজায় দাঁড়িয়ে হ্যাঁচ্চো বলেই ঘরে ঢুকে বাবা গো বলে দরজা বন্ধ করে বই-এর ব্যাগ কোনওমতে টেবিলে রেখে সোজা জাদু সিন্দুকে। অসংখ্য বোতাম। একটা টিপতেই ফুটফুটে এক সমুদ্র-পরি বেরিয়ে এল। ওর নাম বাতাসি। সিন্দুক থেকে বেরিয়ে সোজা বুবকার দিকে তাকিয়ে, "কী, ভাল আছ বুবকা?"

"হুঁ? না ভাল নেই। লাস্ট পিরিয়ডে ড্রিল ছিল। এত টায়ার্ড লাগছে। কী যে বোরিং ভাবতে পারবে না। এক গেলাস অরেঞ্জ স্কোয়াশ আনতে পারো?"

কথা ক'টা বলে সোফায় একটু এলিয়েছে, দেখতে দেখতে বাতাসি

মিলিয়ে গেল লাল আলো জ্বলে উঠল। এবং জাদু সিন্দুক বলে দিল, "কী হচ্ছে বুবকা ? এত ইংরেজি কেন ? এতে বাতাসি থাকবে ? না থাকতে পারে ? বাংলায় বলো। তোমার মাথাটা গেছে দেখছি।"

"ওহ্ আর পারি না সিন্দুকদা। এমন কল করছ, ওহ্। ওগো বাতাসিদিদি," এই বলতে-বলতে ফের সিন্দুকের বোতাম টিপল। ফের বাতাসি হাজির।

"আমায় এক গেলাস কমলালেবুর রস এনে দেবে ? খুব ক্লান্ত লাগছে," এই বলে মুচকি হাসল। কী বোকা, ইংরেজি বোঝে না।

বাতাসিকে দেখতে খুব সুন্দর। অনেক দূরের এক সমুদ্রে থাকে। খয়েরি রেশমের চুল, সাদা পালকের পোশাক, চোখ দুটি নীল মুক্তোর, ঠোঁট আপেল ফুলের মতো নরম ফুরফুরে। ওই অনেক দূরের দ্বীপ, যেখানে ছায়া আর মেঘের খেলা। গোলাপি গাছপালা আর নীল পাখিদের জটলা, সেখানে বাতাসি থাকে। কিন্তু আসতে দেরি হয় না। হাওয়ার চেয়েও জোরে, শব্দের চেয়েও জোরে চলে আসে।

"জানো তো বাতাসি, আজ স্কুলে কী হয়েছে, বসে-বসে তোমার ছবি আঁকছিলুম হঠাৎ রুদ্র উপস্থিত। বলল, 'কী আঁকছিস রে ?' বলে দিই প্রায়, মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল, 'বাতাসি'। শেষে সামলে নিলুম। রুদ্র বলল, 'বাতাসি আবার কী ?' আমি বললুম, 'বাতাসি হল দূর সমুদ্রের এক পরি।' রুদ্র হো-হো-হো হেসে ফেলল। 'এত বড় ছেলে, সিক্স-এ পড়িস, এখনও রূপকথা চালাচ্ছিস ? আমি তো এখন শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত, দেবদাস, পল্লীসমাজে ব্যস্ত। আহা রে, তোর কী হবে রে ! বুড়ো খোকা !'

"জানো তো আজ প্রায় ধরা পড়েই গিয়েছিলুম। কী হত ! ছোটমামা যে নিষেধ করেছিলেন, কাউকে বললে সিন্দুক খারাপ হয়ে যাবে। চলো, একহাত ক্যারম খেলি।"

না বুবকা, ক্যারম না, ওতে কেবল তুমিই জিতে যাও, আমার টিপ ভীষণ খারাপ। অন্য খেলা, ব্যাগাডুলি, চাইনিজ্ চেকার, ট্রেড, লুডো, যে কোনও একটা চলবে।"

"ওসব এখন কেউ খেলে নাকি ? বেশ, এসো আমরা টেবল টেনিস খেলি। আপত্তি নেই তো !"

"হুঁ,ওটা চলবে। যদিও আমাদের দেশে ও নামে কোনও খেলা নেই, তবু খেলাটা মন্দ নয়।"

"কিন্তু একটা গণ্ডগোল তো হবেই। জেতা-হারার ব্যাপারটা গোনা।"

আসলে বুবকা বলতে চেয়েছিল, 'পয়েন্ট কাউন্ট' করা। এই বললেই যদি বাতাসি চলে যায়। ভয়ে-ভয়ে সে উদ্ভট একটা ঘূর্ণি বাক্যে বলল।

"হুঁ, সেও ঠিক। কিন্তু কে গুনবে ? তাই তো !"

"দাঁড়াও।" এই বলে বুবকা সিন্দুকের আর একখানা বোতাম টিপে দিল, ওহ্ এক্কেবারে ধোঁয়া-কুয়াশার মধ্যে হাততালি আর খিলখিল হাসি। এ-সময়টা বুবকার খুব প্রিয়। সে ওই আসাটা খুব মজা করে দ্যাখে। ভারী ভাল। ওই যে আধখানা কুয়াশা-ধোঁয়া তার মধ্যে থাকে খলখল, খিলখিল, ঠাঠা।

বাতাসি বলল, "নম্বর গুনতে কে আসবে, বাবা রে ! দ্যাখো, ভূত নয়তো ! তোমার যা কীর্তি, কী থেকে কী হয়, বলা যায় না।"

"দ্যাখোই না কে ? ও আমার খুব প্রিয়, খুউব।"

ঘড়ঘড় ঘড়ঘড় একটা মিঠে শব্দ। বাতাসি বলল, "বাঃ ! কে কে আসছে গো বুবকা ? দারুণ ব্যাপার তো !"

"হুঁ, তা তো বটেই। আর-একটু ধৈর্য ধরো।"

এবার বেশ খানিকটা আলো, হলদে-গোলাপি ছড়াতে-ছড়াতে এক

খনখনে বুড়ি। পিঠে চরকা, উপস্থিত।

বাতাসি দেখে তো অবাক। অমন ধবধবে মার্বেল-পাথুরে গা, সাদা রেশমের ঝোপড়া চুল, চোখ দুটো টানা-টানা সুন্দর, থুতনি ঝুলে পড়ছে, গাল ভাঙা, অথচ কী সুন্দর দেখতে। দাঁতও নেই।

"কেমন আছ চাঁদদিদা ?" বাতাসির দিকে চোখ ফিরিয়ে বুবকা বলল, "এ হল গে বাতাসি, সমুদ্র-পরি। রোজ দুপুরে আমার সঙ্গে খেলে। আর এই হল চাঁদদিদা। ওই যে চাঁদ আছে না, ওখানে সুতো কাটে, চরকা চালায়। লোকে বলে চাঁদের মা বুড়ি। আমরা বলি চাঁদদিদা।"

"কেমন আছ নাতি ? আমি তো তোমার সঙ্গে খেলতে পারব না ভাই। বুড়ো হয়েছি। তবে আমাকে ডাকলে কেন ?"

"গল্প শুনব বলে।" বুবকা মিষ্টি হাসল, "আসলে তোমায় ডেকেছি, আমরা এখন টেবল টেনিস খেলব, তুমি একটু হিসেব রাখবে।"

'পয়েন্ট কাউন্ট' বলতে গিয়ে ফের এক মুহূর্ত থামল, যদি ইংরেজি বলার দায়ে চাঁদদিদা ফুড়ুত হয় ! মোটেই ভাল লাগবে না। ছোটমামা অবশ্য বলেছেন, যে-শব্দ বাংলায় নেই বা যেসব ইংরেজি বাংলায় বেশি-বেশি চলে, সে শব্দে অপরাধ নেই। স্কুল, ক্লাস, লাইন, বেঞ্চ, ডেস্ক, স্কেল, রোল, সেলুন, বেলুন, টেলিফোন, স্টেশন, এসব কোনও উপায় নেই। কারণ পেনকে 'ঝরনা কলম' বা স্কুলকে 'বিদ্যালয়' বলে মিছেই জটিলতা।

বুবকা সব বুঝিয়ে দিল, কীভাবে হিসেব রাখতে হবে। টেবল টেনিস শুরু হয়ে গেল। একদিকে বাতাসি, অন্যদিকে বুবকা। বুবকা কিছুতেই বাতাসির সঙ্গে এঁটে উঠছে না। পয়েন্ট গোনার সময় চাঁদদিদা একটু পক্ষপাতিত্ব করছেন, বোঝাই যাচ্ছে। এবং যথারীতি ঢোক গিলে একটু এদিক-সেদিক তাকিয়ে বুবকার দুটো-একটা করে পয়েন্ট বাড়িয়ে দিচ্ছেন। আর মাঝে-মাঝে কোচড় থেকে পান, সুপুরি, ছোট পকেট থেকে হামান দিস্তা বের করে ছেঁচে মুখে পুরছেন। চাঁদের দেশে তো আর নকল দাঁত নেই যে লাগাবেন। দাঁত না থাকার জন্যই সম্ভবত বুবকার এত প্রিয়। দাঁত ছাড়া মুখে যখনই চুমু খান, বুবকার খুব ভাল লাগে। ভাগ্যিস দাঁত নেই ! মাড়ি দিয়ে কুট করে বুবকার গালে কামড়ে দেন। খুব রগুড়ে চাঁদদিদা।

বাতাসি একবার বলল, "চাঁদদিদা, তোমার স্কুলে কি নামতা পড়ানো হত না, গুনতে এত ভুল করছ যে ?"

"তা আর কী বলব বাতাসিদিদি, আমাদের পাঠশালার পণ্ডিতমশাই

ঘুমোতেন, আমরা সব কড়ি খেলতুম। তাই তেমন জুত করে আর শেখা হয়নি বাছা।" বলেই গপগপ করে মাথায় কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো সাদা ঝোপড়া রেশম উড়িয়ে হাসলেন।

বুবকা একদিন বলেছিল, "চাঁদদিদা, তোমার মতো চুল হলে খুব ভাল হত। কী করে অমন ধবধবে করলে গো চাঁদদিদা? কেবল তোমার চুলে হাত দিতে ইচ্ছে করে। কী সাদা গো! যেন জুঁই ফুটে আছে।"

বাতাসি খুব লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে খেলছিল। খুব ওস্তাদ মনে হচ্ছে। চাঁদদিদার ভুলভাল গোনাগাঁথা সত্ত্বেও বেশ ভালমতো বাতাসির কাছে হেরে গেল। দরদর ঘাম ঝরছে। একটু বিশ্রাম নিচ্ছে। বাতাসির ঘাম নেই। সে বরং পাশের ঘর থেকে বুবকার জন্য এক গেলাস চকোলেট নিয়ে এল। ফের পালক নেড়ে হাওয়া দিতে লাগল। বুবকার মুখ থেকে ঘাম মুছিয়ে দিল।

চাঁদদিদা বললেন, "তোমরা একটু গল্প করো, আমার কিছু কাজ বাকি।" এই বলে চরকা চালাতে লাগলেন। "আরে কী বলব, ওই তারাগুলো, সব জাঁহাবাজ, বদমাশ। সব ক'টা আমার তৈরি সুতোর কাপড় ছাড়া পরবে না। তাই আমার বিশ্রাম নেই। কী যে ওদের বায়না! চাঁদদিদা সুতো করে দাও। তোমরা একটু গল্প করো।" এই বলে ঘড়ঘড় চাকা ঘোরাতে লাগলেন।

দেখতে দেখতে দু'পাশে সুতোর ফের। কতরকম, লাল, নীল, হলুদ তুলো, ওদের দেশে কার্পাসি তুলো নানা রঙের হয়। আমাদের যেমন কেবল সাদা। সুতোও হল ঢের।

খেলা শেষ হয়েছে কিছুক্ষণ। বুবকা বোতাম টিপে বাতাসি আর চাঁদদিদাকে বিদায় জানাল। সন্ধে হয়ে এসেছে। একটু পরে বাবা-মা ফিরবেন। ছোটমামা বলে দিয়েছেন, 'এ-সিন্দুক শুধু তোমার জন্য। লোকজন বন্ধু জড়ো করে কখনও বোতাম টিপো না, সব ভেস্তে যাবে। জাদু সিন্দুক চিরতরে ঘুচে যাবে।' ফলে কাউকে এক ফোঁটাও কিছু দেখানো যায় না। একা-একাই সব আনন্দ। তাতে অবশ্য একটা ভাল, গণ্ডগোল হবার বিশেষ সুযোগ নেই। তবে মাঝে-মাঝে তো হাঁসফাস লাগে।

ছোটমামা আরও নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'একজনকে বারবার ডেকো না, ওরা তো অনেক দূর থেকে আসেন। একটু কষ্ট হয়। প্রত্যেকে নিজের মতো কাজ নিয়ে থাকেন। কাজ ফেলেই আসেন। ফলে মাঝেমধ্যে ডাকবে।'

ফলে গতকাল কী করতে পাঁচের বোতাম টিপল কে জানে। উঃ কী ভয়ানক হেঁড়ে গলা। গলা নয়তো, যেন কয়লাখনির যন্ত্রপাতি চলাফেরার শব্দ! কী ঘড়ঘড়ে, কিম্ভূত আওয়াজ! একজন ভয়ানক উপস্থিত।

বুবকা ভয়ে টেবিলের নীচে আশ্রয় নেয়। হাতের কাছে শুয়ে থাকা একটা পুঁটকে বেড়ালের মুড়ো। সেটার নাম ঘিনু, চেঁচিয়ে-মেচিয়ে একশা।

"পাগলা, আমায় ডাকলি কেন রে?"

"তুমি কে গো?" বুবকা টেবিলের নীচ থেকে হাড়-হিম গলায় কিনকিন করল।

"আমাকে দেইখে চিনতে লাইরছ? আমি ব্রহ্মদৈত্য বটি, হঁ তুমার ব্রহ্মকাকা!"

ছুটে গিয়ে ফের পাঁচ নম্বর বোতাম টিপে দেবে তারও উপায় নেই। অথচ চলে যাও বললে ব্রহ্মকাকু যাবেও না।

"ভয় কেন রে ভাইপো? আয় রে, আয় রে ভাইপো...।"

ওহ্, ওই গলায় 'ভয় কেন রে' শোনার পর যেন কোনও আস্ত মানুষ সিকিখানা না হলেও আধখানা হতে বাধ্য। বুবকা চোখ বন্ধ করে টেবিলের পায়া জড়িয়ে ধরে 'রাম রাম' বিড়বিড় করতে লাগল।

কিন্তু একটু পরে দেখল, একটা ভাল্লুকের মস্ত হাত লম্বা হতে-হতে টেবিলের তলায় ঢুকে সোজা বুবকাকে তুলে হাতের চেটোয় রাখলেন। ব্রহ্মকাকু বসে ছিলেন। খুব ছোটখাটো শরীর তখন। বসলেই মাথা ছাদে ঠেকছে। বুবকা যথারীতি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। ব্রহ্মকাকুরই ঝামেলা। অনেক এটাসেটা মন্ত্র পড়ে বুবকাকে সুস্থ করলেন।

"কী রে ভাইপো, হ্যাঁদালি কেনে? আমাকে ডরালি হে। আমি তোর বন্ধু বটে, ডরাস নাই বেটা, কাকা বঠিন।"

অনেক কষ্টে, পাঁচ মাস জ্বরে ভুগলে যেমন গলা হয়, মিনমিনে গলায় বুবকা বলল, "তুমি আমাকে মেরে ফেলবে না তো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি। আমাকে যে এবার বাংলা, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞানে 'উচ্চৈঃশ্রবা' হতে হবে!"

"হাঃ হাঃ হাঃ!" সে কী বিকট মাটি কাঁপানো হাসি। ওদের পঁচিশতলা ফ্ল্যাট বাড়ি পর্যন্ত দোল খেল।

"তুকে ধরব কেন রে বাছা? তু আমার ভাইপো কি না?"

এই বলে গোঁফের মোটকা ঝাঁটার মতো খোঁচা-খোঁচাগুলো মিথ্যে পাকাবার চেষ্টা করতে লাগল।

গা'টা থোবা-থোবা ভালুকের মতো। লোমওয়ালা বুকে জল দেবার পাইপের মতোই একটা পৈতে। যেন ঘাসের বনে জলের পাইপ পড়ে। যেন ঘাম লেগে-লেগে সেটা তামাটে হয়েছে। প্রায় ন্যাড়া মাথা, ঘুচঘুচে খোঁচা চুলো-মুশকো একজন যদি খুলির পেছনে অজগরের মতো দোল খাওয়া একখানা টিকি রাখে, ভয় পাওয়া কি অসম্ভব? ওটা টিকি? ছিঃ ছিঃ! ভয়ে আড়ষ্ট হবে না তো আনন্দে ঝিঙে ফুল হবে?

অনেক চেষ্টা করে বুবকা বলল, "ব্রহ্মকাকু তুমি ছোট্ট প্যান্ট পরেছ কেন? তুমি কি একটা পাজামা পরতে পারো না?"

"হঁ হঁ, আমাদের দেশে অত কাপড়-চোপড়ের বালাই নাই হে। তা ছাড়া আমাকে সারাদিন সিনাতে হয় আর মন্ত্র পইড়তে হয়। সময় কুথায় বাপ প্যান্টুলুন পরার? অত ভাবিস নাই।"

"তোমার টিকিটা একটু ছাঁটা যায় না? ওটা তো আমি সাপ ভেবেছিলুম।"

ফের সেই হোঃ হোঃ হোঃ, "ভাইপো, উঠাই তো খাঁটি বামুন ছানার চিহ্ন। উটা কাইটলে আমার আর কী থাকে ব্যাটা! আয়, তুকে

কুস্তি শিখাই। আর সময় লষ্ট করিস নাই বেটা বিন্দাবন।"

একটা গামছা ছিল, সেটা বুবকাকে পরিয়ে দিল। বুবকার এক ফোঁটা টিকটিকে শরীর। ব্রহ্মকাকু বেঁটে বামুনের চেহারা নিলেন। কার্পেটের উপর শুরু হল লড়াই।

ব্রহ্মকাকু বললেন, "এরোপ্লেন প্যাঁচ থিকে শুরু করে কিং কং, দারা সিং, গোবরবাবু সমস্তই একে-একে শিখাব। মাসে একবার কেমন? ইটা সারলে যুযুৎসু হবেক।"

দু'-একটা প্যাঁচ শিখে যাবার পর বুবকার আর তত ভয় লাগছে না। দু-চারবার তো ব্রহ্মকাকুকে লাথিও মেরে দিয়েছে। ভুলে গেছে আসলে ওর শরীর বিশাল। আসলে ও একটা ব্রহ্মদৈত্য।

বেশ খানিকটা লড়ালড়ি সেরে, ঘাম গায়ে একটু বসেছে, ব্রহ্মকাকু হাত-পা-বুক-পিঠ টিপে এমন আরাম দিতে লাগলেন যে, অমন একটা বিদ্‌ঘুটে, বদখত চেহারাকেও ভালবেসে ফেলল।

গুনগুন করে ব্রহ্মকাকু গান গাইতে লাগলেন, "শক্তি ধর/কুস্তি কর/সবাই মিলে ফূর্তি কর/গা ঝাড়া/পা ঝাড়া, মুষ্টি দিচ্ছে পাহারা।"

তারপর বললেন, "দ্যাখ ভাইপো, একটা কথা বলি রে তোকে, চেহারা দেইখে লোকের বিচারে যাবি না। আমার মতো দুব্‌লা মনের পুঁইচকা তুকে আর মিলবে নাই।" বলে কিচকিচ করে ইঁদুরে মতো হাসতে লাগলেন, যেন ছোট্ট বাচ্চা।

"ও কথা আর মুখে এনো না ব্রহ্মকাকু, তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম। এখন ভালবেসে ফেলেছি। তুমি কী ভাল গো! তোমাকে ছাড়তে মন চায় না।" গামছা পরা ছোট্ট বুবকা একথা বলে, ব্রহ্মদৈত্যের গা বেয়ে-বেয়ে দু'হাতে পিঠের বুকের চুল মুঠো করে কাঁধে উঠে বসল। ছাদে গিয়ে মাথা ঠেকল।

শেষে অজগরের মতো টিকি ধরে দুলতে লাগল। ব্রহ্মদৈত্য খুব খিলখিল করে হাসতে লাগলেন। অন্য কেউ এ-দৃশ্য দেখলে ভয়েই মরে যাবে। একটা কিম্ভূতকিমাকারের সঙ্গে একটা পুঁচকে কীভাবে এঁটে গেছে। ব্রহ্মদৈত্য বেশ মজার-মজার সব গল্প বলেন, আর বুবকা হুড়মুড় করে তাঁর বুকে-পিঠে গড়িয়ে পড়ে। গায়ে ঘামের বদলে বেশ ফুল-ফুল গন্ধ। বামুনঠাকুর বলে কথা।

"তা'লে কথা দিচ্ছ, মাসে একবার করে এসে আমাকে ওলিম্পিক খেলোয়াড় গড়ে তুলবে? না হলে কিন্তু তোমায় ছাড়ছি না।"

"হাঁ রে বাবা হাঁ, দুব না কেনে, তুকে দুব না তো যদুকে দুব? তু আমার ভাইপো বটিস? তবে কুস্তি মন দিয়ে কইরতে হবে। পিস্তার শরবত খাতে হবে। বুঝলিস কি নাই? হ্যাঁ রে পুঁচকে, এত যে গুঁতাগুঁতি হইল, লাগে নাই তো বাপ?"

বুবকা হেসে গড়িয়ে পড়ল, "তোমার নরম ফুলের মতো শরীরে কখনও কারও ক্ষতি হতে পারে? হিঃ হিঃ হিঃ, বেশ কথা বললে তো!"

কী যে ভালবেসে ফেলল, সে কথা বলে বোঝানো যাবে না। কখন বোতাম টিপে দিয়েছে, ব্রহ্মদৈত্য ফিরে গেছেন। বুবকা গামছা পরেই বসে ছিল। তখনও গা-ভর্তি ঘাম।

মা ঘরে ঢুকে বললেন, "কী রে, ওরকম বসে আছিস কেন?"

"ও মা সে ভীষণ ভারী-ভারী কাণ্ড, পরে বইলব।"

"না না বুবকা, গামছা বেঁধে কী করছিলি বাবা?" মা প্রায় কেঁদে ফেলেন।

"ওহ্, বলছি না, ঝামেলা করবিস নাই।" ব্রহ্মকাকু বলেছেন "এদেশে একটাও ওলিম্পিক মেডিল আসে নাই, অন্তত যাতে কুস্তিতে একটা সোনা পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা হচ্ছে গো!"

"ও ম্যাগো, মন্টু কী যন্ত্র দিয়ে গেল গো, ছেলে আমার কুস্তি শিখছে, ভাষা কী হচ্ছে! এ-যন্ত্র আমি আজই ছুঁড়ে ফেলে দেব। বিদেয় করব। ছেলে আমার কুস্তিগির, পালোয়ান! ওহ্.ভাবতে পারছি না!"

মা একসঙ্গে একগাদা আফসোস, দুঃখ ঝরঝর বলে, ধপ্ করে চেয়ারে বসলেন।

"হুঁ হুঁ, সেসব পরে যখন দেইখবে। আমার কাঁধ একবার দু'হাত দিয়ে ধরো। দ্যাখো, তোমায় এমন প্যাঁচ দিয়ে ফেলব, তুমি শত চেষ্টা করলেও উঠতে পারবে না।" এই বলে বুবকা দু'হাতে দু'পায়ে প্যাঁচ নিয়ে মায়ের মুখোমুখি দাঁড়াল।

লাল গামছা বাঁধা, হাত-পা কাঠ-কাঠ করে রাখা বুবকা, 'হুয়াউ' চিৎকার দিয়ে মায়ের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর কি। ঠিক সেই সময় হ্যাঁচ্চো মানে দরজা খোলা, বাবা গো মানে বন্ধ, মানে বাবা এলেন। এবং সেইমাত্র মা বাঁচলেন বলা যায়। পরন্তু বাবাও বুবকার এই পোশাক দেখে অবাক!

"কী রে বুবকা, এমন হম্বিতম্বি হয়ে দাঁড়িয়ে কেন?"

"উ তুমি বুঝবে না বাপ, আমি এখন কুস্তিগির হইয়েছি।" এই বলে ফট্‌ফট্ করে উরু চাপড়াতে লাগল।

এবার বাবা-মা একসঙ্গে অজ্ঞান হয়ে যাবার উপক্রম। ছেলেটা বলে কী রে! সকাল পর্যন্ত তো ভালই ছিল।

বুবকা রান্নাঘর থেকে এক গেলাস শরবত নিয়ে এল।

মা-বাবা তখন আধমরা অবস্থায় সোফায় বসে।

বুবকা গেলাসের পেস্তায় একটু-একটু চুমুক দিয়ে বলল, "বাবা, কেবল ব্রহ্মকাকার কথা শুনেই অস্থির হচ্ছ। জানো, দেড়আঙুলে, মৎস্যকন্যা, বাতাসি, চাঁদদিদা, শঙ্খমালা— এরা সব আমার বন্ধু। আরও আছে মা। ঘাবড়ে যাচ্ছ?"

মা-বাবা তখনও সিন্দুকের দিকে চোখ বড়-বড় করে তাকিয়ে।

"ভেবো না মা, আমি একটা সোনার মালা আনবই। ব্রহ্মকাকু আমায় দারা সিং, কিং কং, গোবর বাহাদুর, সব গুলে খাওয়াচ্ছেন। তবে কী জানো, দিনে চার লোটা পেস্তা শরবত খেতে হবে। আর বুকে পৈতে ঝোলাতে হবে।" এই বলে বুবকা গেলাসের পেস্তায় ফের চুমুক দিল। শেষে গামছা টেনে বাঁধল। মশারির কোনায় ঝুলন্ত সাদা সুতলি একটানে ছিঁড়ে বুকে পৈতের মতো ঝুলিয়ে নিল।

"মা," বলে বুবকা বাঁ হাত দিয়ে ডান উরু, ডান হাত দিয়ে বাঁ উরু চাপড়াতে লাগল, আর মাঝে-মাঝে 'হুক্কা হুয়া' 'হুক্কা হুয়া' আওয়াজ।

বাবা-মা'র তখনও অজ্ঞান হওয়ার ঘোর কাটেনি। এবং আর কখনও কাটবে কি না বোঝাও যাচ্ছিল না।

*ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়*

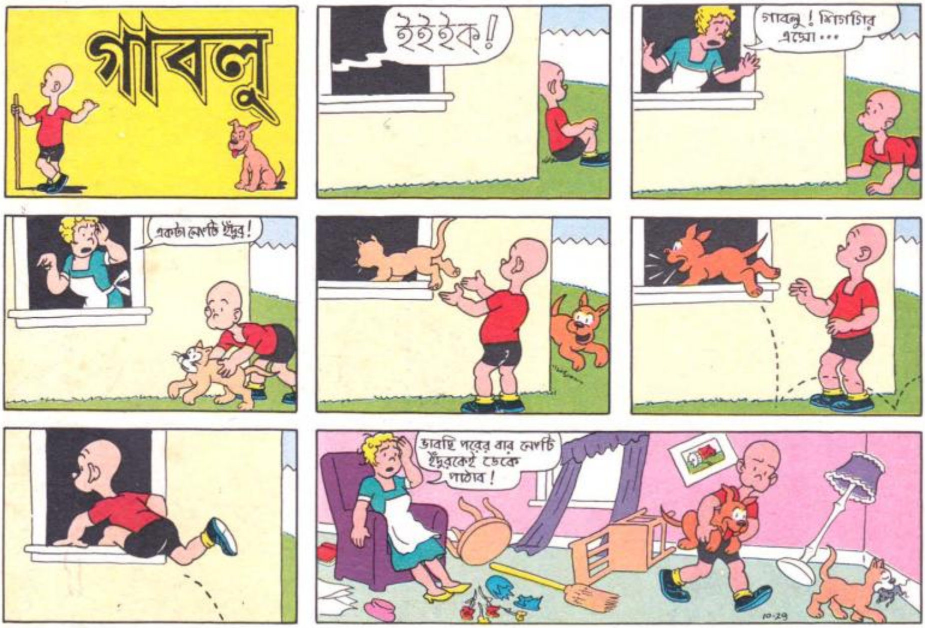
গাবলু
ইইইক!
গাবলু! শিগগির এসো ...
একটা নেংটি ইঁদুর!
ভাবছি পরের বার নেংটি ইঁদুরকেই ডেকে পাঠাব!
10-29

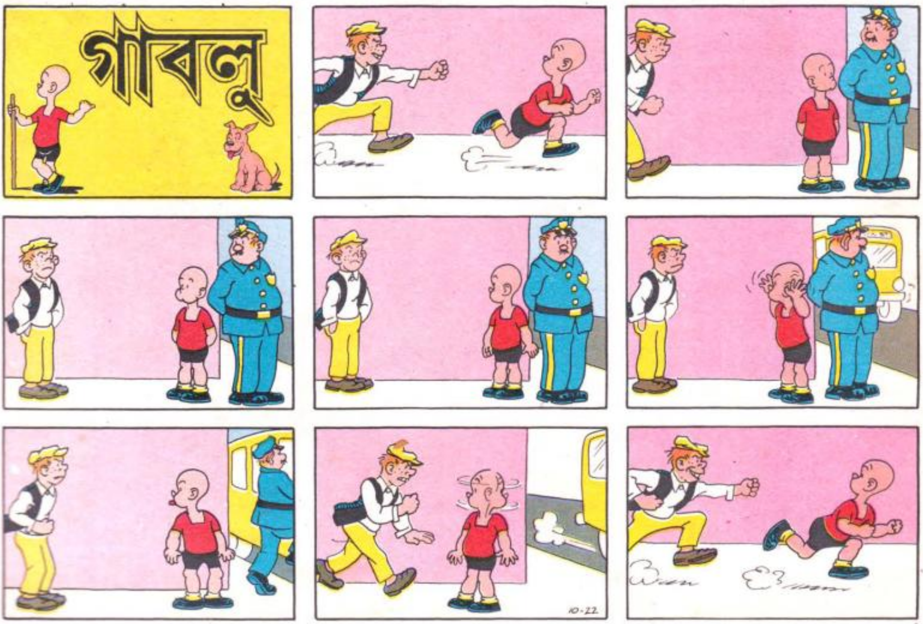
গাবলু
10-22

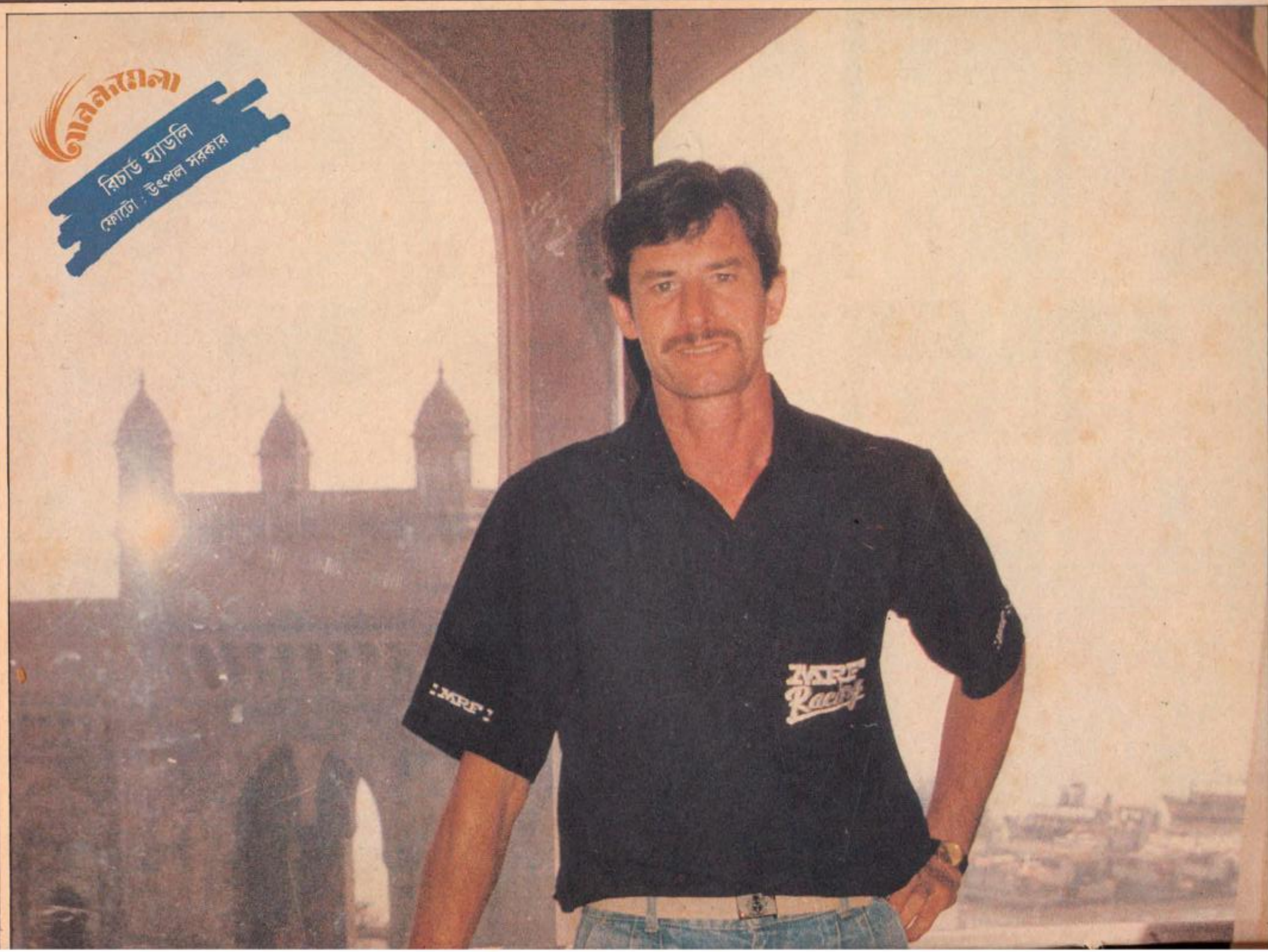
আনন্দমেলা
রিচার্ড হ্যাডলি
ফোটো : উৎপল সরকার
MRF
MRF Racing

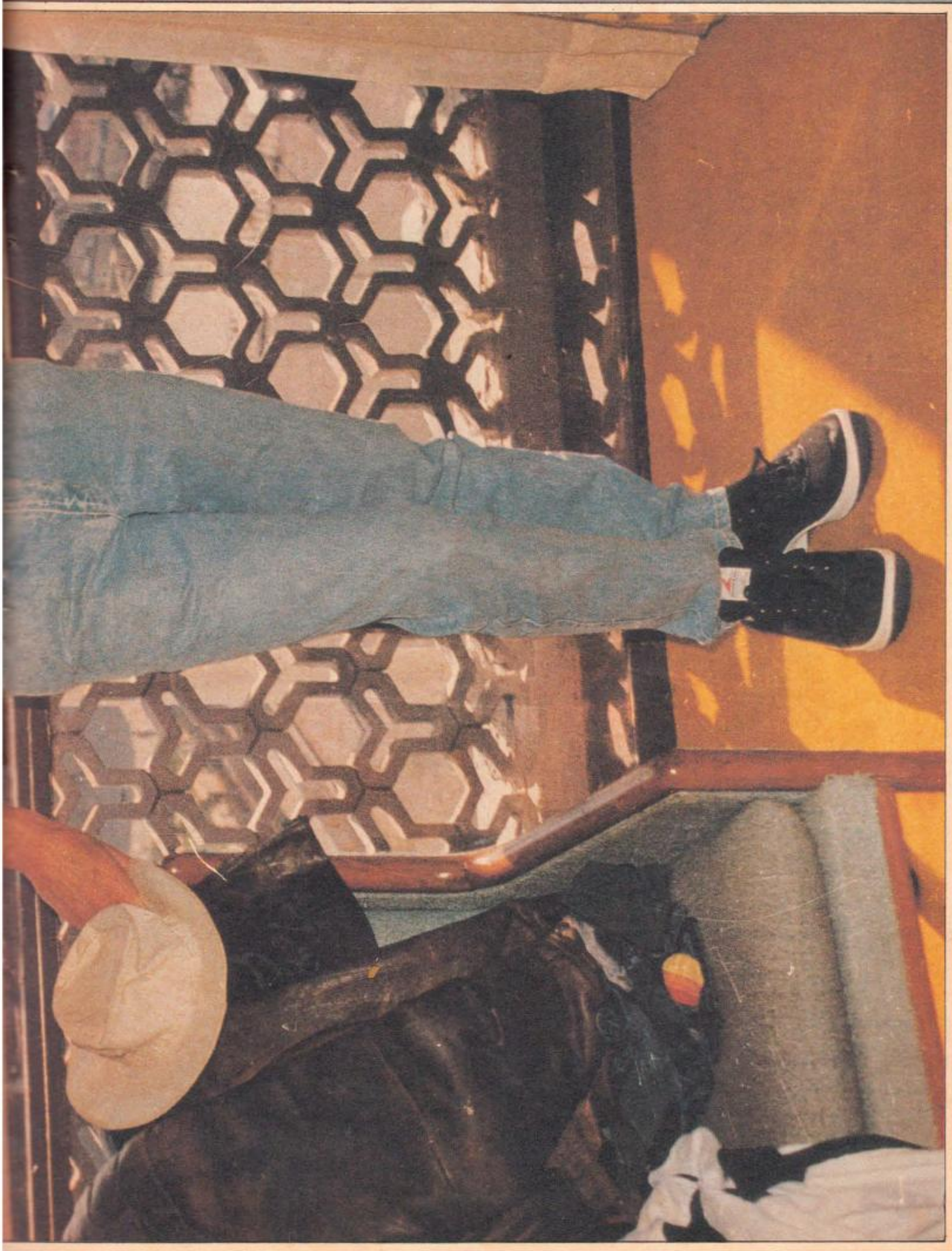

খেলাধুলো

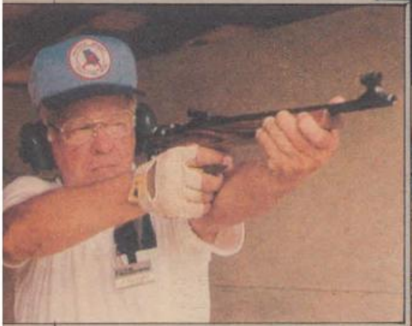

# মহাকাশ যুগের খেলা স্টার শট

বিদেশের জনপ্রিয় শুটিং-এর এই খেলাটি নিয়ে লিখেছেন **তন্ময় চট্টোপাধ্যায়**

আধুনিক প্রযুক্তির যুগে মানুষ এগিয়ে চলেছে রোমাঞ্চকর অজানা গন্তব্যের দিকে। চাঁদে পৌঁছনোর অভিজ্ঞতাকে পিছনে ফেলে এসে পড়েছে 'ভয়েজার'-এর যুগে। কম্পিউটার টেকনোলজির ব্যাপক প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। আর বিদেশের ছেলেমেয়েরা পুতুল খেলা ছেড়ে মেতে উঠেছে নতুন খেলনা 'স্টার ওয়রস' নিয়ে। বড়রাও পিছিয়ে নেই। শুটিং জগতে আলোড়ন তুলেছে 'স্টার শট'। প্রচলিত শুটিং ইভেন্টগুলির থেকে অনেক চিত্তাকর্ষক, অনেক গতিময় খেলা এই স্টার শট।

প্রতিযোগিতামূলক শুটিং-এ যে দুটি খেলায় শটগান ব্যবহার করা হয়, সে দুটি খেলা হল 'ক্লে পিজিয়ন' এবং 'স্কিট'। আকাশে ছুঁড়ে দেওয়া উড়ন্ত লক্ষ্যবস্তুতে গুলি করাই হল প্রধান কাজ। শটগানে শটশেল ব্যবহৃত হয়, যার মধ্যে অনেক ছোট-ছোট ধাতুর বল

থাকে। এই বলগুলি আকাশে ছড়িয়ে পড়ে উড়ন্ত বস্তুকে আঘাত করে। বাংলায় এই গুলিকে বলা হয় 'ছররা গুলি'। পাখি মারাই ছিল এই গুলির প্রধান কাজ। যাই হোক, এই ক্লে পিজিয়ন বা স্কিট শুটিং সাধারণ দর্শককে খুব একটা আকৃষ্ট করতে পারে না। বড় করে দেখতে গেলে ফুটবল বা ক্রিকেটে দর্শকরা যেরকম ভূমিকা নেন, শুটিং-এ সেরকম ভূমিকা নেওয়ার সুযোগ নেই।

প্রচার-মাধ্যমে, বিশেষত টেলিভিশনে, শুটিং কখনওই সেরকম প্রাধান্য পায় না। যাঁরা দর্শক, খেলার নিয়ম সম্পর্কে যাঁদের সেরকম জ্ঞান নেই, তাঁদের কথা মনে রেখেই দেড় বছর আগে স্কটল্যান্ডে শুরু হয়েছিল এই খেলা স্টার শট। স্টার শট-এর স্রষ্টা প্রাক্তন টেলিভিশন ক্যামেরাম্যান ডেভিড ম্যাক্সওয়েল। টেলিভিশনে দর্শকদের নতুন কিছু দেখানোর জন্যই তিনি যা সৃষ্টি করেছিলেন, আজ তা শুটিং-জগতে, প্রধানত আমেরিকা ও পশ্চিমের দেশগুলোতে ঝড় তুলেছে।

স্টার শট হল একমাত্র শুটিং-এর খেলা, যা রাত্রে খেলা হয়। তবে এটাই এই খেলার একমাত্র বিশেষত্ব নয়। স্টার শট-এর প্রধান বিশেষত্ব এর বিরাট টার্গেট বোর্ডটি। যদিও এই বোর্ডটিকে টার্গেট বোর্ড বলা ঠিক নয়। কারণ, এটা আসলে ১৩ মিটার উঁচু, ২৬ মিটার ব্যাসের একটি অর্ধগোলাকার কাঠামো,

যা দেখতে অনেকটা আধখানা ডার্টবোর্ডের মতো।

যাই হোক, এই বোর্ডটি তৈরি করা হয় নাইলন জাতীয় শক্ত পদার্থ দিয়ে, যাতে গুলি লাগলে কোনও ক্ষতি না হয়। বোর্ডটি রং করা হয় উজ্জ্বল কমলা আর সবুজ দিয়ে। জোরালো নিওন আলো পড়লে রাত্রেও পরিষ্কার দেখা যায়। বোর্ডটি মাকড়সার জালের মতো বারোটি ভাগে ভাগ করা থাকে। সবচেয়ে ওপরের ভাগে বড় ঘরগুলির নম্বর—১, ২, ৩ এবং ৪। তারপরে মাঝখানের ঘরগুলি হল—৫, ৬, ৭ এবং ৮। এর পর সবচেয়ে নীচের ও সবচেয়ে ছোট ঘরগুলোর নম্বর হল—৯, ১০, ১১ এবং ১২। সাদা রঙের গোলাকার টার্গেটগুলো ট্র্যাপ মেশিনের সাহায্যে এমনভাবে ওপরে ছোঁড়া হয়, যাতে তা নম্বর দেওয়া ঘরগুলোর সামনে দিয়ে যেতে পারে। ঘন্টায় প্রায় ১০০ কিলোমিটার বেগে এই টার্গেটগুলো এমনভাবে ওপরে উঠে যায়, দেখলে মনে হয় যে, এগুলো এই বোর্ডের পেছন দিয়ে চলাচল

**স্কটল্যান্ডে ১৯৮৭-'৮৮ সালে খেলাটি শুরু হওয়ার পর বি বি সি নিয়মিত খেলাটি প্রচার করতে থাকে। শুটিং ছাড়াও ক্রীড়া-জগতের অনেক নামী খেলোয়াড়, এমনকী, খেলোয়াড় নন এমন অনেকেই এই সিরিজে অংশ নেন।**

করছে। আসলে কিন্তু এগুলোর নির্দিষ্ট পথ বোর্ডের সামনে দিয়ে। টার্গেটের অবিশ্বাস্য বেগের জন্যই শুটারদের বন্দুক নিয়ে তৈরি হয়েই থাকতে হয়। বোঝাই যায় নীচের ঘরগুলোতে লক্ষ্যভেদ করা সবচেয়ে কঠিন এবং ওপরে কম নম্বরের ঘরগুলোতে লক্ষ্যভেদ করা সবচেয়ে সহজ।

স্টার শট-এর সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা হল 'রাউন্ড দি ক্লক' এবং 'হান্ড্রেড অ্যান্ড আউট'। রাউন্ড দি ক্লক-এ একজন শুটারকে মোট চোদ্দটি গুলি ছুঁড়তে হয়। শুটারদের নির্দিষ্ট নম্বর দেওয়া ঘরেই টার্গেট ভাঙতে হবে, এবং ভাঙতে হবে ক্রমানুসারে। অর্থাৎ প্রথমে ১ নম্বর ঘর,তারপর দুই, এরকম করে বারো পর্যন্ত। প্রতি ঘরের যা নম্বর সেটাই হবে সেই ঘরে স্কোর, অর্থাৎ ১ নম্বরের স্কোর ১, দু' নম্বরের স্কোর দুই, এরকম করে বারো পর্যন্ত। অর্থাৎ সব ঘরে পরপর টার্গেট ভাঙতে পারলে মোট পয়েন্ট হবে ৭৮। কোনও টার্গেট তার নির্দিষ্ট ঘর ছাড়ার আগে বা পরে যদি শুটার লক্ষ্যভেদও করেন, তা হলে কোনও পয়েন্ট পাওয়া যাবে না। এই খেলার পয়েন্ট নির্ধারণ করার জন্য ভিডিও ক্যামেরার সাহায্য নেওয়া হয়, কারণ অনেক সময়েই খালি চোখে কিছু বোঝা সম্ভব হয় না। ৭৮ পয়েন্ট হওয়ার পর দুটো টার্গেট ওপরে ছোঁড়া হয়। দুটির মোট পয়েন্ট দশ, একটির পাঁচ। অর্থাৎ কোনও শুটার সব ক'টি টার্গেট ভাঙতে পারলে তার স্কোর হবে মোট ৮৮।

অনেক সময়েই 'টাই' হয়। আর তখন দরকার হয় পরের খেলাটির, অর্থাৎ, হান্ড্রেড অ্যান্ড আউট -এর। এই হান্ড্রেড অ্যান্ড আউট-এর মূল উদ্দেশ্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শূন্য স্কোর করা। এখানে শুটারকে যে কোনও তিনটি নম্বর ইচ্ছেমতো পছন্দ করতে হয়। অর্থাৎ কেউ যদি সবচেয়ে সোজা তিনটি শট (১, ২ বা ৩) পছন্দ করেন, আর লক্ষ্যভেদ করেন, তা হলে ১০০ থেকে মোট ৬ নম্বর বাদ যাবে। কেউ যদি রোমাঞ্চের সন্ধানে আরও কঠিন শট পছন্দ করেন (নীচের দিকের ৯, ১০, ১১ বা ১২), তা হলে তাঁকে আরও ঝুঁকি নিতে হবে। সফল হলে অবশ্য অনেক বেশি পয়েন্ট ১০০ থেকে বাদ যাবে। একটা কথা ভুললে চলবে না, মূল উদ্দেশ্য কিন্তু শূন্য করাই। যাই হোক, প্রথম তিনটি টার্গেট সফলভাবে ভাঙতে পারলে শুটার 'ডাবল'-এর জন্য চেষ্টা করতে পারেন। ডাবল -এ শুটার আরও তিনটি শট পাবেন। যদি লক্ষ্যভেদ করতে পারেন তা হলে আরও তিনটি সুযোগ পাবেন, যদি না পারেন তা হলে তাঁর মূল তিনটি নম্বরে মোট পয়েন্ট ১০০ থেকে বাদ যাবে, অনেকে ডাবল-এ সফল হয়েও আর ঝুঁকি নেন না, প্রতিদ্বন্দ্বীকে ছেড়ে দেন নিজের স্কোর করার জন্য। এইভাবে খেলা চলে। যে প্রতিযোগী প্রথম শূন্যে পৌঁছে তাঁর শেষ জোড়া শট দুটি ভাঙতে পারবেন, তিনিই জিতবেন।

## ভারতের আন্তর্জাতিক মানের শুটার

বিকানিরের মহারাজা মেজর জেনারেল ডঃ কার্নি সিংহ ভারতের একমাত্র শুটার যিনি বিশ্বচ্যাম্পিয়ানশিপে পদক পেয়েছেন।

*কার্নি সিংহ*

*সোমা দত্ত*

পেয়েছেন এশিয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপে। ১৯৮১ সালে ওয়েলশ গ্রাঁ প্রি-র তিনটি খেতাবই তিনি জিতেছিলেন।

অথচ এই কার্নি সিংহ ১৯৫২-র জাতীয় চ্যাম্পিয়ানশিপে ক্লে পিজিয়ন শুটিংয়ের ট্র্যাপ ও স্কিট ইভেন্টে প্রথম অংশ নিয়ে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছিলেন। দীর্ঘ আট বছর অনুশীলনের পর তিনি সফল হন। ১৭ বছর তিনি ছিলেন জাতীয় চ্যাম্পিয়ান। বহুমুখী প্রতিভা ছিল কার্নি সিংহের। তিনি ছিলেন পাইলট ও গলফার। ইতিহাসের ডক্টরেট কার্নি সিংহ ১৯৫২ থেকে '৭৭—টানা ২৫ বছর ছিলেন সংসদ-সদস্য। ১৯৮৮ সালে, ৬৪ বছর বয়সে তিনি মারা যান। বাংলার মেয়ে সোমা দত্ত আন্তর্জাতিক মানের শুটার হিসেবেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিছুদিন আগে অকল্যান্ড-এ কমনওয়েলথ গেমসে একাধিক পদক জিতেছেন সোমা।

# আপনার ত্বককে আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য দিতে বাছাই করা স্ট্রাইপড্ ১০০% সুতীর

**অভিনব, নরম স্ট্রাইপড্ ১০০% সুতীর কাপড়**

সূক্ষ্মতম সুতীতে বোনা—তাই যেমন নরম—পরেও তেমন আরাম। আপনার ত্বককে দেবে স্বাচ্ছন্দ্য—দেখতেও দারুণ।

**পা ও কোমর ঘিরে ইলাসটিকের স্বাচ্ছন্দ্য**

এই কাজকরা, নরম ইলাসটিক দেখতেও ভালো—পরতেও ভালো। পরে দেখুন, মাপও একেবারে ঠিকঠাক।

**মেয়েদের গঠন অনুযায়ী সুন্দর, আধুনিক কাট**

এই প্যান্টি আপনার শরীরের আকার নেবে। বেশী আঁটো বা বেশী ঢিলে হবে না। চলতে ফিরতে কত আরাম!

**বেল মানেই ভালো জিনিষ, ঠিক দাম**

বাছাই করা সেরা উপাদান, বিদেশী মেশিনে সেলাই করা—বেল্ পালোমা প্যান্টি যেমন আরামদায়ক তেমন টেকসই।

পালোমা স্ট্রাইপ্স—১৮/-
পালোমা রিবড—১৬/-
পালোমা ডোরি—১২·৫০

যে সব কমিশন এজেন্ট/রিটেলাররা আমাদের সেরা মানের জনপ্রিয় অন্তর্বাস বিক্রী করতে চান, তাঁদের আমরা নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে আহ্বান জানাচ্ছি। এ ছাড়াও কলকাতার বড়বাজারে পাইকারী হারে পাওয়া যায়।

**Belle Wears Private Ltd**
54B Suburban School Road
Calcutta 700 025
Phone : 48-3708

## ৪,০০,০০০ মহিলার প্রিয় বেল্—আপন করে নিন belle

'৮৮-র পূজা থেকে বেল্-এর 'ডোর-টু-ডোর' বিক্রী বন্ধ হয়ে গেছে।

HTA 3578 R2

## মার্টিনার ইচ্ছে

যদি দেখা পেতেন তবে তিনজনের সাক্ষাৎপ্রার্থী হতেন তিনি—ক্যাথরিন দ্য গ্রেট, আলেকজান্ডার এবং যিশু খ্রিস্ট। যদি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার সুযোগ পেতেন তবে আশ্রয়হীনদের আবাসের ব্যবস্থা করতেন, এবং ভাল করতেন শিক্ষাব্যবস্থা। আর যদি টেনিস না খেলতেন ? তবে ডাক্তার হতেন তিনি। ভাগ্যি হননি ! তা হলে আমরা সর্বকালের অন্যতম সেরা মহিলা টেনিস-খেলোয়াড় মার্টিনা নাভ্রাতিলোভাকে হারাতাম। তবে নিজের ইচ্ছার কথা জানতে তো অসুবিধে নেই। মার্টিনা তাঁর নিজের কিছু কথা জানিয়েছেন শিকাগোর 'সান টাইমস্' পত্রিকায়।

## ছোট্ট মেয়ের কাণ্ড

মেয়েটির বয়স পাঁচ, ৪ ফুট ৭ ইঞ্চি লম্বা এবং ওজন ৫১ পাউন্ড। খবরটার মধ্যে কোনও নতুনত্ব আছে কি ? নেই। কিন্তু যদি বলা যায়, এই মেয়েটিই ২৭ ইঞ্চি লম্বা প্রমাণ সাইজের র‍্যাকেট হাতে ধরে ঘণ্টায় ৫০ মাইল বেগে ফোরহ্যান্ড শট মারে, অনেকেই অবাক হবে। মেয়েটির নাম টিফ্‌ফানি এবং সে আমেরিকার দাদে সাউথ জুনিয়ার টেনিস টিমে খেলে। ইতিমধ্যেই পরপর আটটা ম্যাচে হারিয়েছে ন' বছরের ছেলেমেয়েদের। টিফ্‌ফানির কোচ ভিক ব্রাডেন বলেছেন, "ওকে দেখে আমার ট্রেসি অস্টিনের কথা মনে পড়ছে। ট্রেসির মতোই ওর প্রতিভা। ও বড় হবেই।" ভিকের কথা সত্য হতেই পারে। ট্রেসিরও কোচ ছিলেন এই ভিক। প্রতিভা চিনতে তাঁর ভুল হওয়ার কথা নয় !

## পর্যবেক্ষণেই ফল

'প্রতিভা' ব্যাপারটার ওপর খুব একটা গুরুত্ব দিতে চান না জো চ্যাং। জো তরুণ টেনিস স্টার মাইকেল চ্যাং-এর বাবা এবং তাঁর কোচও। জো বলেন, চ্যাম্পিয়ান হওয়ার মূলমন্ত্র নব্বই ভাগ খবরাখবর রাখা এবং দশ ভাগ প্রতিভা। খবরাখবর রাখা ব্যাপারটা হচ্ছে, বিপক্ষের দোষ-গুণ, ভুল-ত্রুটি সবকিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ এবং সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাঁকে হারানো। জো অবশ্য জানিয়েছেন, কথাগুলো শুনতে যত সোজা, কার্যক্ষেত্রে কিন্তু ততটা নয়।

## লাকি র‍্যাকেট

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতেও খুশি নন বিশ্বের এক নম্বর টেনিস তারকা ইভান লেন্ডল। তাঁর লক্ষ্য একটাই—উইম্বলডন জয়। উইম্বলডনের ঘাসে এখনও জয়ী হতে পারলেন না লেন্ডল। এবারেও আপ্রাণ চেষ্টা চালাবেন নিশ্চয়। তাঁর প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন এখনই। জাপানের একটি কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন লেন্ডল। তাদের নতুন র‍্যাকেট ব্যবহার করবেন তিনি। বিশেষভাবে উইম্বলডনের খেলার উপযোগী করেই তৈরি হয়েছে এই র‍্যাকেটগুলি। নতুন র‍্যাকেট লেন্ডলের প্রথম উইম্বলডন জয়ে সাহায্য করতে পারে কি না, এখন সেটাই দেখার।

## ছোটু

পাকিস্তান সফরে একটা টেস্টে ব্যাট করছেন সঞ্জয় মঞ্জরেকর। সঞ্জয়ের শতরান পার হয়ে গিয়েছে। নতুন বল প্রাপ্য হলেও ইমরান নিচ্ছেন না। দলের সহ অধিনায়ক মিয়াদাদ এসে অনুরোধ করলেন, কিন্তু তাঁর কথা শুনলেন না অধিনায়ক। সঞ্জয় আস্তে আস্তে দু'শো রানও পেরিয়ে গেলেন। বিচলিত মিয়াদাদ আবার এসে নতুন বল নেওয়ার কথা বললেন। বিব্রত ইমরান শুনলেন এবং বললেন, "আমিও তো জানি, বল প্রাপ্য হয়েছে। কিন্তু নিইনি কেন জানো ? ছোটুর জন্য জমিয়ে রেখেছি। এর পরেই ছোটু ব্যাট করতে আসবে। তখন ওই বল কাজে লাগবে।" কে এই ছোটু, যাকে ইমরান এতটা সমীহ করেছেন ? ছোট্ট এই ছেলেটি হল শচীন তেণ্ডুলকর। একটি ক্রীড়া-সাপ্তাহিক পরিবেশিত এই খবরে জানা গেল, পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা আদর করে শচীনকে এই নামেই ডাকতেন।

## প্রকাশের আশা

খেলোয়াড় হিসেবে যেমন, খেলা ছাড়ার পরও ঠিক ততটাই ভদ্র এবং বিনয়ী প্রাক্তন বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন প্রকাশ পাড়ুকোন। ভারতের গর্ব করার মতো ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় প্রকাশ সম্প্রতি কলকাতা ঘুরে গেলেন। জানিয়ে গেলেন, তিনি সাফল্য পেলেও অকালমৃত সৈয়দ মোদির প্রতিভা তাঁর চেয়েও বেশি ছিল। ব্যাডমিন্টন জনপ্রিয় করার জন্য প্রকাশ কিছুদিনের মধ্যেই একটি টি·ভি· সিরিয়াল করছেন। তাঁর আশা, কয়েকজন খেলোয়াড়কে কোচিং দেওয়ার চেয়েও এতে বেশি কাজ হবে। আগে এই খেলার প্রতি আগ্রহ জন্মাক, তারপর খেলা শেখানো যাবে। অর্থাৎ, গোড়া ধরেই নাড়া দিতে চান প্রকাশ।

## লেখক বেকার

টেনিস অনেক হল, এবার একটু অন্য জগতের স্বাদ পেতে চাইছেন বরিস বেকার। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে হারের পর বরিসের ইচ্ছে হয়েছে লেখক হওয়ার। রীতিমত গল্প লেখক। বিষয়ও ঠিক করে ফেলেছেন। টেনিস-তারকার কষ্টের জীবনই নাকি হবে গল্পের মূল কাহিনী।

# টেনিসে যেমন গ্রাফ, দাবায় তেমনই মায়া

## মেয়েদের দাবায় বিশ্বচ্যাম্পিয়ান মায়া চিবুরদানিজকে চ্যালেঞ্জ করার কেউ নেই, লিখেছেন **মানস চক্রবর্তী**

নেহরু কাপ এবং চলচ্চিত্র উৎসবের মাঝখানে পড়ে কলকাতায় আন্তজাতিক গ্র্যাণ্ডমাস্টার দাবা তেমনভাবে সাড়া তুলতে পারল না। ব্যাপারটা যতটা না আফসোসের, তার চেয়েও বেশি অনুশোচনার। এজন্যই যে, উঁচুমানের এই টুর্নামেন্টে যাঁরা খেলতে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন এক রুশ তরুণী, এ-শহরেই যিনি তাঁর উনত্রিশতম জন্মদিনটি পালন করলেন। সুন্দরী, মার্জিত ব্যবহারের এই তরুণীটিকে স্পোর্টস সিটি কেন সেভাবে অভ্যর্থনা জানাতে পারল না, এটা বহুদিন আমাদের চিন্তার বিষয় হয়ে থাকবে। কারণ, বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান এ-শহরে খুব বেশি আসেননি। ভবিষ্যতেও যে আসবেন এমন কোনও সম্ভাবনা নেই। যাঁরা এসেছেন তাঁরাও টপ ফর্মে আসেননি। পেলে যখন ফুটবল খেলেছেন তখন তিনি অতীত গৌরবের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছেন। অবসর গ্রহণের পরে এসেছিলেন মানব-এঞ্জিন এমিল জেটোপেক। কিন্তু মায়া চিবুরদানিজ তো তা নন। গত এগারো বছর ধরে তিনি মেয়েদের দাবার অবিসংবাদিত চ্যাম্পিয়ান। এবং ঠিক এই মুহূর্তে যেমন স্টেফি গ্রাফের সামনে কোনও চ্যালেঞ্জ নেই, তেমনই মায়ার সামনেও কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। হয়তো সে-জন্যই মায়ার কোচ গ্র্যাণ্ডমাস্টার এডোয়ার্ড গুফেল্ড বলেন, "দূরবিন লাগিয়েও কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী দেখতে পাচ্ছে না মায়া।" এই মুহূর্তে জুডিথ পোলখা ছাড়া সে-রকম বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ওঁর নেইও। কিন্তু পোলখা মেয়েদের দাবায় খেলে না।

দাবার রানি মায়ার উত্থান অনেকটা রূপকথার মতো। জন্মগত প্রতিভা ছাড়া বড় দাবাড়ু হওয়া যায় না। ব্যাপারটা অন্তত ভারতীয়দের অজানা নয়। মাত্র সতেরো বছরে গ্র্যাণ্ডমাস্টার হয়েছেন বিশ্বনাথন আনন্দ। শৈশবেই সাড়া জাগিয়েছেন আন্তজাতিক মাস্টার ও গ্র্যাণ্ডমাস্টার নর্ম পাওয়া দিব্যেন্দু বড়ুয়া। মায়াও তেমনই। আট বছর বয়সেই তিনি সাড়া জাগিয়েছিলেন সেই দেশে, যারা আজ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশিসংখ্যক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান তৈরি করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে ফুটবলের পরেই জনপ্রিয় হচ্ছে দাবা। প্রায় প্রতি প্রদেশেই রয়েছেন একাধিক গ্র্যাণ্ডমাস্টার। এহেন দেশে দাবা খেলে নজর কাড়তে গেলে যথেষ্ট প্রতিভা ও পারফরম্যান্স থাকা দরকার। এই কাজটা কিন্তু আট বছরেই করে ফেললেন মায়া। জর্জিয়ার কুতাইসি থেকে রাজধানী মস্কোতে পৌঁছতে তাঁর লাগল মাত্র তিন বছর। সেবারই জাতীয় মহিলা দাবায় অংশ নিলেন মায়া এবং জাতীয় চ্যাম্পিয়ান হলেন। পরের বছরেই রুমানিয়ার ব্রেশভ-এ একটি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার্স খেতাব পান মায়া। তখনকার দিনে মেয়ে-দাবাড়ুদের ওটাই সর্বোচ্চ খেতাব। বিশ্ব দাবা ফেডারেশনের নিয়ম অনুসারে কম বয়সে ওই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া যেত না। কিন্তু মায়ার জন্যই নিয়ম বদলে ছিল। প্রতিভার জোরে দাবার নিয়মই বদলে দিয়েছিলেন তিনি। ব্যাপারটা বিস্ময়ের। ১৫ বছর বয়সে গ্র্যাণ্ডমাস্টার হলেন মায়া। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হলেন ১৭ বছর বয়সে। এত কম বয়সে কোনও খেলায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন শুধু নাদিয়া কোমানিচ। ওলিম্পিক গেমস বলে জিমনাস্ট নাদিয়ার খ্যাতি বিশ্বজোড়া। মায়ারও তাই। কিন্তু অত প্রচার তিনি পান না।

সেই যে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হলেন, তারপর আর তাঁকে আসন থেকে টলানো যায়নি। পর-পর পাঁচবার তিনি তাঁর খেতাব অক্ষুণ্ণ রেখে ইতিমধ্যেই গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম তুলে ফেলেছেন। এতেই থেমে থাকেননি মায়া। যেহেতু দাবা মস্তিষ্কের খেলা, শারীরিক ব্যাপারটা এখানে তেমন প্রয়োজনীয় নয় (তার মানে অবশ্য এই নয় যে, খারাপ শরীর নিয়েও খেলা যাবে), তাই এখানে পুরুষদের সঙ্গে লড়তে পারেন মহিলারাও। অবশ্য যদি সামর্থ্য থাকে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হওয়ার পর মায়া সেটাই করলেন। মহিলাদের দুনিয়ায় নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে তিনি নিজেকে নিয়ে এলেন পুরুষদের জগতে। এবং বিশ্বের সেরা গ্র্যাণ্ডমাস্টারদের সঙ্গে লড়েও গ্র্যাণ্ডমাস্টার হলেন মাত্র তেইশ বছরে। বিশ্বে মায়া ছাড়া আর মাত্র একজন মহিলা এই সম্মানের অধিকারী। তিনি হলেন মায়ারই স্বদেশীয় লেনা গ্রাফিন্দ্রিসিভিলি। এঁকে হারিয়েই প্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হন মায়া, এবং ৩·৫ পয়েন্টের ব্যবধানে। ➳

নেশায় দাবাড়ু হলেও মায়া পেশায় চিকিৎসক। সম্প্রতি প্রচুর নম্বর পেয়ে ডাক্তারি পাশ করেছেন। ইতিমধ্যেই তিনি জর্জিয়া রিপাবলিকের সুপ্রিম সোভিয়েতের সদস্য। আমাদের দেশের রাজ্যসভার সদস্যের মতোই তাঁর সম্মান।

খেলাধুলো

শিবাজি গঙ্গোপাধ্যায়

# শক্ত জিনিসে আঘাত করে ক্যারাটে শেখা উচিত নয়

কিওকুশিন ক্যারাটের হাত দিয়ে মারার একটি বিশেষ পদ্ধতি, যার নাম সুতো, নিয়ে কয়েকটি সংখ্যায় আলোচনা করেছি। এবারও আলোচনা করব। তার আগে একটি ঘটনার কথা বলি। একটি ছেলে ক্যারাটে শেখার জন্য যেখানে হাতের বহিঃপ্রান্ত দিয়ে জোর করে একটি লোহার মোটা পাতের উপর সুতোর কৌশল অনুশীলন করত কমপক্ষে পঞ্চাশবার। শিক্ষক ছেলেটিকে বলেছিলেন যে,ছ' মাসের মধ্যে হাত দিয়ে তিনি ইট ভাঙা (যেটা নাকি ক্যারাটের এক দারুণ কঠিন ব্যাপার) শিখিয়ে দেবেন। এইভাবে হাত দিয়ে লোহার পাতের উপর আঘাত করার ফলে ছেলেটির হাতের যথেষ্ট ক্ষতি হয়ে গেছে। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, ক্যারাটে জানা মানেই ইট, কাঠ, টালি ভাঙা নয়। এটা একটা আর্ট, ধাপে-ধাপে কঠোর অনুশীলন ও নিষ্ঠা নিয়ে ভালভাবে ভাল শিক্ষকের কাছে শিখলে তবেই চোট বা আঘাত বাঁচিয়ে ঠিকভাবে ক্যারাটে শেখা যায়। এবারে আমি আর-একরকম সুতো নিয়ে আলোচনা করছি, যার জাপানি নাম সুতো সাকুতসো উচি।

**সুতো আকুতসো উচি** : প্রথমে ইওই দাচি তারপর সানচিন দাচিতে ঠিকভাবে দাঁড়াতে হবে। বাঁ হাত সামনে নিজের কলার বোন উচ্চতায় ছবির মতো রেখে ডান হাত ডান পাঁজর স্পর্শ করে দাঁড়াতে হবে। ডান হাতের চেটো ওপর দিক করে থাকবে। এইবার ডান হাতটাকে কানের পেছনে রাখতে হবে এবং বাঁ হাত সরে এসে ডান পাঁজর স্পর্শ করে রাখতে হবে। এইবার ডান হাত কানের পেছন থেকে উল্লম্বভাবে বড় করে বৃত্তাকার পথে ঘুরে ওপর থেকে

নীচের দিকে নিতে হবে। প্রতিপক্ষের কলার বোনে আঘাত করতে হবে, সেই সঙ্গে বাঁ হাত সরে এসে বাঁ পাঁজর স্পর্শ করে শেষ হবে। এইভাবে আবার বাঁ হাত তারপর আবার ডান হাত দিয়ে অনুশীলন করতে হবে প্রতি হাতে কুড়ি বার করে। বাঁ হাত দিয়ে আঘাত করার সময় কোমরের থেকে শরীরের ওপর ভাগ ডান দিকে ৪৫ ডিগ্রি ঘুরে থাকবে এবং ডান হাত দিয়ে আঘাত করার সময় শরীরের ওপর ভাগ কোমর থেকে বাঁ দিকে ৪৫ ডিগ্রি ঘুরে থাকবে।

বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত ক্যারাটে শিখতে হলে হাত-পা শক্ত করার জন্য ঠিকভাবে না জেনে কোনও শক্ত জিনিসে আঘাত করে অনুশীলন করা উচিত নয়। ⌂

*ফোটো : উৎপল সরকার*

# মাঝমাঠের লড়াই

গৌতম সরকার

*পূর্ব প্রকাশিতের পর*

গোল করতে কে না ভালবাসে ? মাঝমাঠে খেললেও এ-ব্যাপারে আমার ভালবাসা এবং ইচ্ছা কম ছিল না। মনে আছে, জুনিয়ার বাংলা দলে খেলার সময় বেশ কয়েকটা গোল করেছিলাম। সৌভাগ্যের কথা, ছোট দলের বিরুদ্ধে তো বটেই, বড় দলের বিরুদ্ধেও আমি গোল পেয়েছি। আমার জীবনের প্রথম বড় ম্যাচ মহমেডানের বিরুদ্ধেই আমি গোল করেছিলাম। এর পরে আরও কয়েকটা গোল করেছি।

*প্রসূনের লড়াকু মেজাজ ছিল দেখবার মতো*

তবে খুব তৃপ্তি পেয়েছিলাম, ১৯৭৯ সালের আই· এফ· এ· শিল্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলকে গোলটা দিয়ে। ম্যাচে ওটাই একমাত্র গোল। অর্থাৎ আমার গোলেই মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ান হয়। এখনও গোলটার কথা ভুলিনি। মাঝমাঠে বলটা পেয়ে প্রশান্ত ব্যানার্জিকে কাটাই। দেখি ওদের গোলকিপার ভাস্কর কিছুটা এগিয়ে এসেছে। এদিকে সাইড লাইন ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল আমাদের মানস। ডিফেন্ডাররা ভাবল, আমি বোধ হয় মানসকে বলটা বাড়াব। এই সুযোগটা আমি নিলাম। দূর থেকে একটা পাঞ্চ করলাম। দেখি বল গোলে ঢুকে গেছে। ভাগ্যিস, বলটা গোলে ছিল, না হলে মানস খুব রেগে যেত। যেহেতু প্রচুর গোল করিনি, তাই সুযোগ পেয়ে নিজের করা গোলের কথা বলে নিলাম। কিন্তু যেই ভৌমিক, হাবিব, শ্যাম, সুরজিৎ, মানসের করা সব অসাধারণ গোলের কথা মনে পড়ে গেল, অমনই নিজেরই লজ্জা লাগছে। কী করে ভুলি, ১৯৭৩ সালে আই·এফ·এ· শিল্ডে পিয়ং ইয়ং সিটি ক্লাবের বিরুদ্ধে ভৌমিকের করা অনবদ্য গোলটার কথা। প্রায় জিরো ডিগ্রি কোণ থেকে যে গোলটা করেছিল, যেটা ও ভুলে গেলেও আমি জীবনে ভুলব না। মনে রাখতে হবে, গোলটা স্থানীয় দলের বিরুদ্ধে নয়, আন্তর্জাতিক মানের একটা ক্লাব দলের বিরুদ্ধে। শ্যামের বাই সাইকেল কিকের গোল তো চোখজুড়নো। অসম্ভব সাহস নিয়ে যেসব জায়গা থেকে বড়েমিঞা হাবিব গোল করে গেছে, তা যে না দেখেছে, তাকে বিশ্বাস করানো কঠিন। ফুটবলের প্রতি কতখানি নিষ্ঠা থাকলে যে এসব গোল করা যায়, তা ভাবলেও শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়। সংখ্যায় হয়তো বেশি নয়, কিন্তু আর-একজনও বাঁ পায়ে চমৎকার গোল করেছে কয়েকটা। গোপালের করা ওইসব গোলে একদিকে যেমন আছে বুদ্ধির ছোঁয়া, অন্যদিকে তেমনই আছে শিল্পের মাধুর্য।

প্রসূন ব্যানার্জির ডাকনাম গোপাল। আসলে ওর সঙ্গে আমার যোগাযোগ এতদিনের এবং সম্পর্ক এত গভীর যে, ওকে পোশাকি নামে ডাকতেই পারি না। ওকে প্রথম দেখি ১৯৭১ সালে, খিদিরপুরে, আমরা দু'জনেই ছিলাম। তারপর ইয়ুথ এশিয়ান গেম্‌স, ১৯৭৪-এ মারদেকা টুর্নামেন্টে এবং মাঝে-মাঝেই সন্তোষ ট্রোফিতে খেলেছি। মাঝমাঠে একসঙ্গে জুটি বাঁধলাম পাকাপাকিভাবে ১৯৭৭-এ, যখন আমি মোহনবাগানে এলাম। ১৯৭৭ থেকে ১৯৮০— চার বছর একসঙ্গে খেলার পর গোপাল মহমেডানে যেতে বাধ্য হল। আবার ১৯৮২ আর ১৯৮৩ সালে আমরা একসঙ্গে খেলি।

১৯৭১-এর পর, '৭৭-এর আগে একসঙ্গে ক্লাব পর্যায়ে খেলিনি বটে, কিন্তু ওর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ভালই ছিল। প্রদীপদার বাড়িতে প্রায়ই যেতাম, সেখানেই গোপালের সঙ্গে দেখা হত, তখন ভাবতাম প্রদীপদার ভাই বলে ওর কত সুবিধা। কত কিছু জানতে পারছে। পরে দেখেছি ওর নিজেরই নিষ্ঠা, আন্তরিকতা আর চেষ্টায় ও মাঠ কাঁপিয়েছে। ১৯৭২ থেকে '৭৫— চার বছর আমি পিন্টুর সঙ্গে খেলেছি আর প্রসূনের সঙ্গে ছ' বছর। দু'জনের সঙ্গে খেলেই আমি খুব আনন্দ পেয়েছি, ভাল লেগেছে দু'জনের সঙ্গই। কোন জুটি ভাল তা বিচারের ভার আমার নয়, তবে সাফল্যের দিক দিয়ে নিঃসন্দেহে প্রসূন আর আমার জুটিই এগিয়ে। বহু ট্রোফিতে আমরা সাফল্য পেয়েছি। প্রসূনের একমাত্র গোলে মোহনবাগান অবশ্য ডুরান্ড কাপও ঘরে তুলেছিল— ওই ১৯৭৯ সালে যেবার আমার গোলে মোহনবাগান শিল্ড পায়। দুই লিঙ্কম্যানের গোলে দুটি ট্রোফি আসা, আমাদের কৃতিত্ব কি একেবারে কম ? একবারও অস্বীকার করব না, মোহনবাগানের অন্য খেলোয়াড়দের সহযোগিতাও।

প্রসূন মূলত আক্রমণাত্মক খেলোয়াড়। অন্তত প্রথমদিকে ওকে তাই দেখেছি। পরে অবশ্য খেলায় অনেক পরিবর্তন আনে। যথার্থ লিঙ্কম্যানের মতো এগিয়ে-পিছিয়ে, প্রয়োজনে ডিফেন্সে নেমে গিয়েও দলকে সাহায্য করেছে। নিজেকে যে কীভাবে শুধরেছে তা ভাবা যায় না। দিনের পর দিন অনুশীলন করে গেছে আরও ভাল করার জন্য। (ক্রমশ)

অনুলিখন : তানাজি সেনগুপ্ত

মরসুমের প্রথম খেলায় প্রচণ্ড হারের পরে রয় নতুন করে দল গড়ে কারফোর্ড সিটিতে খেলতে গেল। বাজার থেকে টাকা দিয়ে খেলোয়াড় কিনতে রাজি হয়নি বলে ভাল ফল রোভার্সের খেলোয়াড়-ম্যানেজারের কাছে ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ···
কী ছোঁয়া !
রয় ছুটেছে !
কারফোর্ড
ফোর্ড
জাদু, পাকো ডায়াজ, জাদু !
রোভার্সের রয়
রয় এগিয়ে গেল, এবং···
ও কাকে খুঁজছে ?
···লম্বা পাস ! মাঠের ওপর দিয়ে !
গ্লেন রিচি ! স্কটল্যান্ড থেকে আমদানি নতুন খেলোয়াড় !
আর দ্যাখো, ও কীভাবে ছুটছে !
রিচি এসেছে শক্ত, দ্রুত আর সাহসী খ্যাতি নিয়ে !
ও দ্রুত সন্দেহ নেই ! তবে ওদের কাটিয়ে ঢুকতে সাহস লাগবে !
কারফোর্ড, ওকে বসিয়ে দাও···
ননননন !
ওরা ওকে ফেলে দিয়েছে···তবে ক্রসটা দেওয়ার শক্তি ওর ছিল !
সেই মুহূর্তে রয় দূরের গোলপোস্টে হাজির···
ব্ল্যাকি গ্রে !
ওখানে ঢোকো !
হ্যাঁঅ্যাআ্যা !
কারফোর্ড সিটি ০, মেলচেস্টার রোভার্স ১ !

অজস্র মেলচেস্টার সমর্থক আনন্দে আত্মহারা !
রয় নিশ্চয় এই প্রথম গোলটার জন্য প্রার্থনা করছিল !
শুরুটা দারুণ !
আশা করা যাক ছেলেরা এটা বজায় রাখবে !
কিন্তু কারফোর্ড খেলায় ফিরতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ !
লড়ে যাও, কারফোর্ড ! হোভার্টন রোভার্সকে হারাতে পারলে তোমরাও পারবে !
পার্থক্যটা ৫-১ করে ফ্যালো !
টাবি মর্টন গোলে থাকতে সমস্যা নেই ! ও বুড়ো-হাবড়া !
কারফোর্ড
এই ক্রসটা ওর পাকা চুলের সংখ্যা বাড়িয়ে দেবে !
ছেড়ে দাও, ভিক গাথরি !
কী হচ্ছে... ?
মেলচেস্টার 'সুপারব্র্যাট' মাথা ঝাঁকাল...
হ্যাঁ, বুড়ো টাবি কাউকে তার পথ আটকে দাঁড়াতে দেয় না...
ইয়ে... মনে হয় একেই তুমি নিজের গোলসীমা দখলে রাখা বলো !
ন্যাট গসডেন !
গতির অভাব ও অভিজ্ঞতা দিয়ে পুষিয়ে দেয় !
দারুণ থ্রো !
সিটির কিছু সমর্থক রোভার্সের প্রৌঢ় মিডফিল্ডারকে বিদ্রূপ করছিল...
বাঃ ! মেলচেস্টার আজকাল যেন বুড়োদের সেনাবাহিনী !
দাদু, পেনশন নিয়ে খেলা ছেড়ে দিন !
হ্যাঁঅ্যাঅ্যা !
তখন !
রয় !
বাহবা ! মাপা বল ! নিখুঁতভাবে তুলে দেওয়া !
ঠিক রয়ের রকেটের জন্য সাজিয়ে...
...দেওয়া !
গোওওওল !
অপূর্ব ! মনে হচ্ছে রোভার্স যেন আবার চূড়ায় ছুটে চলেছে !
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

প্রযুক্তিবিজ্ঞান

# কম্পিউটারের ভাষা

আশ্চর্য যন্ত্র কম্পিউটার । তাকে দিয়ে কোনও কাজ করাতে হলে জানা দরকার তার ভাষা । কম্পিউটার কীভাবে কাজ করে প্রথমে সে-বিষয়ে আলোচনা করেছেন **অসীমরতন ঘোষ**

শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কাচের ঘরে রাখা আছে টিভির মতো এক যন্ত্র । সঙ্গে জোড়া আছেA, B, C, D, 1, 2, 3, 4, +, – এরকম কিছু চিহ্ন দেওয়া সুইচের বাক্স । দেখতে অনেকটা টাইপরাইটারের মতো । সুইচগুলো হালকাভাবে ছুঁতেই সেই সুইচে লেখা চিহ্নটি ফুটে উঠছে টিভির পরদায় । কম্পিউটারে কাজ করা হচ্ছে । এই দৃশ্য আমরা অনেকেই দেখেছি । দেখা গেল, একটি ছেলে বা মেয়ে সুইচগুলো ছুঁয়ে-ছুঁয়ে পরদায় ভারতীয় ক্রিকেট-দলের খেলোয়াড়দের নাম লিখছে । Vengsarkar, Arunlal, Siddhu, Amarnath, Kapildev, Azharuddin, More, Raman, Yadav, Shastri, Maninder. এর পরে সে লিখল Arrange Alphabetically সঙ্গে-সঙ্গে অভিধানে শব্দগুলো যেমনভাবে সাজানো থাকে ঠিক সেইভাবে সাজানো অবস্থায় নামগুলো ফুটে উঠল :

Amarnath, Arunlal, Azharuddin, Kapildev, Maninder, More, Raman, Shastri, Siddhu, Vengsarkar, Yadav.

আমরা নিজেরা এভাবে সাজাতে গেলে অন্তত দু-তিন মিনিট লাগবেই । কম্পিউটার কিন্তু কাজটা কয়েক সেকেণ্ডেই করে দিল ।

এর পরে দেখা গেল সেই ছেলেটি বা মেয়েটি কম্পিউটারের সঙ্গে গল্প করছে । একটা নম্বর লেখার সঙ্গে-সঙ্গে পরদায় ফুটে উঠল GOOD MORNING, DO YOU

ফোটো : ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক-এর সৌজন্যে

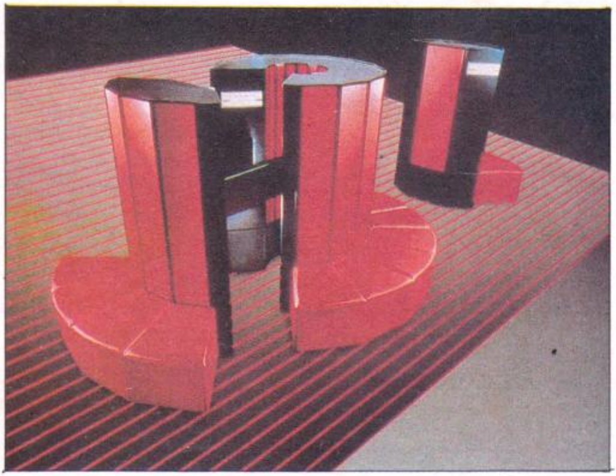

*দুর্ধর্ষ সুপার কম্পিউটার ক্রে এক্স-এম পি । এই সুপার কম্পিউটার এক সেকেন্ডে একশো কোটি হিসেব করে দেয় । জটিল কাজের সমাধানে এর জুড়ি নেই ।*

LIKE TO TALK WITH ME ? সুইচগুলো ছুঁয়ে সে লিখল YES পরদায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফুটে উঠল : THANK YOU, WHAT IS YOUR NAME ? ছেলেটি লিখল DEBASHIS MUKHERJI. সঙ্গে-সঙ্গে ফুটে উঠল.....এইভাবে আলাপ চলতেই থাকল । এই ব্যাপারগুলো ঘটে কীভাবে ? কম্পিউটার কি মানুষের মতোই বুদ্ধিমান ? না, আদৌ তা নয় । বুদ্ধি জিনিসটাই কম্পিউটারের নেই । যে-কোনও কাজ কম্পিউটারকে দিয়ে করাতে হলে তা শিখিয়ে দিতে হয় আগে থেকে । না শেখালে কোনও কাজই কম্পিউটার করতে পারে না । নিজের কোনও বুদ্ধি নেই ঠিকই, কিন্তু তার সাধ্যের মধ্যে যে-কোনও কাজই সে শেষ করতে পারে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় । আমাদের উদাহরণের ক্ষেত্রে ক্যাসেটের মতো ফ্লপি ডিস্কে বলা ছিল কাজগুলো কীভাবে করতে হবে । নতুন কোনও কাজ করাতে হলে তা শিখিয়ে না দিলে কম্পিউটার কাজটি করতে পারবে না । আসলে কম্পিউটার অনেকগুলি যন্ত্র দিয়ে তৈরি এক যন্ত্র-সমষ্টি । এর একটি যন্ত্র তথ্য (data) সংগ্রহ করে । টিভির সঙ্গে বেশ কিছু সুইচ জোড়া যে মেশিনটির কথা একটু আগেই বলা হয়েছে তা একটি তথ্য সংগ্রাহক যন্ত্র (input devicer). প্রচুর তথ্য সঞ্চয় করে রাখে **স্মৃতি** (memory) নামে এক অংশে । যে-কোনও তথ্যই প্রথমে এসে জমা হয় এই স্মৃতিতে । কম্পিউটারের স্মৃতির সঙ্গে মানুষের স্মৃতির প্রায় কোনও মিলই নেই । এরা ইলেকট্রনিকভাবে তথ্য জমা রাখে । কম্পিউটার তথ্যগুলি নিয়ে কীভাবে কাজ করবে তা কম্পিউটারকে শিখিয়ে দিতে হয় । শেখানোর কাজ করা হয় কিছু সহজ নির্দেশের সাহায্যে । কম্পিউটার সহজেই করতে পারে (যেমন যোগ, বিয়োগ, গুণ বা দুটি সংখ্যার কোনটি বড় ?) এমন নির্দেশই শুধু দেওয়া হয় । কোনও বড় কাজকে এইভাবে ছোট-ছোট সরল নির্দেশ পর পর সাজিয়ে বোঝানোকে বলা হয় **কম্পিউটার প্রোগ্রাম** । পর পর লেখা নির্দেশগুলো মেনে নিয়ে কম্পিউটার সেইভাবে কাজ করে । নির্দেশগুলো বোঝার কাজটি শেষ হয় **সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট** বা C. P. U.-তে । আরও ঠিকভাবে বললে C. P. U -এর **নিয়ন্ত্রণ** অংশে প্রোগ্রামটি কম্পিউটারের নিজের মতো করে বুঝে নেওয়ার কাজটি হয় । এটিই C. P. U-এর কোনও তথ্য নিয়ে কী করতে হবে তা জানিয়ে দেয় । অন্য অংশটির কাজ হল গণনা করা । এ ছাড়া

## নানারকম কম্পিউটার

কম্পিউটার মানুষের ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দেয় । তবে মানুষের ইচ্ছা ও কাজ নানারকমের । বিশেষ ধরনের কাজে অনেক সময় কম্পিউটারের সব অংশ কাজে লাগে না । তখন ওই কাজের জন্য দরকার পড়ে যে সমস্ত অংশ শুধু তাদের জুড়েই তৈরি হয় **বিশেষ-প্রয়োজনের কম্পিউটার** ।
তবে সাধারণভাবে, বিজ্ঞান, অঙ্ক, প্রযুক্তিবিজ্ঞান, ব্যবসা ও অন্যান্য কাজে ব্যবহারের জন্য তৈরি হয়েছে **সব-কাজের কম্পিউটার** । কিছু বিশেষ যন্ত্র ছাড়া প্রায় সব অংশই এই কম্পিউটারে থাকে । সব কম্পিউটার একভাবে কাজ করে না । কাজের রীতিনীতি অনুযায়ী এদের দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয় । ডিজিটাল আর অ্যানালগ । বিশ্বের যে-কোনও ধরনের সমস্যার সমাধান কম্পিউটার করে দিতে পারে যদি

*পার্সোনাল কম্পিউটার*

কোনও-কোনও বিষয়ে এই অংশ যুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্ত নিতে পারে (যেমন দুটি সংখ্যার কোনটি ছোট কোনটি বড়, না কি তারা সমান তা নির্ণয় করা)। এখানে স্মৃতি থেকে তথ্য এনে ও তাদের ব্যবহার করে ফল নির্ণয় করা হয়।

এই দুই অংশ নিয়েই তৈরি কম্পিউটারের মস্তিষ্ক C. P. U.

C.P. U.এ তৈরি ফল চলে যায় স্মৃতিতে। প্রিন্টার নামে এক অংশ সে ফল ছাপে। তা হলে কম্পিউটার কীভাবে কাজ করে ?

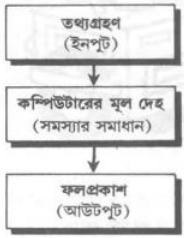


আরও বিস্তারিতভাবে দেখলে, (১) তথ্য ও নির্দেশমালা (প্রোগ্রাম) গ্রহণ → (২) তথ্যের স্মৃতি ও প্রোগ্রামের স্মৃতিতে সঞ্চয় → (৩) C.P. U.-এর নিয়ন্ত্রণ অংশে প্রোগ্রামের নির্দেশগুলো বোঝা → (৪) C.P.U.-এর গণনা ও সিদ্ধান্ত অংশে ফল নির্ণয় → (৫) ফলের স্মৃতিতে ফেরা → (৬) (প্রিন্টারের বা অন্য কিছুর সাহায্যে) ফল প্রকাশ। ছবির সাহায্য নেওয়া যাক :

*কম্পিউটার এমন এক ইলেকট্রনিক যন্ত্র, যাকে কোনও তথ্য বা নির্দেশ সরবরাহ করলে পূর্ব নির্ধারিতভাবে সে কাজ করে। কাজটির ফলও সে জমিয়ে রাখতে বা দরকারমতো প্রকাশ করতে পারে।*

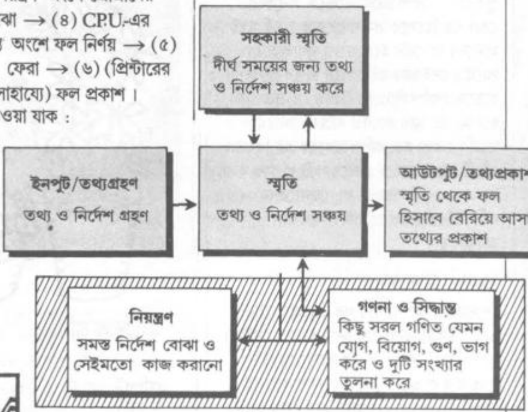


C.P.U

প্রশ্ন বা সমস্যাটি অঙ্কের ভাষায় ও সংকেত দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ, অঙ্কের ভাষায় সমস্যাটি রূপান্তরিত করে প্রোগ্রাম লিখতে পারলেই কম্পিউটার তার সমাধান করে দিতে পারবে। প্রোগ্রাম লেখার দায়িত্ব থাকে মানুষেরই ওপর। আমাদের দেখা বেশির ভাগ কম্পিউটারই এই ধরনের ডিজিটাল কম্পিউটার। কিন্তু অনেক কম্পিউটারে মানুষ প্রোগ্রামটি লিখে দিলেও, তারা পরিবেশ বা অন্য কোনও যন্ত্রের কাছ থেকে সরাসরি তথ্য গ্রহণ করে। ওইসব কম্পিউটারে সেই তথ্য বিশ্লেষিত হয়। গৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কোনও একটি নির্দিষ্ট নির্দেশ উত্তর হিসেবে বেরিয়ে আসে। ওই উত্তর সরাসরি চলে যায় কম্পিউটারের বাইরের অন্য কোনও যন্ত্রে। এর ফলে কম্পিউটার কোনও যন্ত্র বা পরিবেশ থেকে গৃহীত তথ্য কাজে লাগিয়ে (মানুষেরই পরিকল্পিত) কোনও নির্দেশ সরাসরি পাঠায় সেই যন্ত্রে বা অন্য কোনও যন্ত্রে। এইভাবে কম্পিউটার সবসময় নিয়ন্ত্রণ করে ওই যন্ত্রের কাজ। এই ধরনের কম্পিউটারকে বলা হয় অ্যানালগ কম্পিউটার। বিভিন্ন কম্পিউটারের কাজ করার ক্ষমতা ও সমাধানের দ্রুততা তাদের নিজেদের গঠনের ওপর নির্ভরশীল। এই বিষয়ের ওপর নির্ভর করে তৈরি হয়েছে নানারকম কম্পিউটার।

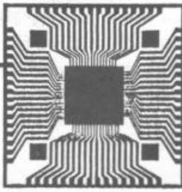

**মাইক্রোপ্রসেসর**--এর ব্যবহার বৈজ্ঞানিক কাজকর্মেই বেশি। সিলিকনের তৈরি ছোট একটি খণ্ডের মধ্যে থাকে জটিল অসংখ্য ইলেকট্রনিক সার্কিট বা সংযোগব্যবস্থা। একে বলা হয় 'চিপ'।

**মেন ফ্রেম কম্পিউটার** হল সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত কম্পিউটার। এর স্মৃতিশক্তি প্রখর। কাজ করে খুব দ্রুত। এই ধরনের ভাল একটি কম্পিউটার এক সেকেন্ডে প্রায় তিন লক্ষ হিসেব কষে ফেলতে পারে।

**মিনি কম্পিউটার** মেন ফ্রেম কম্পিউটারের তুলনায় অনেক কম ক্ষমতাশালী। স্মৃতিশক্তিও বেশ কম।

**মাইক্রো কম্পিউটার**-এর ক্ষমতা খুবই কম। এটি বাড়ির ছোটখাটো কাজের জন্য তৈরি। দামও বেশ অল্প। এই কম্পিউটার **পার্সোনাল কম্পিউটার** নামে পরিচিত।

**মাইক্রোপ্রসেসর**-এর ব্যবহার বৈজ্ঞানিক কাজকর্মেই বেশি। সিলিকনের তৈরি ছোট একটি খণ্ডের মধ্যে থাকে জটিল ইলেকট্রনিক সার্কিট বা সংযোগ ব্যবস্থা। একে বলা হয় **চিপ**। মাইক্রোপ্রসেসরে সাধারণত একটি চিপ থাকে। বড় কম্পিউটারে কিন্তু চিপ থাকে অনেক।

গুণের দিক থেকে মেন ফ্রেম সহ যে-কোনও কম্পিউটারের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী কম্পিউটার হল **সুপার কম্পিউটার**। এদের স্মৃতিশক্তি অসম্ভব বেশি। এদের কাজ করার হার অবিশ্বাস্যরকম দ্রুত। এক সেকেন্ডে এরা কয়েক কোটি জটিল হিসেব করতে পারে। সারা পৃথিবীতে এখন ১৮০টির মতো সুপারকম্পিউটার আছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা এই সংখ্যা, আগামী পাঁচ বছরেও, দু'শো ছাড়াবে না। এই সেদিন পর্যন্ত 'কন্ট্রোল ডেটা কর্পোরেশন' আর 'ক্রে রিসার্চ' এই দুই প্রতিষ্ঠানই শুধু সুপার কম্পিউটার তৈরি করত। এদের তৈরি সুপার কম্পিউটারের কয়েকটি : **সাইবার ২০৫ সিস্টেম এবং ক্রে-১, ক্রে-২, ক্রে এক্স এম পি সিস্টেম।** কম্পিউটার তৈরির পুরনো প্রতিষ্ঠান আই বি এম সম্প্রতি সুপার কম্পিউটার তৈরি শুরু করেছে। ভারতে সাইবার ও ক্রে—দু' ধরনের কম্পিউটারই আছে।

## কম্পিউটারের বিবর্তন

চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি কম্পিউটারের আবিষ্কার। আবিষ্কারের পর থেকেই কম্পিউটারের উন্নতি ঘটেছে অবিশ্বাস্য দ্রুততায়। কম্পিউটার নিজেকে এ-যুগের শ্রেষ্ঠ যন্ত্র হিসেবে প্রমাণ করেছে। এই যন্ত্রই মানুষের না-মেটা ইচ্ছেগুলো পূর্ণ করতে পারে। সেইজন্য এই বিষয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। কম্পিউটারের উন্নতি যে দ্রুততায় হয়েছে, তা আর কোনও যন্ত্রের ক্ষেত্রেই ঘটেনি। বলা হয়, কম্পিউটারের এই বিবর্তন পাঁচটি ধাপে হয়েছে। প্রত্যেকটি ধাপকে বলা হয় এক-একটি 'প্রজন্ম' বা 'জেনারেশন'। কম্পিউটারের ক্ষেত্রে প্রজন্ম-ব্যবধান অকল্পনীয়।

### ১৯৪৬। প্রথম প্রজন্ম

সে সময়ের কম্পিউটার খুব বড় আকারের ছিল। একটা বিরাট ঘর জুড়ে থাকত সেইসব কম্পিউটার। কম্পিউটারে ভ্যাকুয়াম টিউব ব্যবহার করা হত। কিছুক্ষণ কাজ করলেই কম্পিউটারগুলো এত গরম হয়ে যেত যে, বেশিক্ষণ একটানা কাজ করা যেত না। বড় কাজ করতেও বেশ অসুবিধে হত। তা ছাড়া এই কম্পিউটার কাজ করত অনেক কম দ্রুততায়। বলা বাহুল্য কম্পিউটারের আবিষ্কার মানবসভ্যতাকে একধাপ এগিয়ে দিল তখনই।

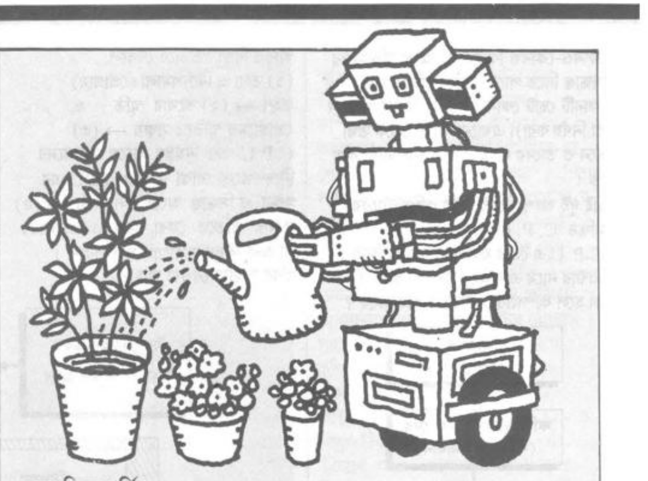

### জল দিচ্ছে চার্লি

বাগানের গাছপালায় জল দেওয়ার কাজেও কি কম্পিউটারকে লাগানো যায়? কম্পিউটারচালিত উদ্যান-পরিচালকের খোঁজ ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। ক্যালিফোর্নিয়ার অপেশাদার এঞ্জিনিয়র জিম হিল নিজের হাতেই তৈরি করেছেন একটি রোবট। নাম 'চার্লি'। ছ' ফুট লম্বা চার্লির ওজন ২০০ পাউন্ড। তার শরীরে আছে কয়েকশো কম্পিউটার চিপ ও ৩০টি মোটর। জিম হিলের আর চিন্তা নেই। বাগানে জল দেওয়া থেকে শুরু করে আরও নানা কাজই এখন চটপট সেরে ফেলছে চার্লি।

### ১৯৫৯। দ্বিতীয় প্রজন্ম

এল ট্রানজিস্টর। বড়-বড় আকারের ডায়োড, ট্রায়োডের মতো ইলেকট্রনিক যন্ত্রগুলোর জায়গা দখল করে নিল এরা। ফলে আণবিক স্তরেই কাজ হতে লাগল। রেডিওর মতো অনেক যন্ত্রেই ট্রানজিস্টরের ব্যবহার শুরু হল। এর ফলে রেডিও এবং অন্যান্য যন্ত্রের আকার ছোট হয়ে গেল। সুইচ অন করার সঙ্গে-সঙ্গেই যন্ত্রগুলো চালু হতে লাগল। আগে তা হত না। কম্পিউটারেও এই ট্রানজিস্টরের ব্যবহার বিপ্লব ঘটাল। সলিড স্টেট ইলেকট্রনিকসের ব্যবহার শুরু হল। এই সময়ে কম্পিউটারের কাজ বণ্টন হয়ে গেল তার বিভিন্ন অংশের মধ্যে। তথ্যগ্রহণ (ইনপুট) ও ফল প্রকাশ (আউটপুট) সহজ করা, কাজ করার ক্ষমতা বাড়ানো, কাজ করার দ্রুততা বাড়ানো, এইসব ছিল এই কর্মসূচির অঙ্গ। এই সময় টেলিপ্রসেসিং ব্যবস্থার সূচনা হল। ফলে কম্পিউটার রইল এক জায়গায়, কিন্তু দূরের কোনও জায়গা থেকেও টেলিফোন সংযোগের সাহায্যে প্রোগ্রাম পাঠানো শুরু হল।

### ১৯৬৫। তৃতীয় প্রজন্ম

ভ্যাকুয়াম টিউব আর ট্রানজিস্টরকে সরিয়ে দিয়ে এল এক নতুন ইলেকট্রনিক বর্তনী ব্যবস্থা। এল ছোট-ছোট সিলিকনের তৈরি টুকরো। সেটি অনেকরকম ইলেকট্রনিক কাজ করতে পারে। আরও পরে এল ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট বা I.C. ফলে কম্পিউটারের আকার

আগের চেয়ে ছোট হল, তাদের ক্ষমতা বাড়ল আরও। কম্পিউটারের কাজ করার গতি আরও বাড়ল।
তথ্যগ্রহণ আরও সহজ হল।
কম্পিউটারের ভাষাতেও এল এই সময় যুগান্তকারী পরিবর্তন। টিভি বাক্স আর সঙ্গে টাইপরাইটারের মতো কি-বোর্ড জোড়া ইনপুট করার যন্ত্রটি এই সময়েই আবিষ্কৃত হল। এরই নাম টার্মিনাল। কোনও সংযোগ-ব্যবস্থা ছাড়াই দূর থেকে কম্পিউটারকে নির্দেশ দেওয়া সম্ভব হতে লাগল রিমোটসেন্সিং ব্যবস্থার ফলে।

**১৯৭০। চতুর্থ প্রজন্ম**

যথারীতি কম্পিউটারগুলির ক্ষমতা এবং কাজ করার গতি বাড়ল। লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (LSI) এর ব্যবহারের জন্য কম্পিউটারের উন্নতির সঙ্গে আকারও ছোট হল। এই সময়েই প্রথম একটিমাত্র চিপ দিয়ে তৈরি মাইক্রোপ্রসেসর আবিষ্কৃত হল। খুব অল্প খরচ করে এদের তৈরি করা যায় বলে বহু যন্ত্রে (যেখানে অল্পকিছু নির্দেশ পালন করলেই চলে সেখানে) মাইক্রোপ্রসেসর ব্যবহার করা হচ্ছে।

**১৯৮৩। পঞ্চম প্রজন্ম**

বর্তনী আরও জটিল ও ঘন হল। মিড ও কনওয়ে নামে দুই কম্পিউটার বিজ্ঞানী ভেরি লার্জস্কেল ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট নিয়ে সম্পূর্ণ নতুন এক ধারণা দেন। তার ভিত্তিতেই তৈরি হল এই নতুন প্রজন্মের কম্পিউটারগুলি।
পাঁচ প্রজন্মের এই বিবর্তনের মডেল অনেকে স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, "আজকের সব কম্পিউটারই মূলত চতুর্থ প্রজন্মের। পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটার এখনও এসে পৌঁছয়নি। মানুষের মতো কিছু বুদ্ধিসম্পন্ন পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটার শিগগিরই আসবে।"

কম্পিউটারের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য এই সুইচ অফ ও অন করার ব্যাপারটিকেই কাজে লাগানো হয়েছে। সুইচ অফকে শূন্য আর সুইচ অনকে এক বলে ধরা হয়।
গোনার সুবিধের জন্য আমরা সংখ্যাপদ্ধতি আবিষ্কার করেছি। বহুপ্রচলিত ১, ২, ৩··· ১০, ২০··· ৩০··· ১০০—এই পদ্ধতিই একমাত্র গণনাপদ্ধতি নয়। এটি হল দশমিক পদ্ধতি (decimal system). অর্থাৎ, এককের ঘরের সংখ্যাকে ১ ($১০^{০}$), দশকের ঘরের সংখ্যাকে ১০ ($১০^{১}$) শতকের ঘরের সংখ্যাকে ১০০ ($১০^{২}$) দিয়ে গুণ করে তাদের যোগ করলে সংখ্যার মান বোঝা যায়।

৩২৪-এর অর্থ ৪×১ = ৪
২×১০ = ২০
৩×১০০ = ৩০০

অর্থাৎ ৪, ২০ ও ৩০০-এর যোগফল।
অন্য পদ্ধতিতে ১০-এর বদলে ২ বা ১৬কে মূল হিসেবে ধরে এবং ০ থেকে ৯ এই দশটি সংখ্যার বদলে ০ আর ১ এই দুটি সংখ্যা ব্যবহার করা হয়।

উলটোভাবে কোনও দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরিত করা যায় এইভাবে:
১। সংখ্যাটিকে দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে।
২। ভাগফলের পাশে আলাদা করে ভাগশেষটি লিখতে হবে। ভাগশেষ এক হলে এক, শূন্য হলে শূন্য।
৩। এর পরে পর পর ভাগফলগুলিকে দুই দিয়ে ভাগ করে যেতে হবে। এবং তাদের ভাগশেষগুলিকে পাশে লিখতে হবে। যখন ভাগফল শূন্যে পরিণত হবে তখন থামতে হবে। শেষ থেকে শুরু অবধি পর পর ভাগশেষগুলি পড়ে গেলেই বাইনারি পদ্ধতিতে সংখ্যার রূপটি বোঝা যাবে।

২ | ১৫
২ | ৭ — ১
২ | ৩ — ১
২ | ১ — ১
০ — ১
↑ সুতরাং ১৫-এর বাইনারি রূপ ১১১১

২ | ৩
২ | ১ — ১
০ — ১
↑ ৩-এর বাইনারি রূপ ১১

২ | ১২
২ | ৬ — ০
২ | ৩ — ০
২ | ১ — ১
০ — ১
↑ ১২-এর সংকেত ১১০০

২ | ১৬
২ | ৮ — ০
২ | ৪ — ০
২ | ২ — ০
২ | ১ — ০
০ — ১
↑ ১৬-এর সংকেত ১০০১০

| মূল সংখ্যা | | অযুত | সহস্র | শতক | দশক | একক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| দশমিক পদ্ধতি (Decimal system) | ১০ | $১০^{৪}$ = ১০০০০ | $১০^{৩}$ = ১০০০ | $১০^{২}$ = ১০০ | $১০^{১}$ = ১০ | $১০^{০}$ = ১ |
| ষড় দশমিক পদ্ধতি (Hexadecimal system) | ১৬ | $১৬^{৪}$ | $১৬^{৩}$ | $১৬^{২}$ = ২৫৬ | $১৬^{১}$ = ১৬ | $১৬^{০}$ = ১ |
| বাইনারি পদ্ধতি (Binary system) | ২ | $২^{৪}$ = ১৬ | $২^{৩}$ = ৮ | $২^{২}$ = ৪ | $২^{১}$ = ২ | $২^{০}$ = ১ |

## কম্পিউটারের নিজের ভাষা

কম্পিউটার একটি যন্ত্রমাত্র। তার নিজস্ব কোনও বুদ্ধি নেই। তাই মানুষের ভাষা বোঝার ক্ষমতা তার পক্ষে অসম্ভব। যন্ত্রটি সুইচ অফ বা সুইচ অন করলে বোঝে।

অর্থাৎ বাইনারি পদ্ধতিতে

১০১০-এর অর্থ ০×১ = ০
+ ১×২ = ২
+ ০×৪ = ০
+ ১×৮ = ৮
১০

**বাইনারি সংখ্যাগুলির যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ সরাসরি করা যায়।**

নিয়ম হল:

০+০ = ০
১+০ = ১
০+১ = ১
১+১ = ১০

১০১০০
+১০১১০ (২২)
১০১০১০ (৪২)

গুণের সময় স্বাভাবিক গুণের মতোই গুণ করতে হয়

১০১ (৫)
×১১০ (৬)
০০০
১০১
১০১
১১১১০ (৩০)

(ক্রমশ)

## এক বৎসর

২৬ সংখ্যার জন্য ১৮২ টাকার বদলে
এখন দিতে হবে মাত্র ১৫৫ টাকা

## দুই বৎসর

৫২ সংখ্যার জন্য ৩৬৪ টাকার বদলে
এখন দিতে হবে মাত্র ৩০০ টাকা

## বিদেশের গ্রাহক

বার্ষিক ২৬ সংখ্যার জন্য
৩৬ ডলার অথবা ২২ পাউন্ড

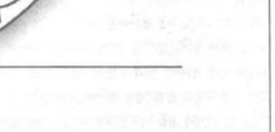


আপনি যদি গ্রাহক হতে চান তাহলে অনুগ্রহ করে আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা অবিলম্বে আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের অনুকূলে চেক অথবা ড্রাফট সহ নীচের ঠিকানায় পাঠান :

**সারকুলেশন ম্যানেজার (ইউ)**
আনন্দ বাজার পত্রিকা লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলিকাতা-৭০০ ০০১

কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রযোজ্য নয়

CLARION C-ABAMD-1

আকাশ চেনো

# ফাল্গুন মাসের আকাশ

নির্মেঘ, তারকাখচিত ফাল্গুন মাসের আকাশপটের কথা
লিখেছেন **অরূপরতন ভট্টাচার্য**

*২৪ ফাল্গুন রাত্রি সাড়ে দশটা, ১ চৈত্র রাত্রি দশটা এবং ৮ চৈত্র রাত্রি সাড়ে ন'টার আকাশপট—আমাদের অঞ্চলের আকাশসঙ্গী।*

*মিথুন রাশি : গ্রিক পুরাণের যমজ ভাই*

শীতের শেষে এখন বসন্তের বাতাস বওয়ার সময়। তবু শীতের মতোই নীলের চাঁদোয়া টাঙানো ফাল্গুনের আকাশ—নির্মেঘ, তারকাখচিত, সহজেই দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। ফলে এ-মাসেও আকাশপটে তারকামণ্ডলগুলিকে চিনতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। এখনকার রাত গভীর হওয়ার আগে মাঝআকাশের দিকে একবার চোখ তুলে তাকাও। অনেক উজ্জ্বল তারা নিয়ে মিথুন রাশিটি প্রায় মাথার উপরের আকাশে নজরে আসবে। মিথুন রাশিতে দুটি মানব-মূর্তি কল্পনা করা হয়—একটি পুরুষ, আর-একটি নারী। তারায়-তারায় অবশ্য চেহারা দুটি ঠিক তেমনভাবে মিলিয়ে নেওয়া যায় না। কিন্তু প্রায় সমান্তরাল দুটি রেখা পূর্ব থেকে পশ্চিমে সরে গেছে সমস্ত রাশিটির মধ্যে, লক্ষ করা যায়। এই দুটিতেই পুরুষ ও নারীর কল্পনা। পঞ্জিকায় প্রত্যেক মাসের গোড়ায় যে রাশিচক্রের ছবি থাকে তাতে তোমরা মিথুন রাশির ঘরে মূর্তি দুটিকে দেখতে পাবে।
মিথুন রাশির উত্তর-পূর্ব দিকে দুটি উজ্জ্বল তারা আছে। এই দুটি তারাকে মিথুন রাশির পুরুষ ও নারীর দুটি মাথা কল্পনা করা হয়। আর এদের দু'জনের শরীরের বাকি অংশ ক্রমে-ক্রমে নেমে এসেছে অনেকটা পশ্চিম দিকে। মিথুন রাশির দুটি মাথার মধ্যে যেটি বেশি উজ্জ্বল, সেটিকে বাংলায় বলা হয় প্রথম পুনর্বসু, অপেক্ষাকৃত কম উজ্জ্বলটি দ্বিতীয় পুনর্বসু, দুটি মিলে পুনর্বসুদ্বয়। বিদেশে অপেক্ষাকৃত পূর্বের বেশি উজ্জ্বল তারা প্রথম পুনর্বসু পোলাক্স আর দ্বিতীয় পুনর্বসু ক্যাসটর।
আকাশে প্রথম পুনর্বসু বেশি উজ্জ্বল হলে কী হবে, অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, কিন্তু তুলনায় ম্লান দ্বিতীয় পুনর্বসু। দেখতে এমন কিছু নয়, কিন্তু ওতে আছে অনেক তারকা। এর মধ্যে উজ্জ্বল দুটি তারকা একে অন্যকে ঘিরে মহাকাশে সমানে আবর্তন করে চলেছে, আবর্তনকাল প্রায় ৩৮০ বছর। তৃতীয় আর-একটি সঙ্গী আছে খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে। দ্বিতীয় পুনর্বসুর তিনটি তারার প্রত্যেকটাই আবার যুগ্ম তারা অর্থাৎ দু' মাথাওয়ালা ডাম্বেলের মতো—ঘোরালে ছেড়ে না গিয়ে একে অন্যের চারপাশে যেমন ঘুরতে থাকে, তেমনই। তা হলে দ্বিতীয় পুনর্বসুতে তারার সংখ্যা কত ? সবসুদ্ধ ছয়। ভাবা যায়, প্রথম পুনর্বসুর চেয়ে কম উজ্জ্বল দ্বিতীয় পুনর্বসুতে আছে ছ'টি তারকা।
প্রথম পুনর্বসু কমলা রঙের দৈত্যাকৃতি উজ্জ্বল তারকা এবং পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের দৈত্যাকৃতি তারকা এটি। আকাশে খালি চোখে দেখা প্রথম সারির উজ্জ্বল তারাদের মধ্যে এটি সপ্তদশ উজ্জ্বল তারকা। মহাকাশে প্রথম এবং দ্বিতীয় পুনর্বসু আমাদের কাছের প্রতিবেশী। জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক বিচারে প্রথম পুনর্বসুর দূরত্ব ৩৩ আলোকবর্ষের মতো। দ্বিতীয় পুনর্বসুর দূরত্ব আর-একটু বেশি। তা হবে ৪৫ আলোকবর্ষ।
মিশর দেশের পুরাণে পুনর্বসুদ্বয়কে দুটি মেষশাবক হিসেবে কল্পনা করা হয়। কিন্তু গ্রিক পুরাণে এরা ট্রয়ের হেলেনের দুই যমজ ভাই। শৌর্য-বীর্যের জন্য এরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।
পুনর্বসুদ্বয়কে নিয়ে আকাশে মিথুন রাশির কিন্তু অনেক কৃতিত্ব। জ্যোতির্বিজ্ঞানে গ্রহদের আবিষ্কারে মিথুন রাশির বিশেষ ভূমিকা আছে। এ-যুগে গ্রহকুলের যে তিন সঙ্গীর পরিচয় পাওয়া গেছে, সেই তিন সঙ্গী—ইউরেনাস, নেপচুন এবং প্লুটোর মধ্যে ইউরেনাস এবং প্লুটো মিথুন রাশি পার হওয়ার সময়েই জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের চোখে ধরা পড়ে। ইউরেনাসের আবিষ্কার ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে, আর প্লুটো নজরে এল তার প্রায় দেড়শো বছর পরে ১৯৩০-এ।
মিথুন রাশির দক্ষিণের অংশবিশেষ আছে ছায়াপথের উপরে। এই রাশির মাথার তারা দুটি যোগ করলে যে সরলরেখা পাওয়া যায়, ছায়াপথ এখানে আছে অনেকটা তারই সমান্তরালভাবে। আকাশে মিথুন রাশির পশ্চিমে আছে ছায়াপথ, পেট ফুলিয়ে সে চলে গিয়েছে উত্তর থেকে দক্ষিণের আকাশে। ছায়াপথেরও পশ্চিমে রাশিচক্রের দ্বিতীয় রাশি বৃষ অস্তোন্মুখ, চতুর্থ রাশি ম্রিয়মাণ কর্কট অল্প পরিসর নিয়ে মিথুনের সামান্য পূর্বে, মাঝে দ্বাদশ রাশির মধ্যে তৃতীয় রাশি মিথুন ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর।
মিথুন রাশিতে আছে ভারতীয় জ্যোতিষের একটি নক্ষত্র, চাঁদের এক স্ত্রী। এটি হল পুনর্বসু। চাঁদের ২৭ স্ত্রীর মধ্যে এটি সপ্তম। পুনর্বসু নক্ষত্রে পুনর্বসুদ্বয় তো আছে, তার সঙ্গে কোনও-কোনও জ্যোতির্বিজ্ঞানী মণ্ডলের অন্যান্য তারকাও যোগ করেছেন। পুনর্বসুর আগের নক্ষত্রটির নাম আর্দ্রা, সেটি ষষ্ঠ নক্ষত্র। তাকে আমরা দেখেছি কালপুরুষ মণ্ডলে।
পুনর্বসুদ্বয় থেকে শুরু করে একটু দক্ষিণ দিকে নেমে গেলে একটি ছোট মণ্ডল আমাদের নজরে আসবে। মণ্ডলটির নাম ক্যানিস মাইনর অর্থাৎ ছোট কুকুর। কালপুরুষ মণ্ডল থেকে এটি বেশি দূরে নেই। কিন্তু এর উজ্জ্বল তারাটি সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। তারকাটির নাম প্রসিয়ন। বালগঙ্গাধর তিলক এর নাম দিয়েছেন প্রশ্বন। কেন প্রশ্বন নাম তিনি দিলেন ? তা হলে ক্যানিস মাইনর মণ্ডলের আরও দক্ষিণে, সামান্য পশ্চিম ঘেঁষে আর-একটি মণ্ডলের কথা বলতে হয়। এটির নাম ক্যানিস মেজর ; অর্থাৎ বৃহৎ কুকুর হিসেবে এই মণ্ডলটির পরিচয়। মাইনর থাকলে মেজর থাকবে, ছোট থাকলে বড় থাকা উচিত—তাই-ই স্বাভাবিক।

*ক্যানিস মেজর : কুকুরের আকৃতি*

মিথুন রাশির বেশ কিছুটা দক্ষিণে মণ্ডলটির অবস্থান, আছে অংশত ছায়াপথের উপরে। এটির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য, এতে আছে খালি চোখে দেখা মণ্ডলের উজ্জ্বলতম তারকা। ফলে দক্ষিণের আকাশে অনেক তারকামণ্ডলের ভিড়ের মধ্যেও মণ্ডলটিকে চিনতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। উজ্জ্বলতম তারকা অবলম্বনে মণ্ডলটিকে বোঝা যায় সহজে। এই তারা আমাদের কাছের তারাগুলির মধ্যেও একটি, দূরত্ব ৯ আলোকবর্ষ। মণ্ডলে এই তারাটি ছাড়াও আর যেসব তারা আছে, সেসবই যে তুলনায় একেবারেই ম্রিয়মাণ, তা মোটেই নয়। ফলে মণ্ডলটির ঔজ্জ্বল্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

সম্পূর্ণ উপন্যাস

# রহস্যের আলোছায়া

আনন্দ বাগচী

রুটিতে মাখন মাখাতে মাখাতে সুনন্দ ঠাট্টা করে কী একটা কথা বলেছিল, অমিয় শুনতে পায়নি। হলিডে হোমের খোলা জানলায় দাঁড়িয়ে সে তখন বাইরের দৃশ্যে মশগুল। কবিমানুষ, তার ওপর এই প্রথম কলকাতার বাইরে এমন এক মনোরম জায়গায় বেড়াতে এসেছে। স্কুলের পরীক্ষা, অভিভাবকের শাসন, হাতিবাগান-শ্যামবাজারের হট্টগোল ছাড়িয়ে এমন নির্জনতা আর নদীপ্রান্তর বনভূমি তাকে কেমন উদাস আর বেহুঁশ করে দিয়েছে। একটা গানের লাইন নিচু গলায় গুনগুন করতে করতে সে হঠাৎ থেমে গেল।

দেখল লোকটা ঝাউবনের কিনারে বালির মধ্যে চিতপাত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে। যেন ঘুমোচ্ছে। কিন্তু খোলা আকাশের নীচে ওরকম জায়গায় এরকম সময়ে কেউ কি ঘুমোতে পারে ? ট্রাউজার্স, শার্ট, দামি জুতো দেখেই বোঝা যায় লোকটা সচ্ছল অর্থবান মানুষ, রাস্তায় পড়ে থাকার মতো নয়। ভোর সকালের রোদ্দুর এসে পড়েছে মুখের ওপর, গায়ে গাছের ডোরাকাটা ছায়া। চোখে আলো পড়েছে তবু ঘুম ভাঙছে না কেন ? কব্জির কাছে, হাতের আঙুলে আলো ঠিকরোচ্ছে। বোধ হয় ঘড়ির সোনালি ব্যান্ড আর আংটি।

দৃশ্যটা দেখে একটু মজাই লাগছিল অমিয়র। কলকাতায় এরকম দৃশ্য মাঝেমধ্যেই দেখা যায়। ফুটপাথের ওপর অনেক ভদ্রচেহারার মানুষও গড়াগড়ি খায়। এরকমই চিতপাত হয়ে কিংবা মুখ গুঁজে পড়ে থাকে রাস্তা জুড়ে। প্রথম প্রথম বুকের ভেতর ছ্যাঁত করে

উঠত। মনে হত খুনটুন নয়তো! অথবা আচমকা মারা গেছে। হার্ট কিংবা সেরিব্রাল অ্যাটাকে, লোক তো হামেশাই মরছে। কয়েক সেকেন্ড বা কয়েক মিনিটের মামলা। কিন্তু না। একটু পরেই পাশ কাটিয়ে কিংবা ডিঙিয়ে যাওয়া ব্যস্ত পথচারীর মুচকি হাসি আর মন্তব্য থেকে বোঝা গেছে ব্যাপারটা অন্য। আশঙ্কাজনক কিছু না। আজকাল নেশা করে মানুষ বেহুঁশ পড়ে থাকে এখানে-সেখানে। অমিয়র কেমন মনে হল এই ঘটনাটাও তাই। খুন নয়, নিছক ঘুমের ব্যাপারও নয়।

সুনন্দ চা ছাঁকতে ছাঁকতে হাঁকল, "অ্যাই অমিয়, হচ্ছেটা কী! অ্যাঁ? ব্রেকফাস্টটা কি বাইরেই সারবি?"

কথাটা এবার কানে ঢুকল অমিয়র। জানলা থেকে ফিরে আসতে আসতে উত্তর দিল, "ওঃ, চা রেডি হয়ে গেছে?" তারপর কী ভেবে হেসে ফেলে বলল, "ক'কাপ বানিয়েছিস? আর-এক কাপ হয় না?"

সুনন্দ মনোযোগী চোখে তাকায়, "কেন? কী হবে?"

জানলার দিকে আঙুল দেখিয়ে অমিয় হাল্‌কা গলায় বলে, "বাইরে এক ভদ্রলোক রয়েছেন, বেড-টি না পেলে বোধ হয় মশাইয়ের ঘুম ভাঙবে না!"

"ঘুম!" সুনন্দ যেন চমকে উঠল, "কই?" বলেই চায়ের ছাঁকনিটা ঠকাস করে টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে জানলার দিকে ছুটল। অমিয় হি-হি করে মজার হাসি হাসতে হাসতে চায়ের কাপ তুলে নিয়ে চুমুক দিল, "দেখলি?"

সুনন্দর তরফ থেকে কোনও জবাব এল না। অমিয় একটু অবাক হল। মাখন-রুটিতে ছোট করে একটা কামড় বসিয়ে সুনন্দর দিকে তাকাল, ভ্রূ কুঁচকে চোখ ছোট করে ও বোধ হয় লোকটাকেই দেখছে। দেখছে তো দেখছেই।

"কী ভাবছিস?" অমিয় কৌতুকের গলায় বলে, "বেড-টি সার্ভ করতে হবে তাই না?"

সুনন্দ ফিরে তাকাল, ওর মুখে কোনও হাসি ফুটল না। বলল, "তোর বেড-টি বোধ হয় আর কোনও কাজ করবে না। চল একবার দেখে আসি এক্ষুনি?"

কথায় আর গলার স্বরে চমকে গেল অমিয়। সিরিয়াস কিছু ঘটেছে নিশ্চয়। অমিয় বিহ্বল গলায় বলল, "তবে কী?"

"হ্যাঁ লোকটা বোধ হয় বেঁচে নেই।"

"কী করে বুঝলি?"

"অনুমানে। ভাল করে নজর করলেই দেখতে পেতিস। কয়েকটা শকুন নীচে নেমে এসে চক্কর দিচ্ছে। ওদের নজর দূরবিনকেও হার মানায়। চোখ দিয়েই ওরা মৃত্যুর গন্ধ পায়। তা ছাড়া হাতের আঙুলগুলো যেভাবে আধমুঠো হয়ে ছড়িয়ে আছে, আমার মোটেই ভাল ঠেকছে না। বুকের ওপর একটা গাছের ছায়া পড়েছে, তাই দেখতে পাসনি, কিছু একটা ওখানে বিঁধে আছে।"

অমিয় চায়ের কাপ ফেলে এক লাফে জানলায় গিয়ে দাঁড়াল। তারপর বুকের ভেতর একটা লম্বা নিশ্বাস টেনে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকল। ওর কাঁধে হাত রেখে সুনন্দ বলল, "চল, কুইক!"

যা অনুমান হয়েছিল তাই। মানুষটি বেঁচে নেই, শুধু তাই না, রক্তশূন্য ফ্যাকাসে মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় মৃত্যু ঘটে গেছে বেশ কয়েক ঘণ্টা আগে। শক্ত কাঠ হয়ে গেছে শরীর। জিয়লগাছের আঠার মতো থলথলে কালচে রক্ত জমে আছে বুকপকেটের কাছে। আর তার ঠিক মাঝখানে কাঠপেন্সিলের মতো দশ-এগারো ইঞ্চি লম্বা একটা কাঠি খাড়া বিঁধে আছে।

ধুসর রঙের প্যান্ট, সাদা ফিনফিনে টেরিলিনের হাফশার্ট, জুতোর পালিশ, হাতে দামি পাথরের আংটি এবং ঘড়ি সঙ্গতির ছাপ রেখেছে গায়ে। বয়স বোধ হয় পঞ্চাশের ধারে-কাছে, দেহের সবল কাঠামোটি ছ'ফুটের কাছাকাছি লম্বা হবে নিশ্চিত।

অমিয়র গলায় রীতিমত আতঙ্ক ফুটল। "খুন ! এ যে সত্যিকারের খুন রে সুনন্দ !" বলেই ভয়ে-ভয়ে ঝাউবনের দিকে তাকাল। সুনন্দ জবাব দিল না। সে তীক্ষ্ণ চোখে মৃতদেহের চারপাশের মাটিতে কিছু যেন খুঁজছিল। অমিয় অস্থির ভয় পাওয়া গলায় ফের বলল, "চল পালাই। এখানে আর এক মুহূর্ত থাকা ঠিক হবে না। শেষে কোনও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে হবে কিন্তু।"

"হবে তো হবে !" সুনন্দ বিরক্তমুখে ওর দিকে ফিরে তাকাল, "ভিতুর ডিম ! তুই না কাল বড় গলা করে বলছিলি, অ্যাডভেঞ্চার তুই খুব ভালবাসিস ?"

অমিয়র আত্মসম্মানে ঘা লাগল। ব্যাজার মুখে সে বলল, "আমি কি ভয় পেয়ে কথাটা বলেছি ? ফর নাথিং উটকো ঝামেলায় জড়িয়ে, খুনের দায়ে ফেঁসে গেলে তখন বুঝবি। তা ছাড়া আমরা কি মুদ্দোফরাশ না পুলিশ যে অজানা-অচেনা একটা মানুষের ডেডবডি আগলে বসে থাকতে হবে !"

"ঠিক তাই, এটাই আমার পয়েন্ট। অচেনা একটা লোক সকলের চোখের আড়ালে বেঘোরে মরে পড়ে থাকবে আর আমরা বিপদের ভয়ে পালিয়ে যাব ? বিবেক বলেও তো একটা কথা আছে। ফলিডলের কৃপায় এখানে শেয়াল নেই তাই রক্ষে, নইলে রাত্তিতেই আধখানা বডি সাবাড় হয়ে যেত। শেয়াল নেই কিন্তু শকুন আছে, আমরা চলে গেলেই তারা এসে ছিঁড়ে খাবে।"

"তা হলে এখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আমরা শকুন তাড়াব ? নতুন জায়গায় বেড়াতে এসে আচ্ছা চাকরিই জুটে গেল যা হোক।"

সুনন্দ হেসে ফেলে বলল, "তা কেন ! লোকটা কেন খুন হল, কীভাবে খুন হল, সেটা জানতে হবে না ?"

"এমনভাবে কথা বলছিল যেন তুই গোয়েন্দা। এই কেসের তদন্তের ভার তোর ওপরে পড়েছে। সত্যি সুনন্দ গল্পের বই পড়ে-পড়ে তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।"

সুনন্দ মনে-মনে হাসল। অমিয়র দোষ নেই, সে তার জীবনের অনেক ঘটনাই জানে না। সুনন্দর বাবা উত্তর কলকাতায় বাড়ি কিনে উঠে আসার পর অমিয়র সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে। আলাপ বন্ধুত্বে গড়িয়েছে। অমিয় ভাল ছেলে। যাকে বলে পড়ার বইয়ের পোকা। শরীর রক্ষার জন্য ইদানীং খেলার মাঠে আসে। নইলে একদিন তার জগৎ ছিল ইস্কুল, বাড়ি আর কোচিং। খবরের কাগজটাও খুঁটিয়ে দ্যাখে, এমন মনে হয় না।

এই অমিয়র সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় কোচিং ক্লাসে, তারপর খেলার মাঠে। দুজনেরই দুজনকে খুব ভাল লেগেছিল। মনে হয়েছিল যেন কতদিনের চেনা। বন্ধুত্বটা শেষ পর্যন্ত পরস্পরের বাড়ি অবধি গড়ালেও সুনন্দ আগ বাড়িয়ে নিজের কথা কোনওদিন বলেনি। তাই অমিয় একথা বলতে পারল।

সুনন্দ বলল, "না রে, ভাই, আমি পাগলও না, গোয়েন্দাও না। কিন্তু যারা রহস্য উদ্ঘাটন করে তাদের আমি শ্রদ্ধা করি। তাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, বিশ্লেষণের ক্ষমতা আর সূক্ষ্ম-দৃষ্টি আমাকে খুব টানে। মগজ খাটিয়ে জটিল অঙ্কের নির্ভুল উত্তর কষে বের করার সঙ্গে তদন্তের কোনও ফারাক দেখতে পাই না। দুটো ব্যাপারের পিছনেই আছে বিজ্ঞানসম্মত ফর্মুলা।"

সামনে সত্যিকারের ডেডবডি পড়ে আছে, রোদ উঠলেও

চারপাশটা কেমন ছমছমে নির্জন, জনমানবের চিহ্ন নেই। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে সুনন্দর বক্তৃতা শুনতে অমিয়র ভাল লাগছিল না। সে শুকনো গলায় বলল, "ওসব কথা থাক। তুই এখন কী করতে চাস তাই বল !"

"পুলিশ আসবার আগে আমি সব কিছু একটু খুঁটিয়ে দেখতে চাই। তোর ভাল লাগছে না জানি, তুই বরং এক কাজ কর, হলিডে হোমে ফিরে গিয়ে কেয়ারটেকারকে দিয়ে থানায় একটা খবর পাঠা। খুন হয়েছে বলবি না, বলবি একটা লোক রাস্তার ওপর মরে পড়ে আছে।"

এককথায় ছুটি আর কাজের দায়িত্ব পেয়ে গিয়ে অমিয়র মনের অস্বস্তি আর দমবন্ধ ভাবটা যেন একমুহূর্তে কেটে গেল। সেই সঙ্গে একটু লজ্জাও পেল। তারই বয়সী একটা ছেলে কেমন বেপরোয়া, শক্ত, সাহসী। ঠাণ্ডা মাথায় বড়দের মতো কথা বলছে, আর সে ? সুনন্দকে তার এমনিতেই ভাল লাগে, এখন তো রীতিমত গল্পের বইয়ের নায়কের মতো লাগছে। যেন রহস্যভেদী কোনও শখের গোয়েন্দা। অমিয়র অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে আপনমনেই কথা বলতে শুরু করল সুনন্দ।

"এ-রাস্তায় ইলেকট্রিকের আলো নেই। কাল অমাবস্যার রাত গেছে। চাঁদের আলোও ছিল না। আশ্চর্য ব্যাপার !"

"এতে আশ্চর্যের কী আছে ?" অমিয় প্রশ্ন না করে পারল না।

"আশ্চর্য না ?" তেমন একটা ঘোরের মধ্যে থেকে সুনন্দ যেন উত্তর দিল, "এই সকালেও যেখানে জনমনিষ্যির দেখা নেই, সেখানে এই নির্জন রাস্তা দিয়ে লোকটা কেন আসছিল। আর যাচ্ছিলই বা কোথায় ? হাতে একটা টর্চ পর্যন্ত ছিল না। সে কি একা-একা যাচ্ছিল, না সঙ্গে অন্য কেউ ছিল ?"

অমিয় চারপাশে তাকিয়ে নিয়ে বলল, "কাছাকাছির মধ্যে তো কোনও বাড়ি দেখছি না, আমাদের ওই হলিডে হোমের বাড়িটা ছাড়া। রাস্তাটা এসেছে ঝাউবনের ভেতর দিয়ে শর্টকাট করে। ঝাউবনের ওপারে শহরের বাকি আধখানা বসতি আছে বলে শুনেছি। ওদিকটাই নাকি বেশি জমজমাট।"

"হুঁ।" সুনন্দ বলল, "সাদাটে বালির রাস্তা। তারার আলোর আভায় পথটা মোটামুটি দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। লোকটার ভয়ডর ছিল না, মনে হয় সে একাই আসছিল। খুব স্পষ্ট না হলেও একজোড়া জুতোর ছাপই লক্ষ করলে চোখে পড়ে। জুতোর কাঁটা-কাঁটা কুমিরের পিঠের মতো সোলের দাঁতগুলো নরম বালি মাটিতে ফুটো-ফুটো ছাপ ফেলে এসেছে। এদিক-ওদিক না তাকিয়ে লোকটা স্ট্রেট হেঁটে আসছিল, কিন্তু সে জানত না মৃত্যু তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। হঠাৎ একটা তীর তার হৃৎপিণ্ডে গেঁথে গেল, আর সঙ্গে-সঙ্গেই... "

"তীর" ? অমিয় সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করে, "ধনুকের তীর ? কী করে বুঝলি ?"

"ভাল করে দ্যাখ, তা হলেই বুঝবি। কেন, তুই কি ভাবছিস বুকে একটা সাধারণ কাঠি বিঁধে আছে ?"

উত্তেজনায় খুঁটিনাটির দিকে অমিয়র এতক্ষণ চোখ পড়েনি,

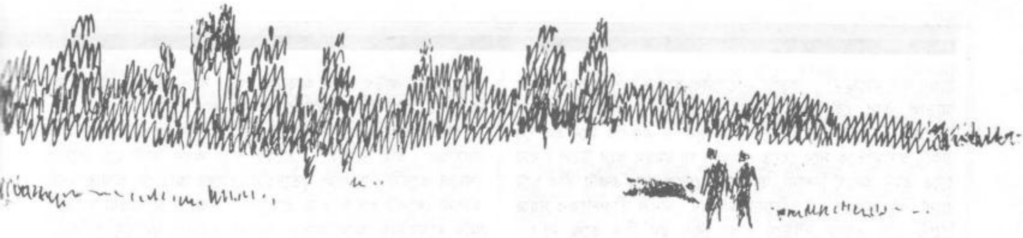

এখন পড়ল। লোকটার চোখ আধখোলা, ভুরু যেন তেরচাভাবে সামান্য কুঁচকে আছে। হয়তো তীব্র যন্ত্রণার কিছুটা ছাপ রয়ে গেছে। বাটনহোলে একটা আধ-শুকনো গোলাপের কুঁড়ি। মাথাটা একপাশে সামান্য হেলে আছে, কষের কাছটায় সামান্য কালচে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। কাঠির গোড়ার দিকে তাকিয়েই বুঝল সুনন্দ ঠিকই বলেছে। দু' পাশে ইঞ্চি-দুয়েক জুড়ে ছাঁটা পালকের সারি, মাকড়সার ঝুলের মতো কিছু জড়িয়ে আছে তার গায়ে।

অমিয় বলল, "তীর-ধনুক, তার মানে এর পেছনে কোনও বুনো মানুষদের হাত আছে।"

সুনন্দ মাথা নেড়ে বলল, "মনে হয় না। তীর মারবার পর কেউ সম্ভবত কাছেই আসেনি। ভদ্রলোকের ঘড়ি, আংটি, এমনকী প্যান্টের পকেটে মোটাসোটা একটা মানিব্যাগও দেখা যাচ্ছে। যে মেরেছে সে শুধু একে মারতেই চেয়েছিল। সুতরাং হত্যার উদ্দেশ্য অন্য।"

যুক্তিটা অমিয়র মনে ধরায় ঘাড় নাড়ল।

সুনন্দ বলল, "মরা মানুষ কথা বলে না বটে কিন্তু তার পোশাক-আশাক, এমনকী চারপাশের জড় পদার্থ কিছু চুপ করে থাকে না।" বলতে বলতেই সুনন্দ ভদ্রলোকের মাথার কাছে উবু হয়ে বসল। কী দেখছে অমিয় বুঝতে পারল না, তবে কিছু একটা যে তার হঠাৎ চোখে পড়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

"অমিয়, তোর কাছে এক টুকরো সাদা কাগজ হবে?"

পকেট হাতড়ে অমিয় বলল, "সরি ভাই, ট্রেনের টিকিট দুটো ছাড়া আমার পকেটে কিছু নেই, কলমটাও সঙ্গে আনা হয়নি। তুই যা তাড়াহুড়ো করলি!"

"অতি উত্তম! একখানা টিকিটই দে।"

বোকার মতো সুনন্দর দিকে তাকিয়ে অমিয় একটা টিকিট ওর হাতে গুঁজে দিল। সুনন্দ ততক্ষণে নিজের পকেট থেকে একখানা সাদা রুমাল বের করে ভদ্রলোকের বুকের কাছটায় সাবধানে বিছিয়ে দিয়েছে।

"বুক পকেটে এগুলো কী রে অমিয়?"

প্রায় স্বচ্ছ পকেটের মধ্যে কড়াইয়ের ডালের সাইজের কালচে রঙের কয়েকটা দানা দেখা যাচ্ছিল। টিকিটটি দিয়ে আলগোছে সেগুলো রুমালের ওপর টেনে আনল সুনন্দ। কালি কিংবা সুপুরির কুচি হবে, অমিয় ভেবে না পেয়ে কোনও উত্তর দিল না।

সুনন্দ বলল, "ও হরি, মরা পোকা কয়েকটি! পকেটের ভেতরে বোধ হয় কোনও ভাবে ঢুকে পড়েছিল, পরে আর বেরোতে পারেনি। থাক, পরে দেখব।" পোকাসুদ্ধু রুমালটা পকেটে রেখে দিয়ে সুনন্দ উঠে দাঁড়াল। তারপর ফের বলল, "তুই হয়তো মনে মনে হাসছিস কিন্তু ধুলোবালি কিংবা ছাইটুকুও অনেক সময় ফেলনা নয়। যেখানে দেখিবে ছাই পড়িসনি? আসলে কী জানিস, মৃতের পকেটই বেশি কথা বলে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এঁর ট্রাউজার্সের পকেট হাতড়ানো আমাদের উচিত হবে না। পুলিশের চোখে কাজটা বেআইনি হবে। নইলে হয়তো ভদ্রলোকের নামধাম এক্ষুনি জানতে পারা যেত।"

অমিয় বাধা দিয়ে বলল, "না, না। অমন কাজও করিস না। পুলিশের ডিউটি পুলিশ এসে করুক। আমাদের কী। আমরা সাতেও নেই পাঁচেও নেই।"

পুলিশের কথায় সুনন্দর খেয়াল হল। চমকে উঠে বলল, "এ কী! তুই এখনও যাসনি?"

অমিয় ব্যাজার মুখে বলল, "যাঃ বাবা! তুই যেন আকাশ থেকে পড়লি। আমি যাবার সময় পেলাম কোথায়। তুই তো তখন থেকে একটানা বকবক করে চলেছিস।"

"ঠিক আছে এবার যা। আমি এখানে পাহারায় থাকছি। একটাও বাড়তি কথা বলবি না কাউকে। পুলিশ কিন্তু সাঙ্ঘাতিক জিনিস!"

অমিয় চলে যাবার পর সুনন্দ ঠাণ্ডা মাথায় আগাগোড়া ব্যাপারটা ভাবছিল। তীর যে ছুঁড়েছে সে নিশ্চয় জানত লোকটা এই পথেই আসবে। আসবে জেনেই আগে থেকে অপেক্ষা করে ছিল কোথাও। কোথায় সে অপেক্ষা করছিল, মানে কোথা থেকে সে তীর ছুঁড়েছে সেটা আন্দাজ করা দরকার। কিন্তু ঝাউবনের ভেতরেই তো কাজটা হাসিল করা স্বাভাবিক ছিল, সহজও ছিল। গাছের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকা সহজ হত। কিন্তু বন থেকে বেরিয়ে ফাঁকা রাস্তায় আসার পরেই আততায়ী তার হাতের তীর ছুঁড়েছে। ঝাউবনের সাদা সিঁথির মতো রাস্তাটা যতদূর চোখ যায় ইঞ্চি-ইঞ্চি করে খুঁটিয়ে দেখল। দু'পাশের গাছের সারিও ভাল করে নজর করল। না! লোকটি বোধ হয় দ্বিতীয়বার তীর ছোঁড়েনি, প্রথমবারেই নির্ভুল নিশানায় লক্ষ্যভেদ করেছে। নইলে পথের ওপর কিংবা গাছের গায়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া তীর বিঁধে থাকত।

এবার পিছন ফিরে তাকাল। যেদিক থেকে তীরটা এসেছে। রাস্তাটা সোজা খানিকটা গিয়ে হঠাৎ বাঁক নিয়ে স্টেশনের দিকে চলে গেছে। বাঁকের মুখে একটা নিচু টিলা। টিলার গায়ে একটা পোড়ো চালাঘর। কতদিনের পুরনো কে জানে। ভাঙাচোরা বেড়ার গায়ে বুনো কুলের ঝোপ। চালের বোধ হয় আধখানাই নেই। সুনন্দ যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকে গজ দশেক হবে বড়জোর সরল রেখা টানলে।

চালাঘরটার দিকে চিন্তিত মুখে সুনন্দ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে তাকিয়ে থাকল। তার কেমন মনে হল শত্রুর অপেক্ষা করে থাকার পক্ষে এইটেই সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা। হয়তো ওইখান থেকেই তীরটা ছোঁড়া হয়েছিল। কথাটা মনে হতেই একটা চাপা উত্তেজনা আর অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে। কে জানে হয়তো হত্যাকারী এখন এই মুহূর্তে ওখান থেকে তার ওপরে নজর রেখেছে। আশ্চর্যের কিছুই নয়। বইপড়া জ্ঞান থেকে সে জানে, হত্যাকারী অন্তত আর-একবার ফিরে আসে তার অপরাধের জায়গায়। হয়তো এসেও ছিল তার শিকারকে শেষবারের মতো দেখতে। কিন্তু এই ভোর-সকালে দুটি ছেলে এখানে এসে হানা দেবে, সে ভাবতেও পারেনি। তাদের দেখে অগত্যা চালাঘরের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে ব্যাপারখানা কী বোঝার চেষ্টা করছে। সন্দিগ্ধ সতর্ক চোখে সুনন্দ আর-একবার চালাঘরের দিকে তাকাল। এখান থেকে ভেতরটা ঠিক

ঠাওর করা যাচ্ছে না। বেড়াটা ভাঙাচোরা হলেও কুলঝোপ অনেকটা আড়াল করে রেখেছে। রোদ্দুর-ছায়ায় মিশে ভেতরটা কেমন রহস্যময়। হয়তো চোখের ভুল, তবু সুনন্দর একবার মনে হল সে একটা ছায়ামূর্তিকে সরে যেতে দেখল। গা ছমছম করে উঠল। যার হাতে এমন অব্যর্থ নিশানা, তার হাত থেকে আর-একটা তীর ছুটে আসা কিছু অসম্ভব নয়। দিনের আলোয় কোনও তীরন্দাজের সহজ টার্গেট হয়ে এখানে দাঁড়িয়ে থাকা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না।

সুনন্দ আকাশের দিকে তাকাল। শকুনির দল পাক খেতে-খেতে অনেকটা উঁচুতে উঠে গেছে। পুলিশ আসতে এখনও দেরি আছে, থানাটা ঠিক কোথায় তার জানা নেই। সুনন্দ আচমকাই পিছন ফিরে দৌড় লাগাল ঝাউবনের দিকে। অবশ্য বেশি দূরে গেল না, রাস্তা পার হয়ে প্রথম ঝাউগাছটার আড়ালে গিয়ে বসে পড়ল। যাতে মুখ বাড়ালেই ডেডবডিটা দেখতে পাওয়া যায়।

গাছের ছায়ায় আর সকালের ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেশ আমেজ এসে গিয়েছিল। হাই উঠছিল। চোখের পাতা কখন ভারী হয়ে এসেছে খেয়াল করেনি। আসলে মৃতদেহটা চোখের আড়ালে থাকায় মনটা আপনা থেকেই হালকা হয়ে এসেছিল। সকালে চা খাওয়া অভ্যেস, আজ মুখের চাও ফেলে এসেছে, হয়তো সেজন্যও ঘুম-ঘুম পাচ্ছিল। কতটা সময় কেটে গেছে খেয়াল ছিল না। হঠাৎ কিছু দূরে জিপগাড়ির আওয়াজ শোনা যেতেই সংবিৎ ফিরে পেল। মনে পড়ে গেল অমিয় পুলিশে খবর দিতে গিয়েছিল।

মৃতদেহ থেকে গজ-পাঁচেক দূরে থাকতেই ব্রেক কষে জিপটা

ইলেকট্রনিকস গেম

# পেরেক তুলে সার্কিট ব্রেক

ডিং কু-টিংকু, লবু-কুশু, বাপ্পা-বুবাই, হাসবানু-মৌ সবাই মিলে এই মজার ইলেকট্রনিক গেম জমিয়েছিল দারুণ। একটা বোর্ডের উপর ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেই রকম পেরেক দুটো ধাতুর তৈরি চোঙের মতো দেখতে কোণ-এর(Cones) মাঝখানে স্তূপাকার করে রাখা ছিল। এই খেলায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক খেলোয়াড় এসে খুব সাবধানে একটা পেরেক তুলে নেবে, যাতে দুটো Cone-এর মাঝখানের সার্কিট ব্রেক করে না যায়। খেলার শুরুতে অবশ্য ব্যাপারটা তত শক্ত নয়। কিন্তু যতই খেলা এগিয়ে যাবে অর্থাৎ একজন একজন করে এসে পেরেক তুলে নেবে ততই সার্কিট ব্রেক করার সম্ভাবনাও ক্রমশ বাড়বে। সব শেষে একজন খেলোয়াড় এসে সার্কিট ব্রেক করে দেবে। আর কী আশ্চর্য, তক্ষুনি একটা সতর্কতামূলক আলো জ্বলে উঠবে। দুটো অথবা তিনটে দল নিয়েও এই ইলেকট্রনিক গেম খেলা যায়। যে দলের খেলোয়াড় সার্কিট ব্রেক করবে তারা হেরে যাবে। এটা ভারী সুন্দর খেলা, তাই না?

## ট্রিগারড SCR

চিত্র 1. 2-এর ডায়াগ্রাম থেকে দেখা যাচ্ছে যে সিলিকন কন্ট্রোলড রেকটিফায়ার (SCR)-এর সতর্কতা আলো রয়েছে অ্যানোড সার্কিটে এবং R1 অ্যানোড থেকে Gate-এ; গেট G থেকে ক্যাথোড K-এর সার্কিট সম্পূর্ণ হচ্ছে ধাতুর তৈরি Cones এবং তার মাঝখানের বস্তুগুলির (পেরেক) মাধ্যমে। যতক্ষণ ক্যাথোড থেকে অ্যানোডের পথ পরিবাহী থাকবে ততক্ষণ গেট পোটেনসিয়াল হবে শূন্য। এই পথে জরুরি বাধা আসবে, R1 গেটে কারেন্ট দেবে এবং SCR অন অবস্থার দিকে এগোতে থাকবে। ব্যাটারি থেকে কারেন্ট তখন SCR ও ল্যাম্পের মধ্য দিয়ে যাবে এবং সন্দেহ নেই SCR পরিবাহী থাকবে দুটি Cones-এর ভিতর সার্কিট সংযোগ ঘটলেও। কাজেই খেলার একেবারে শেষ অবস্থায় খুব পাকা হাত চাই, অতি সাবধানে পেরেক সরিয়ে নেওয়ার জন্য।

খেলা একবার শেষ হওয়ার পর পুনরায় শুরু করতে হলে পেরেকগুলো দুটো Cones-এর মাঝখানে রাখা দরকার এবং সুইচ S1 মুহূর্তের জন্য খুলতে হবে যাতে SCR পরিবাহী হতে না পারে।

SCR ঠিকমতো হওয়া চাই, এমনকী R1-এর মানও পছন্দ করে নিতে হবে, সেইসঙ্গে চাই ল্যাম্প ও ব্যাটারির উপযুক্ত ভোল্টেজ। দেখা গেছে 6v 0.1A বাল্ব এবং চারটে 1.5v Cell-এর কারেন্ট ব্যবহার করাই সুবিধাজনক।

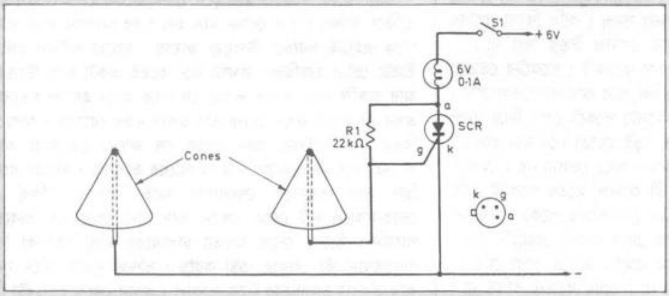


*চিত্র 1. 2 : যখন cones দুটির মধ্যে কোনও সার্কিট থাকবে না, তখন SCR উদ্দীপিত হবে*

## ইনসুলেটেড বোর্ড

এই বোর্ড পাতলা প্লাইউড অথবা শক্ত পিচবোর্ডের তৈরি, প্রায় 200 × 150 মিমি। 1.3 চিত্রে বোর্ডের নীচের অংশ দেখানো হয়েছে। স্লাইড সুইচের জন্য (s1) একটা গর্ত করতে হবে, এটা ধরে রাখবে দুটো খুব ছোট নাট-বোল্ট। সুইচের কাছেই একটা ল্যাম্প হোল্ডার লাগবে, বোর্ডের পিছনে। ব্যাটারি-হোল্ডার তৈরি করবে ফেলে দেওয়া টিন অথবা পাতলা লোহার পাত দিয়ে। এই ব্যাটারি-হোল্ডার চারটে 1.5v ব্যাটারিকে ধরে রাখবে। ইনসুলেটেড বোর্ডকে প্রায় 26 মিমি উঁচুতে টাঙাতে হবে। প্রয়োজন মনে করলে 26 × 10 মিমি কাঠের টুকরো এই

দাঁড়িয়ে গেল।

ইঞ্জিন বন্ধ করে স্টিয়ারিং হুইলের পেছন থেকে নেমে এলেন দীর্ঘ সুঠাম চেহারার এক সুদর্শন তরুণ। বয়স তিরিশের কাছাকাছি। লখনৌয়ের কাজকরা পাঞ্জাবি আর আলিগড়ি পা-চাপা পাজামা পরনে। ইনি যে থানার চার্জে আছেন বলে না দিলে চেনবার কোনও উপায় ছিল না। তাঁর পাশের সিটে চাপাচাপি করে বসে ছিল দু'জন, কেয়ারটেকার রাধু চৌধুরী আর অমিয়। ওরাই পথ দেখিয়ে এনেছে। গাড়ির পিছন দিক দিয়ে নামল দু'জন আর্মড পুলিশ, রাইফেল হাতে নিয়ে। আরও দু'জন নেমে এল তাদের পরে-পরে। দু'জনেরই হাতে ব্যাগ। ব্যাগের চেহারা দেখেই বোঝা যায় ওদের একজন ডাক্তার, অন্যজন ফোটোগ্রাফার।

গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমেই রাধু চৌধুরী ছুটে যাচ্ছিলেন ডেডবডির দিকে, ও সি হাত ধরে থামালেন। বললেন, "ওভাবে না, ধীরে-সুস্থে আসুন। পায়ের ছাপটাপ থাকতে পারে, মাড়াবেন না। সাবধানে!"

কিন্তু চৌধুরীমশাই আর পা বাড়ালেন না, কাছে যাবার বোধ হয় দরকারও ছিল না তাঁর। যা দেখবার জিপে বসেই দেখতে পেয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর নতুন বোর্ডার ডক্টর চিন্ময় মুস্তাফিই যে ওখানে ওভাবে পড়ে আছেন তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। চেহারাটি বিলক্ষণ চেনা। গত দু'বছরের মধ্যে ভদ্রলোক বার তিনেক এসেছেন এ-অঞ্চলে। আর প্রতিবারই হোটেলে না উঠে তাঁরই অতিথি হয়েছেন। বড় ভালমানুষ আর খেয়ালি মেজাজের ছিলেন

পার্থসারথি চক্রবর্তী

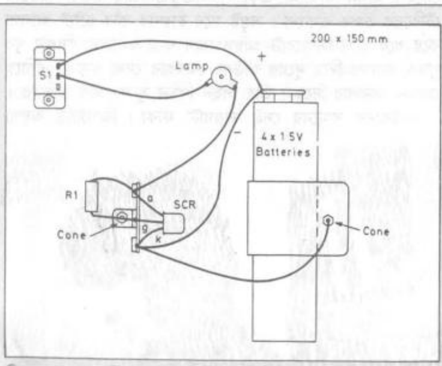


*চিত্র 1. 3 : সমস্ত উপকরণ ইনসুলেটেড বোর্ডে যোগ করা হয়েছে*

ইনসুলেটেড বোর্ডের নীচে ব্যবহার করতে পারো।

## চোঙা এবং তার লাগানো

পাতলা টিন প্লেট থেকে দুটো চোঙা (Cones) তৈরি করে নিতে হবে। পুরনো নারকোল তেলের কৌটো অথবা ওই ধরনের অন্য কোনও কৌটো থেকে এটা তৈরি করা যায়। চোঙার গোল মুখ টিনের পাত থেকে এঁকে নেবে একটা কম্পাস অথবা কোনও গোলাকার বস্তুর সাহায্যে। এই গোল মুখের সাইজ হবে প্রায় 50 থেকে 60 মিমি (দু' ইঞ্চি থেকে প্রায় আড়াই ইঞ্চি)। তোমার টিন কাটার জন্য কাঁচি থাকলে ভাল, নতুবা ধারে-কাছের দোকান থেকে কেটে আনতে হবে। এর থেকে নব্বই ডিগ্রি অংশ সরিয়ে নাও। এইবার দুটো টুকরো থেকে সহজেই চোঙা বানিয়ে নিতে পারবে। সাবধানে চোঙা দুটো তৈরি করবে, যাতে তোমার আঙুল কেটে আবার রক্তারক্তি না হয়! যেখানে চোঙের দুটো পাত এসে মিশছে সেখানে সলডারিং করে নাও। চোঙের ছুঁচলো মুখে একটা গর্ত করতে হবে যাতে তার মধ্য দিয়ে সহজেই একটা বোল্ট ঢুকতে পারে।

দুটো প্রায় 50 মিমি লম্বা বোল্ট নিলে ওটা ইনসুলেটেড বোর্ডের সঙ্গে চোঙ দুটোকে আটকে দেবে। ওই একই বোল্ট tag-strip ও ব্যাটারি ক্ল্যাম্প যুক্ত করবে। চিত্র 1.3 দ্যাখো এবং ঠিক সেইভাবে তারগুলো পরস্পর জুড়ে দাও। লক্ষ রাখবে, ব্যাটারির পজিটিভ এবং নেগেটিভ যেন ঠিকভাবে সংযুক্ত করা হয়।

সমস্ত ইউনিট টেস্ট করবার জন্য চোঙ দুটোকে কিছুক্ষণের জন্য শর্ট-সার্কিট করে দিতে হবে। এবার s1 বন্ধ করে দাও। এখন আলো জ্বলবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত চোঙ দুটোর মাঝের সার্কিট সম্পূর্ণ হচ্ছে।

## খেলা

চোঙ দুটোর মধ্যে যে-কোনও উজ্জ্বল, পরিষ্কার বস্তু ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে কতকগুলো 50 মিমি অথবা ওইরকম কিছু পেরেক নিলেই সুবিধে হবে। মরচে পড়া, নোংরা কোনও জিনিস ব্যবহার না করাই উচিত, কারণ এর ফলে তাদের মধ্যে বৈদ্যুতিক সংযোগ ঘটবে না। খেলোয়াড়রা চোঙ দুটোর উপরে এবং দুটো চোঙের মাঝখানে পেরেকগুলো রাখতে থাকবে, যাতে বিদ্যুৎ পরিবহণের পথ তৈরি হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত খেলা শুরু হওয়ার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি না হচ্ছে। S1 এই সময় বন্ধ থাকবে। এবার এক-একজন এসে একটা করে পেরেক সরাতে আরম্ভ করবে, যেমন আগে বলা হয়েছে। ব্যাপারটা অবশ্য ক্রমশই খুব কঠিন হতে থাকবে।

যদি S1 বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলে ওঠে তা হলে বুঝতে হবে চোঙ দুটোর মাঝখানের সার্কিট সম্পূর্ণ হয়নি অথবা এখানে উঁচু রোধ (resistance) সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য যদি চোঙ এবং পেরেকগুলো বেশ পরিষ্কার চকচকে হয় তা হলে এই অসুবিধে হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

## যেসব উপকরণ চাই

50v 0.5A অথবা এইরকম সিলিকন কন্ট্রোলড রেকটিফায়ার ; R1 22K Ω 5% ¼W; থ্রি-ওয়ে ট্যাগ-স্ট্রিপ ; 6V 0.1A বাল্ব হোল্ডার সহ ; S1 স্লাইড সুইচ (অন-অফ) ; 200 × 100 মিমি বোর্ড ; দুটো 200×25 মিমি এবং দুটো 150 × 25 মিমি বোর্ড ; বোল্ট, টিন প্লেট—চোঙের জন্য, পেরেক, ব্যাটারি-হোল্ডার ইত্যাদি। ●

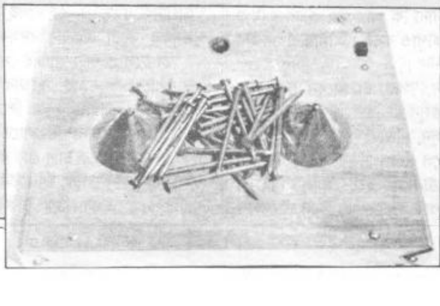

ভদ্রলোক। বিদেশের দু-দুটো ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টরেট করেছেন। এখানে আদিম উপজাতিদের বিষয়ে গবেষণা করছিলেন। কাল রাত্রে হলিডে হোমে ফেরেননি ঠিক কথা কিন্তু এ-নিয়ে রাধু চৌধুরী মাথা ঘামাননি। ভেবেছিলেন, কোথাও কোনও গ্রামে গিয়ে হয়তো আদিবাসীদের পরব-অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। এরকম তিনি হামেশাই করতেন। তাঁর সুবিধের জন্য পিছনের দরজায় একটা চাবি তাঁকে দেওয়াই ছিল। মানুষটি ছিলেন নির্ঝঞ্ঝাট, অমায়িক এবং আত্মপ্রচার বিমুখ।

পুলিশের প্রাথমিক কাজ সেরে নিতে মিনিট দশেক লাগল। ও সি ভদ্রলোক বেশ চটপটে, চোখে-মুখে বুদ্ধির ছাপ আছে। নাম জীবন হায়দার। বাঙালি, বেশ বড় ঘরের ছেলে, ভাল ছাত্র। এম এ পাস করে কেন যে পুলিশে এসেছেন কে জানে। শিগগিরই একটা প্রোমোশন পাচ্ছেন এমন শোনা যাচ্ছে।

মৃতদেহ প্রথম কে দেখতে পেয়েছিল জানার পর হায়দার অমিয় আর সুনন্দকে নিয়ে পড়লেন। এইসব মামলায় প্রথম যে মৃতকে দেখতে পেয়েছে তার জবানবন্দীর গুরুত্ব থাকে। তাই প্রথমেই জানতে চাইলেন এই ভোরবেলায় তারা এখানে কী করতে এসেছিল। হলিডে হোমের জানলা থেকে দেখতে পেয়ে তারা ছুটতে ছুটতে এখানে এসেছিল শুনে হায়দার একবার বাড়িটার দিকে ফিরে তাকালেন। বাড়িটা এই জায়গা থেকে খানিকটা দূরে। সেখান থেকে চিন্ময়বাবুকে চেনা কিংবা তিনি যে মারা গেছেন তা অনুমান করা সম্ভব বলে মনে হল না। ব্যাপারটায় তিনি সন্দিগ্ধ হলেন কিন্তু বুঝতে দিলেন না। বরং তারা যে বুদ্ধি করে থানায় খবর পাঠিয়েছিল এজন্য খুব তারিফ করলেন। ও সি-র প্রশংসায় অমিয় তো একেবারে গলে গেল। সে নিজে থেকেই প্রথম দেখতে পাওয়ার খুঁটিনাটি খুব উৎসাহের সঙ্গে বলতে শুরু করেছিল, সুনন্দ চোখ টিপতে আচমকা থেমে গেল। থামাটাও যে কিছুটা বোকার মতোই হল সুনন্দ তা বুঝতে পারলেও তার কিছুই করার ছিল না। অবশ্য জীবন হায়দার সেটা বোধ হয় খেয়ালই করলেন না।

"কাল বিকেলে তোমরা এখানে বেড়াতে এসেছ?"

সুনন্দ বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তোমাদের মা-বাবারা সঙ্গে এসেছেন নাকি মাস্টারমশাইরা তোমাদের এক্সকারশনে নিয়ে এসেছেন?"

"আমরা একাই এসেছি। কয়েক দিনের ছুটি কাটাতে।"

"বেশ বেশ। বাঙালির ছেলে, বিশেষ করে কলকাতার বইমুখো ছেলেদের তুলনায় তোমরা বেশ অ্যাডভেঞ্চারাস। আমিও তোমাদের বয়সে এরকম ছিলাম। সিনেমা-থিয়েটার না দেখে দেশ দেখে বেড়ানো অনেক ভাল। সাহস বাড়ে, অভিজ্ঞতা বাড়ে, মনের প্রসারতা বাড়ে। তোমাদের সঙ্গে আলাপ করে খুব খুশিও হলাম। চলো, চা খেতে-খেতে একটু গল্প করা যাক।"

"সুনন্দ কিছু বলার আগেই অমিয় শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করল, "থানায়?"

হায়দার হেসে ফেলে বললেন, "থানা কি আর গল্প করার জায়গা রে ভাই? না, না, থানায় নয়, অন্য কোথাও বসব। আমার এখানকার কাজ ফুরিয়েছে।"

রাধু চৌধুরী হাত কচলে বললেন, "সার, চা খাবেন তো অন্য কোথাও কেন! আমার ওখানেই চলুন।"

"আপনার কুটিরে? বেশ তাই চলুন, দাঁড়ান, আগে ওদের ছেড়ে দিই।" হায়দার বড়-বড় পা ফেলে জিপগাড়ির কাছে এগিয়ে গেলেন। কনস্টেবল দু'জন অ্যাটেনশন হয়ে স্যালুট দিল। ফোটোগ্রাফার তার ক্যামেরা ব্যাগে পুরতে পুরতে মুখ তুলে তাকাল। ড্রাইভার গাড়ির ভেতরেই বসে ছিল সুনন্দ আগে খেয়াল করেনি। ডাক্তার আর ক্যামেরাম্যানকে বড় রাস্তার মোড়ে নামিয়ে দিয়ে ডেডবডি মর্গে পৌঁছে দেবার নির্দেশ দিলেন খুব সম্ভব। স্পষ্ট শোনা গেল না। সুনন্দ নিচু গলায় অমিয়কে বলল, "বুদ্ধু কোথাকার!"

অমিয় আহত গলায় বলল, "আমি কী করব!"

হায়দার ফিরে এসে বললেন, "চলো।"

অফিসঘরে কিংবা ডাইনিং হলে না বসে জীবন হায়দার সোজা দোতলায় সুনন্দদের ঘরে চলে এলেন গল্প করতে করতে। ঘরটা তখনও পরিষ্কার করা হয়নি। টেবিলের ওপরে চায়ের কাপ দুটো আর রুটির প্লেট, মাখনের আধখোলা প্যাকেট ছুরি-চামচ যেভাবে পড়ে ছিল তা দেখলেই বোঝা যায় অসমাপ্ত ব্রেকফাস্ট ফেলে ছেলে দুটো ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল। অ্যাশট্রে খোঁজার ছলে হায়দার টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। কাপ ভর্তি চা জুড়িয়ে সর পড়ে গেছে। মাখন মাখানো একপিস পাউরুটি আধ-খাওয়া অবস্থায় টেবিলের ওপর নামানো। সন্তুষ্ট মনে হায়দার তাঁর ঠোঁটে আলগা করে ধরে রাখা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে বললেন, "ঘরটা খুব সুন্দর, জানলা দিয়ে দূরের ঝাউবন চমৎকার দেখা যায়।" এগিয়ে গেলেন জানলার দিকে। তাঁর পিছন-পিছন সুনন্দ আর অমিয়ও।

ঝাউবনের সামনের সেই জায়গাটা ফাঁকা। জিপগাড়ি অদৃশ্য

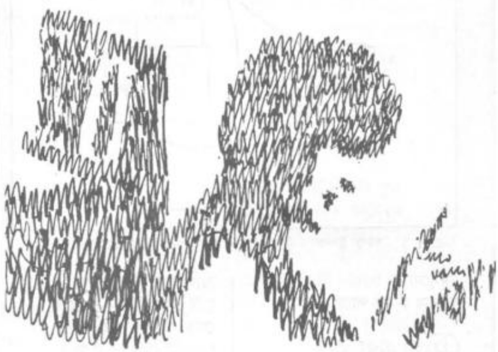

হয়েছে। একটু আগেও ওখানে চিন্ময় মুস্তাফি শুয়ে ছিলেন ভাবাই যায় না। সুনন্দ ঠোঁটের হাসি গোপন করে বলল, "হায়দারসাহেব, আপনি বসবেন না?"

অমিয় তাড়াতাড়ি একটা চেয়ার টেনে আনল, "বসুন এখানে। আমরা বিছানার ওপরে বসছি।"

"সার!" রাধু চৌধুরী উঁকি মারলেন, "চা-টা কি এ-ঘরেই দিতে বলব?"

"নিশ্চয়।" হায়দার জানলা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, "আপনিও আসুন। একসঙ্গেই চা খাব আমরা। ভাল কথা, ডক্টর মুস্তাফির ঘরটা একবার দেখব।"

"তা হলে দেখাটা আগেই সেরে নিন। এ-ঘরটা ততক্ষণে পরিষ্কার হয়ে যাবে।" বলেই দরজার বাইরে দাঁড়ানো ছোকরা কাজের লোকটিকে ইশারায় হুকুম দিলেন।

মুস্তাফির ঘরখানা দোতলাতেই, বারান্দার শেষ প্রান্তে। তালা বন্ধই ছিল। পকেট থেকে চাবি বের করে খুলে দিলেন রাধু চৌধুরী। বোঝা গেল তিনি ঝানু লোক, জানতেন, তাই পকেটে চাবি নিয়ে তৈরি হয়েই ঘুরছিলেন। এখন ঠিক টুরিস্ট সিজন নয় বলে হলিডে হোম

একেবারেই ফাঁকা। একতলায় দু-একঘর বোর্ডার থাকলেও দোতলায় সুনন্দদের বাদ দিলে কেবল মুস্তাফিই ছিলেন।

মুস্তাফির ঘরে দ্রষ্টব্য বলতে বা দামি বলতে বাংলা-ইংরেজি দুটো পোর্টেবল টাইপরাইটার, একটা বিদেশী বাইনোকুলার আর ক্যামেরা ছাড়া কিছুই ছিল না। টেবিলের ওপর এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে আছে হাফ ডজন ডটপেন, গোটা দুই দামি কালির কলম, ম্যাগনিফাইং গ্লাস, একটা ম্যাগনেটিক চেসবোর্ড এবং কিছু কাগজপত্র।

অমিয়রা জীবন হায়দারের পিছন-পিছন এসেছিল। তিনি ওদের ডেকে আনেননি যেমন, আবার নিষেধও করেননি এ-ঘরে আসতে। আলনার শু-র‍্যাকে এক জোড়া চটি আর ওপরে গোটা দুই পাজামা-পাঞ্জাবি ঝুলছিল। ওয়ার্ডরোবে দু-তিন প্রস্ত শার্ট, ট্রাউজার্স, তাকে কিছু ইতিহাস আর নৃতত্ত্বের পেপারব্যাক, একটা সুটকেস। ব্যস, এই মুস্তাফির অস্থাবর সম্পত্তি। হায়দার অ্যাটাচ্‌ড বাথ আর কিচেনে উঁকি মারলেন। একটা দুধের কৌটো আর কফির শিশি নজরে পড়ল।

মুস্তাফির টেবিলের কাছে ফিরে এসে হায়দার ওঁর ছড়ানো কাগজপত্র নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, "ভদ্রলোকের দাবা খেলার নেশা ছিল। স্থানীয় কেউ-কেউ আসতেন নাকি ওঁর সঙ্গে খেলতে?"

রাধু মাথা চুলকে বললেন, "যতদূর মনে পড়ছে সার, কেউ কখনও দাবা খেলতে আসেনি। উনি একাই বোর্ড নিয়ে শুয়ে-শুয়ে খেলতেন। শুনেছিলাম, চুম্বক দেওয়া আছে বলে ছকের ওপর ঘুটিগুলো সেঁটে থাকে, নড়ে না, চড়ে না, পড়ে না।"

"দাবা না খেললেও তা হলে লোকজন আসত ওঁর কাছে?"

বেফাঁস কিছু বলে ফেলেছেন কি না ভাবতে ভাবতে চিন্তিতমুখে রাধু জবাব দিলেন, "আজ্ঞে, তা আসত।"

"কারা আসতেন?"

"সার, সে তো আমার পক্ষে বলা শক্ত, তবে এই শহরের দু-একটা চেনা মুখ দেখেছি। যদি নাম জিজ্ঞেস করেন বলতে পারব না। এ ছাড়া বাইরের লোকও..."

বাধা দিয়ে হায়দার ফের প্রশ্ন করলেন, "উনি এবার কবে এসে এখানে উঠেছিলেন?"

"পরশু বিকেলে।"

"ক'দিন থাকতে পারেন বলেছিলেন?"

"কিছু বলেননি। তবে যখনই আসতেন কম করে দিন পনেরো তো থাকতেনই। এখানে বসে লেখালেখির কাজ করতেন তো ভদ্রলোক। আমি রান্নার লোক জোগাড় করে দিতাম। ভদ্রলোকের হাতটা দরাজ ছিল, টাকাপয়সার ব্যাপারে কখনও কাউকে ভোগাননি।"

"খুব মিশুকে আড্ডাপ্রিয় ছিলেন তাই না?"

"ঠিক তার উলটো সার। রাশভারী, কম কথা বলতেন। ঘরে আছেন বোঝাই যেত না।"

"হুঁ। কাল বিকেলে, ওঁর বেরনোর আগে কেউ দেখা করতে এসেছিল?"

"আজ্ঞে..." উত্তর দিতে একটু দেরি হল, "না, কেউ না। কাল গোটা দিনটা উনি একাই ছিলেন। দরজা বন্ধ করে লিখছিলেন।"

"তা হলে কী করে বুঝলেন উনি লিখছিলেন?"

আঙুল বাঁকিয়ে টাইপ করার মুদ্রা দেখিয়ে রাধু বললেন, "এই খটাখট শব্দ শুনে।"

"তোমরা ওঁকে আগে দেখেছিলে?" সুনন্দর দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন, "মানে এখানে এসে আলাপ হয়েছিল?"

সুনন্দ মাথা নাড়ল, "না। আমরা এখানে এসে দোতলার সব ক'টা ঘরেই তালা ঝুলছে, দেখেছি।"

রাধু বললেন, "আজ্ঞে, এরা আসার একঘণ্টা-দেড়ঘণ্টা আগেই মুস্তাফিসাহেব বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তা প্রায় সাড়ে তিনটে নাগাদ।"

কাজের লোক এসে দরজার পাশ থেকে উঁকি মারল, "বাবু..."

"কিছু বলবি?"

"জলখাবার দিইচি ও ঘরে।"

জীবন হায়দার ডায়েরিতে সদ্য লেখা রিপোর্টের তলায় ওদের সই নিয়ে চলে যাওয়ার পর অমিয় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, "বাব্বা, লোকটার কী প্যাঁচালো সব কোশ্চেন। লাইফে এই প্রথম আমি পুলিশের জবানবন্দী নেওয়া দেখলাম। এতদিন শুধু গল্পের বইতেই পড়ে এসেছি।"

দরজায় ছিটকিনি তুলে দিয়ে বিছনার ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়তে পড়তে সুনন্দ বলল, "লাইফে এই প্রথম পুলিশের খাতায় তোমার নাম-ঠিকানা উঠল সেটা খেয়াল করেছ কি?"

কথাটা শুনে অমিয়র মুখখানা পলকের জন্য শুকিয়ে গেল। বলল, "সত্যি সুনন্দ, এটা তো তলিয়ে ভাবিনি! কী হবে? থানায়-আদালতে আমাদের টানাটানি করবে না তো শেষকালে?"

নিরুত্তাপ উদাস গলায় সুনন্দ বলল, "করতে পারে। করলে আশ্চর্য হব না।"

খপ করে সুনন্দর হাতটা চেপে ধরে অমিয় ভিতু গলায় বলল, "কী হবে ভাই! আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়লাম যা হোক। ইস্‌, পুলিশে ছুঁলে শুনেছি আঠারো ঘা! আর আমার বাবা যদি জানতে পারেন তা হলে বরাতে অনেক দুঃখ আছে। পয়লা দফায় একেবারে ক্যাশ ধোলাই হবে।"

"ক্যাশ ধোলাই!" ভুরু নাচিয়ে কৌতুকের গলায় সুনন্দ জানতে চায়, "সেটা আবার কী রে? রামধোলাই, আড়ং ধোলাই শুনেছি, কিন্তু তোর এই..."

"শুনবি কোত্থেকে, ওটা আমাদের পারিবারিক টার্ম। বাবার একটা শঙ্কর মাছের লেজের চাবুক আছে, সেটাকে আমরা যমের মতো ডরাই। মেজদা বলে, ওই চাবুক যেদিন পিঠে ক্যাশ করতে হবে সেদিন বুঝবি। বেয়াড়াপনা করলে বাবা নাকি ওটা দিয়েই চেক দিয়ে থাকেন।"

সুনন্দ বলল, "তোর বাবার ব্যাপারটা অবশ্য তোদের পারিবারিক ব্যাপার, আমি দায়িত্ব নিতে পারব না। তবে পুলিশের ব্যাপারটা

আমার ওপরে ছেড়ে দে, ওটা আমি ট্যাক্‌ল করব।"

অমিয় বলল, "ওই প্যাঁচালো হায়দারসাহেবের বুদ্ধির তুই নাগাল পাবি ভেবেছিস ? কীভাবে জেরা করছিলেন দেখেছিস !"

"গোয়েন্দাগিরিতে ওকেই বলে ডিটেকশন। আচমকা কথা টেনে বের করতে ওভাবেই প্রশ্ন করতে হয়। ওকে বলে কর্ক স্ক্রু কোশ্চেন ! প্যাঁচ তো থাকবেই ! তুই কিস্যু ভাবিস না। আমারও মগজে ঘিলু হ্যাজ !" বলে সুনন্দ হি-হি করে হাসতে লাগল।

সুনন্দর কথায় এবং হাসিতে অমিয়র মনের ভার হালকা হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে সে কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল। সুনন্দ সেটা লক্ষ করে বলল, "কী দেখছিস অমন করে ?"

"তোকে দেখছি। তোকে প্রায় গোয়েন্দা-গোয়েন্দা লাগছে। ঠিক গল্পের বইয়ের মতো !" বলেই ফিক করে হেসে ফেলল।

"আমাকে দেখে তোর হাসি পাচ্ছে নাকি রে ? আমি কি দেখতে এতই হাস্যকর !"

"না, না, তা নয়। একটা মজার ব্যাপার মনে পড়ল। একটা অদ্ভুত কো-ইন্সিডেন্স, মানে কাকতালীয় কাণ্ড, এতদিন মাথায় আসেনি।"

সুনন্দ উঠে বসতে বসতে বলল, "মাথায় যখন এসেছে, বলেই ফ্যাল, অত ভণিতা করছিস কেন ?"

"তোর নামে একজন গোয়েন্দা আছে তুই জানিস ?"

"থাকতেই পারে। এক নামে কত মানুষ থাকে, নাম তো কারও কেনা নয়। কিন্তু তুই তাঁকে জানিস, কখনও বলিসনি কিন্তু। কোথায় থাকেন ?"

"কিন্তু তাই বলে নাম, পদবি, বয়স, চেহারা, কথা বলার কায়দা সব মিলবে ! এটা মজার ব্যাপার না ?"

"আমার বয়সী গোয়েন্দা। যাঃ ! তা হলে বাচ্চু গোয়েন্দা বল ? ভারী মজার ব্যাপার তো ! কোথায় থাকে ?"

অমিয় গম্ভীর গলায় বলল, "গল্পের গোয়েন্দা। অনেক বইয়ে ওর কীর্তিকলাপ পড়েছি। তুই পড়িসনি, নইলে তোরও মনে হত তোকে নিয়েই কেউ গল্পগুলো লিখেছে।"

সুনন্দ হো-হো করে হেসে উঠে বলল, "ওঃ গল্পের গোয়েন্দা ! আমি ভেবেছিলাম সত্যিকারের।"

"সত্যিকারেরই তো। গল্প হলেও সত্যি। গল্পে কি কোনও সত্যি মানুষের কথা লেখা হয় না ? সব ঘটনাই কি বানানো হয় ! কোথায় কী ঘটছে আমরা কতটুকু জানি ? এই যে আমাদের কথাই ধর না। কেউ কি ভাবতে পারবে, আমরাই ভেবেছি কখনও যে, বেড়াতে এসে এমন ভয়ঙ্কর ঘটনার মধ্যে..."

"তা ঠিক, কিছুই আশ্চর্য না। ঠিকানা জানা থাকলে তোর গোয়েন্দার সঙ্গে আলাপ করা যেত !"

"আর আলাপ !" অমিয় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, "সুনন্দ আর বেঁচে নেই। ঠিক আমাদের মতোই বিহার সীমান্তে এক ছোট শহরে বেড়াতে এসে খুনের তদন্ত করছিল। তারপর একদিন সেই খুনির হাতেই—এবারের পুজোসংখ্যা 'আনন্দমেলা'তেই আছে সেই ঘটনা, তুই পড়িসনি বোধ হয় ?"

সুনন্দ বলল, "দুর, পুজো আসতে এখনও দেরি আছে, এখনই পুজোসংখ্যা পড়ে ফেললে পুজোর দিনগুলো কাটবে কী করে। আমি

আকাশে ওড়ার কথা □ তেইশ — ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

# ১৯১৫-১৬ : ব্রিটিশ যুদ্ধবিমান

## শর্ট ২২৫ সীপ্লেন

এই বিমানটি ব্রিটিশ নৌবাহিনীতে ব্যবহার করা হত। ১৯১৬ সালে জুটল্যান্ডের নৌযুদ্ধে এই বিমানের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য, মূলত বিপক্ষ জাহাজের অবস্থান লক্ষ করার কাজে। এটিই বিশ্বের প্রথম বিমান, যা থেকে নিক্ষিপ্ত টর্পেডোর আঘাতে একটি যুদ্ধজাহাজ ধ্বংস হয়। ঘটনাটি ঘটে গ্যালিপলির যুদ্ধে। আক্রান্ত জাহাজটি ছিল তুরস্কের।

## সপউইথ পাপ

এক আসনবিশিষ্ট এই ব্রিটিশ বিমানটি বহু অভিজ্ঞ বৈমানিকের মতে বিশ্বের সবচেয়ে নিরাপদ বিমান। এটি চালানো ছিল খুব সহজ, আর আকাশযুদ্ধে এর নিয়ন্ত্রণক্ষমতা ছিল অসাধারণ। শক্তিশালী জার্মান বিমানগুলিকে গতিবেগে সহজেই পরাস্ত করে এই বিমানটি নাগালের বাইরে থেকে আক্রমণ করতে পারত। এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার বা বিমানবাহী যুদ্ধজাহাজেও এটি বিশ্বের সর্বপ্রথম ব্যবহৃত বিমান।

*জাহাজের ডেকে সপউইথ পাপ*

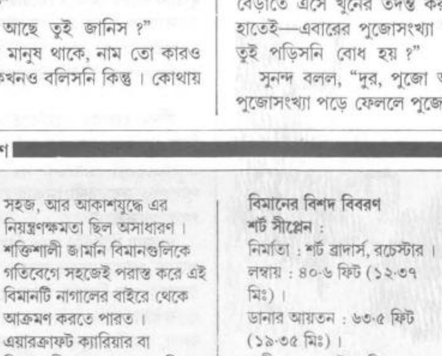

**বিমানের বিশদ বিবরণ**

**শর্ট সীপ্লেন :**

নির্মাতা : শর্ট ব্রাদার্স, রচেস্টার।
লম্বায় : ৪০·৬ ফিট (১২·৩৭ মিঃ)।
ডানার আয়তন : ৬৩·৫ ফিট (১৯·৩৫ মিঃ)।
যাত্রী : একজন বৈমানিক ও একজন নিরীক্ষণকারী।
অস্ত্রসম্ভার : একটি মেশিনগান, একটি ১৪ ইঞ্চি টর্পেডো বা ৫২০ পাউন্ড বোমা।
গতিবেগ : ঘণ্টায় ৮৮ মাইল (১৪২ কিমি)।
সিলিং : ৯০০০ ফিট (২৭৪০ মিঃ)।
একটানা ওড়ার ক্ষমতা : পৌনে তিন ঘণ্টা।
এঞ্জিন : একটি ২২৫ অশ্বশক্তির সানবিম।

**সপউইথ পাপ :**

নির্মাতা : সপউইথ বিমান কম্পানি, কিংসটন অন টেম্‌স।
লম্বায় : ১৯·২৫ ফিট (৫·৯ মিঃ)।
ডানার আয়তন : ২৬·৫ ফিট (৮·১ মিঃ)।
যাত্রী : একজন বৈমানিক।
অস্ত্রসম্ভার : একটি স্থিরলক্ষ্য মেশিনগান ও চারটি ২৫ পাউন্ড বোমা।
গতিবেগ : ঘণ্টায় ১১২ মাইল (৫৩০০ মিঃ)।
একটানা ওড়ার ক্ষমতা : ৩ ঘণ্টা।
এঞ্জিন : একটি ৮০ অশ্বশক্তির লা রোন (ফরাসি)।

তাই পুজোর কাগজ জমিয়ে রাখি।"

"আমি কিন্তু লোভ সামলাতে পারি না। বিশেষ করে গোয়েন্দা কাহিনীগুলোর জন্য আমার তর সয় না। দাঁড়া,একটা মজার জিনিস দেখাই।" অমিয়র সত্যিই তর সইছিল না। তড়াক করে উঠে গিয়ে ওয়ার্ডরোব খুলল। তারপর নিজের সুটকেস হাঁটকে আনন্দমেলাটা বের করে আনল।

"এ কী রে!" সুনন্দ অবাক হয়ে বলল, "পড়া কাগজখানাই আবার এতদূরে টেনে এনেছিস কেন শুধু শুধু?"

"সব শেষ করতে পারিনি। তুই এই 'বাঘের গন্ধ' গল্পটা পড়ে দ্যাখ, যা বলছিলাম।"

"বেশ শিকারকাহিনী-শিকারকাহিনী গন্ধ আছে নামটার ভেতর।"

"মানুষ শিকারের কাহিনী, বলতে পারিস। কিন্তু এমন বিশ্রীভাবে শেষ হয়েছে না গল্পটা, যে পড়ে ইস্তক আমার মনটা ক'দিন ধরে খারাপ হয়ে আছে। লেখককে সামনে পেলে বলতাম, সুনন্দকে এভাবে মেরে ফেলাটা মশাই আপনার মোটেই ঠিক কাজ হয়নি।"

সুনন্দ হাসল, "আনাড়ি গোয়েন্দা নিশ্চয়ই, তাই পট্ করে মরে গেল! নইলে এমনিতে গোয়েন্দারা অমর। বন্দুকের গুলিও তাদের কপালে লাগে না, কানের পাশ দিয়ে জুলপি ছুঁয়ে বেরিয়ে যায়। শার্লক হোমস একবার প্রায় মরে গিয়েছিলেন, শেষে বেঁচে উঠে রক্ষে পেয়েছেন। তোর খুদে গোয়েন্দাটা কায়দা জানে না, তাই বেমক্কা খুন হয়ে গেল।"

"সব ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা করিস না। একটা জলজ্যান্ত ছেলের জীবনটা কি ফেলনা খোলামকুচি নাকি!"

সুনন্দ আর হাসল না। বুঝল অমিয় খুবই আহত হয়েছে। বলল, "কিন্তু তোর কথাই যদি ঠিক হয়, মানে এটা গল্প-হলেও সত্যি কাহিনী হয়, তা হলে লেখক কী করবেন! তাঁকে দোষ দিয়ে লাভ কী? যা ঘটেছে, তাঁকে তাই লিখতে হয়েছে। একদম শেষটুকু আমাকে পড়ে শোনা দিকি, দেখি কী লিখেছেন।"

"শুধু শেষটুকু?" অমিয়র যেন মনঃপূত হল না কথাটা, "বলিস তো পুরোটাই পড়ে শোনাতে পারি।"

"না, অত শোনার সময় নেই এখন।"

"বেশ, শেষ দুটো প্যারা পড়ছি। এটুকু শুনে কিছু বোঝা যাবে না, তবু বলছিস যখন শোন।"

"কয়েক মুহূর্ত হতভম্বের মতো কেটে যাবার পর হঠাৎ মগজে একটা চিন্তা বিদ্যুতের শিখার মতো ঝলসে উঠল। তবে কি তাই! পা টিপে-টিপে এগিয়ে গিয়ে পাশের ঘরে উঁকি দিতেই বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠল। ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে হাতের খোলা ক্ষুরটাই মন দিয়ে দেখছেন কল্যাণজেঠু। মুখে অচেনা একটা হিংস্র হাসি।

"বাঘের গন্ধ এই প্রথম নাকে এসে লাগল সুনন্দর। সে পাগলের মতো ছুটে গেল সদরের দিকে। কিন্তু দরজাটা যে একটু আগেই লক করা হয়েছে মনে পড়ল না।" পড়া শেষ করে এক পলক তাকিয়ে থাকল অমিয়, শেষে বলল, "বাঘ মানে মানুষ-বাঘ, কল্যাণজেঠু। বুঝেছিস নিশ্চয়?"

"হুঁ।" সুনন্দ অল্প সময় চোখ বন্ধ করে বসে থেকে বলল, "সুনন্দকে মেরে ফেলা হয়েছে এমন তো কোনও কথা নেই। সুনন্দ অনায়াসেই বেঁচে যেতে পারে এখনও। আমিই তাকে বাঁচিয়ে দিতে পারি কারণ তোর সুনন্দ এখনও মরেনি। সত্যি-সত্যি মরে গেলে আমার অবশ্য করার কিছুই থাকত না, তবে এ ক্ষেত্রে..." বলে মুচকি-মুচকি হাসতে লাগল।

"হ্যাঁ, পরের ঘটনাটুকু যেন তুই জ্যোতিষীর মতো জেনে বসে আছিস! সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে এরকম ভাল লাগে না!"

"পরের ঘটনা, তারপরের ঘটনা, এমনকী তারও পরের ঘটনা—সবই আমি জানি। ইনফ্যাক্ট, তোর সুনন্দ আদৌ মরেনি। দিব্যি বহাল তবিয়তে গপ্পসপ্প করছে হয়তো। ধর, শেষটা যদি এরকম ঘটে থাকে—হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলতে গেল কিন্তু নব ঘুরল না। মজবুত স্টিলের ডোর-ল্যাচ যেন ইঁদুর ধরা জাঁতিকলের মতো দাঁতকপাটি এঁটে তাকে আটকে ফেলেছে, আর রক্ষা নেই। আর সময়ও নেই, পিছনে দ্রুত পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে, আর তার বুকের মধ্যে যেন একটা রবারের বল ক্রমাগত ড্রপ খেয়ে চলেছে। পলকে ঘুরে দাঁড়িয়ে সুনন্দ দেখতে পেল হাতে মারাত্মক ক্ষুরখানা বাগিয়ে ধরে কল্যাণজেঠু প্রায় তার কাছাকাছি এসে পড়েছেন। মুখখানা পৈশাচিক হাসিতে শক্ত পাথরের চেহারা নিয়েছে। আর বোধ হয় একটি কি দুটি মুহূর্ত, তার পরেই ওই প্রবল বলশালী মানুষটা মানুষখেকো প্যান্থারের মতো বিদ্যুৎগতিতে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গলার নলি দু'ফাঁক করে দেবে। এর হাত থেকে আজ আর নিস্তার নেই। ছুটে পালাবার মতো শক্তিও আর অবশিষ্ট নেই, পা দু'খানা

যেন মেঝের সঙ্গে একেবারে সেঁটে গেছে। হাতের কাছে এমন কিছু নেই, যা দিয়ে সে প্রথম আক্রমণটা প্রতিহত করতে পারে। হাত দুই তফাতে টেবিলের ওপর কফির কাপটা ঝলকে দেখতে পেয়ে গেল। সদ্য ঢালা গরম কফি, তখনও তা থেকে ধোঁয়া উঠছে। শেষ অস্ত্র ওইটাই। মুখের ওপর গরম কফি ছুঁড়ে দিতে পারলে—কিন্তু না, টেবিলের কাছে পৌঁছবার আগেই...তাকে ভয়ঙ্কর চমকে দিয়ে ডোরবেল বেজে উঠল অ্যালার্ম ঘড়ির মতো। কিন্তু সেই মুহূর্তে সুনন্দ সেটাকে ডোরবেল বলে চিনতে পারল না, তার আতঙ্কে টানটান স্নায়ুর তারগুলোয় সেই আওয়াজ পাগলাঘন্টির মতো শোনাল। আর তার মধ্যেই কল্যাণজেঠুর হাসি শোনা গেল। হা-হা করে হেসে উঠলেন তিনি, সরল কৌতুকের হাসি। সুনন্দ তাজ্জব। জেঠুর হাতে সেই খোলা ক্ষুরটা তেমনই আছে বটে কিন্তু মুখের চেহারা ভোজবাজির মতো বদলে গেছে। নরম স্নিগ্ধ অমায়িক। বললেন, "ওহে খুদে গোয়েন্দা, তুমি যে এত সহজে এরকম ভয় পেয়ে যাবে আমি ভাবতেই পারিনি। যাও, দরজাটা খুলে দাও, পুলিশ এসে গেছে।"

সুনন্দ বলল, "আপনি খুলুন, চাবি তো আপনার পকেটে! কিন্তু যদি..."

# দোলের খেলা

রাখাল বিশ্বাস

দোল দিয়েছি আবির মেখে বাতাস ডাকে সুরে
আর ডেকেছে ঝরনাঝোরা সোনালি রোদ্দুরে।
মন পড়ে নেই পড়াশোনায় কদম-কেয়ার পাশে,
একটি বকুল সেও দেখি আজ রঙ মেখে উল্লাসে
গান জুড়েছে, নীল মেঘে ওই রঙিন ঘুড়ি ডাকে
সঙ সেজেছে অদ্ভুতুড়ের ঢেউ সে নদীর বাঁকে !
মিষ্টি কথায় ছড়িয়ে দিলুম দিগন্তরের হাসি ;
আকাশ নেমে ছাদের ওপর বলছে ভালবাসি।
আজকে খুশি দোলের খেলা আজকে খুশি গান,
উৎসবে সাজ বাজছে মাদল পাহাড় করে স্নান।
আগুনরাঙা জ্যোৎস্না এসে খাচ্ছে লুটোপুটি,
বলছে ডেকে আমায় নিবি আজকে আমার ছুটি।
মায়ের সে মুখ লাল করেছি ছিন্ন জামাটাকে,
ছুট দিয়েছি বনান্তরের শুকনো পাতার ফাঁকে।
আজ বসে নেই কেউ কোথাও যার যেখানে ইচ্ছে,
বুক জুড়ে মুখ ভরিয়ে নেবার ফাগের কুসুম দিচ্ছে।
বনকাপাসের একটু সোহাগ মর্মরে মর্মরে,
পালক মায়ার আলোক রাশি ঝরছে এবং ঝরে।
ঝরছে নাকি ঠিক ঝরে না থমকে পথের ধুলো,
তাও মেখেছি শরীর জুড়ে মন ভাল মনগুলো।
চুল বেঁধে নে মনস্বিনী আবির জলে ফিতে,
তার ভিতরেই দোল দিয়ে যা দোল এসেছে নিতে।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

কথাটা শেষ করল না, বেল থেমে গিয়েছিল, ভারী বুটের আওয়াজ আর একাধিক গলা শোনা গেল। বুঝল সত্যি-সত্যিই পুলিশ এসে গেছে। দরজা খুলে দিতেই রঘুনাথ সিংহ উত্তেজিত গলায় বললেন, "আরে মশাই, আপনি আমাকে তো ভাবনায় ফেলে দিয়েছিলেন। এদিকে তো সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হয়ে গেছে, আবার একটি ছেলেকে..." সুনন্দর দিকে চোখ পড়তেই থেমে গেলেন কথার মাঝখানে—"এ কী মাস্টার সুনন্দ, তুমি এখানে ! শুনলাম তোমরা নাকি পিকনিক করতে বেরিয়েছ ?"

সুনন্দ সংক্ষেপে সব বলল। সিং দুঃখিত গলায় বললেন, "ইস, তা হলে আর একটু আগে পৌঁছতে পারলে ছেলেটাকে বাঁচাতে পারতাম, সেই সঙ্গে খুনিকেও ধরতে পারতাম হাতেনাতে। আসলে বৃষ্টি এসে গিয়েই সব গোলমাল হয়ে গেল। ভাল কথা কল্যাণবাবু, আপনি কি কোনও শব্দটব্দ শুনতে পেয়েছিলেন ? একটা ছায়ামূর্তিকে কিন্তু আপনার বাড়ির দিকেই ছুটে আসতে দেখেছিলাম। এ-বাড়িতে ঢুকে পড়ার অন্য কোনও পথ নেই তো ?"

কল্যাণজেঠু হেসে ফেললেন, "বুঝেছি আপনারা কাকে দেখেছেন, ভয় পেয়ে উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে আসা এই শ্রীমানকেই দেখেছেন। আমার তো মনে হয় ওরও আজ ফাঁড়া ছিল।"

সুনন্দ অবাক হয়ে দেখল কল্যাণজেঠুর দুটো হাতই ফাঁকা, ক্ষুরটা কোন্ সময় যেন সকলের অলক্ষ্যে পকেটে ভরে ফেলেছেন।

সুনন্দ তার গল্প থামিয়ে মজার চোখে বন্ধুর হাঁ-হয়ে-যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। অমিয় বলল, "তা হলে খুনিকে আর ট্রেস করা গেল না।"

সুনন্দ গম্ভীর মুখে বলল, "তা কেন হবে ! কল্যাণজেঠু ঠিকই ধরা পড়েছিলেন।"

অমিয় বারকয়েক চোখের পাতা নাড়িয়ে বলল, "গল্প লিখলে তুই কিন্তু নাম করে যেতিস। যেরকম ছাপার অক্ষরে গড়গড় করে বলে গেলি, মনে হচ্ছিল যেন নিজের চোখে দেখেছিস। সুনন্দকে কত সহজে বাঁচিয়ে দিলি, ভাই।"

"কেউ কাউকে কি বাঁচাতে পারে রে ? যে বাঁচে সে নিজেই বাঁচে, আর যদি ভগবান মানিস, ভাগ্য মানিস, তা হলে তো...এনি হাউ, জেনে রাখ, সুনন্দ মরেনি !" বলে রহস্যময় হেসে নিজের বুকে আঙুল ঠেকাল।

সুনন্দর কথাগুলো, এমনকী ভাবভঙ্গিও অমিয়র কাছে কেমন হেঁয়ালির মতো ঠেকছিল। সে আর এই ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইছিল না। বলল, "যাক, ওসব কথা থাক। আজকের ঘটনাটা কী মনে হচ্ছে তাই বল।"

"ঝট করে কি কিছু মনে হয়, নাকি কিছু বলা যায় ? অনেক কিছু তলিয়ে ভাববার আছে। তবে এটা প্লেইন অ্যান্ড প্রি-প্ল্যানড মার্ডার হলেও অবাক হব না। কী দিয়ে চিন্ময়বাবুকে মারা হয়েছে আমরা জানি, তবে কেন মেরেছে, কারা মেরেছে, সেটা এই মুহূর্তে গভীর জলের তলায়। সবচেয়ে আগে, ওঁর বুকপকেট থেকে পাওয়া পোকাগুলোকে ভাল করে দেখতে হবে। ওগুলো কী জাতের পোকা, কী করেই বা ওঁর পকেটের ভেতরে এল সেটা আমাদের মাথা খাটিয়ে বার করতে হবে।"

অমিয় বলল, "তাই তো ! ভুলেই গিয়েছিলাম।"

সুনন্দ তার জামার পকেট থেকে সাদা কাগজের মোড়কটা বের করতে করতে বলল, "চল, ওই জানলার ধারে গিয়ে ভাল করে দেখি।"

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

অন্তত এক ডজন লোক আমাদের তাড়া করছে। ওদের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।
আবার আমি ওদের হাতে ধরা পড়তে চাই না···
ফাটক
গুমঘর
টিনটিন, সাবধান ! ভুল দরজা দিয়ে ঢুকিস না !
গুমঘর
ফাটক
ও ওই পথে গিয়েছে···দ্যাখো, দরজা খোলা···
বুদ্ধুটা ফাটকে লুকিয়েছে ! পালাবার রাস্তা নেই··· ইঁদুর-কলে পড়েছে !
শ্‌শ্‌ ! মুখে কুলুপ আঁটো !
ব্যস ! সবাই ভিতরে ঢুকেছে !
কেমন হল রে, কুট্টস ?···কেউ লক্ষ করেনি সাইনবোর্ড ওলট-পালট করে দিয়েছি···এখন সবকটাকে ফাটকে আটকে দিলাম।
বলিহারি যাই !
ওরা ফাটকে বন্ধ। এবার বাকি তিন-জনের ব্যবস্থা করতে হবে।
আধ ঘণ্টা ! ওরা গিয়েছে আধ ঘণ্টা হয়ে গেল, কিন্তু এখনও ওদের কোনও সাড়া নেই। কেমন সন্দেহ হচ্ছে···
হাত তোলো !
হচ্ছে কী··· টিনটিন ! কিন্তু পনেরোটা দেহরক্ষীর কী হল ? ···যাক, এখন নিজেকে বাঁচাতে হবে !
ওহ্‌ !
হা ! হা ! হা ! আমি চললাম !

# আমেরিকায় টিনটিন

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ব্যাটম্যান
নিহত ডোরিয়ানের অংশীদার ফ্রেড স্টিলের বাড়ি তল্লাশি করতে গিয়ে ব্যাটম্যান আর রবিনের দিকে কেউ গুলি চালায়। তারা একটি ছায়ামূর্তিকে ধরে ফেললে দেখা গেল ছায়ামূর্তি ফ্রেড স্টিল!
মিঃ স্টিল, আপনার পোশাক খুঁজে দেখলে আপত্তি আছে? গুলি চলবার পরেই আপনি উদয় হলেন কি না!
নেই! তবে আততায়ী ওই জানলা দিয়েও পালিয়ে যেতে পারে!
ওঁর সঙ্গে অস্ত্র নেই!
ইনি অত্যন্ত চালাক। পিস্তল হয়তো হলে কোথাও ছুঁড়ে ফেলেছেন!
পিস্তল থাকলে ডাকাত সন্দেহে তোমাদের বৈধভাবেই গুলি করতে পারতাম!
তোমরা ব্যস্ত ছিলে দেখছি! এখানে এমন কী আছে যার জন্য এত কৌতূহল?
চুরি-যাওয়া দুর্লভ সব বই! বাওয়ারের ধারণা দোকান থেকে আপনিই সেগুলি চুরি করেছেন—আপনিই খুনি। পালিয়ে-যাওয়া সেই লোকটিও আপনি!
চমৎকার! তোমার বক্তব্য অনুযায়ী আমি একধারে তিনটি লোক। ওহ্, ভুলেই গিয়েছিলাম, তোমাদের আমিই গুলি করেছি! তা হলে আমি একধারে চারটি লোক, তাই না?
অস্বীকার করতে পারেন ওই দুর্লভ বইগুলি বিক্রি করে আপনার দেনা শোধ হতে পারে?
কিছুই অস্বীকার করছি না! শুধু মনে করিয়ে দিতে চাই যে, বাওয়ার দোষী সাব্যস্ত হয়েছে এবং আজ রাতেই তার মৃত্যুদণ্ড!
ও নির্দোষ প্রমাণ হলে মৃত্যুদণ্ড হবে না!
সকালের কাগজে ইলেকট্রিক চেয়ারে বাওয়ারের মৃত্যুর খবর পড়লেই সব জানতে পারব। শুভরাত্রি, ব্যাটম্যান!
না, এখানে ভণ্ডুল করেছি! বেশি খোঁজাখুঁজির সুযোগও পাইনি!
বই-এর দোকানে আমরা এমন কিছু পেতে পারি যা পুলিশের নজর এড়িয়ে গেছে!
বাওয়ারের মৃত্যুদণ্ড রাত বারোটায়। তিন ঘণ্টার মধ্যে প্রমাণ করতে হবে বাওয়ার নির্দোষ!
ন'টা বাজে!
প্রমাণ জোগাড় করব কী করে
এই নকল চাবিগুলির একটায় নিশ্চয় তালা খুলবে!
RARE BOOKS
দেখলে? কোনও ঝামেলা হল না!
RARE BOOKS

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ক্যাম্পাস

# নজর-কাড়া একটি স্কুল

বর্ধমান পৌর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৩৬ সালের ২৬ অগস্ট। ১৯৮৬ সালে পালন করা হয় সুবর্ণ জয়ন্তী। লেখাপড়া ছাড়াও এই স্কুলের দুটি অত্যন্ত ব্যাপক কর্মক্ষেত্র রয়েছে। একটি খেলাধুলো এবং অন্যটি কারুশিল্প ও ললিতকলা। খেলাধুলোয় এই স্কুল একাধিকবার ইন্টারস্কুল চ্যাম্পিয়ান ও মহকুমা চ্যাম্পিয়ান হয়েছে।

বাস্কেটবলের আলাদা কোচ আছে এই স্কুলের। বাস্কেট বলে মহকুমা চ্যাম্পিয়ান হয়েছে এই স্কুলের ছাত্রীরা। ১৯৮৮ সালে জেলায় ইন্টারস্কুল চ্যাম্পিয়ান হয়ে সরকারি ইনসেনটিভ স্কিমের ১০ হাজার টাকা পুরস্কার পেয়ে বর্ধমান পৌর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় নিজেদের কৃতিত্ব বিশেষভাবে প্রমাণিত করেছে।

এই স্কুলের ছাত্রী মালা ঘোষ জাতীয় স্তরে বাস্কেটবল খেলেছেন। জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় জ্যাভেলিন ছুঁড়েছেন ইলা দত্ত। তিনি এখন স্পোর্টস কাউন্সিলে চাকরি করেন। যোগাসন ও জিমনাসটিক্সে কিছুদিন আগে মস্কো ঘুরে এসেছে দশম শ্রেণীর ছাত্রী স্বীকৃতি ঘোষ।

স্কুলের ক্যাম্পাসটি বেশ বড়। লং জাম্প ও হাইজাম্প অনুশীলনের ব্যবস্থা আছে এখানে। আছে প্রমাণ সাইজের বাস্কেটবল কোর্ট। তবে খেলাধুলোর অনুশীলনের ক্ষেত্রে কিছু কিছু অসুবিধেও যে নেই, তা নয়। পুরো মাঠে অ্যাথলেটিকসের ৫০ মিটার লেন বের করাই কঠিন। "আজ যেখানে বড় বড় প্রতিযোগিতায় মেয়েরা ১৫০০ মিটার, ৩০০০ মিটার দৌড়চ্ছে, সেখানে আমাদের ৫০ মিটার লেনে মেয়েরা ক্রমাগত আপ-ডাউন করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে।" এ-কথা জানিয়েছেন স্কুলের শিক্ষিকা মুক্তি নন্দী। যোগাসন ও জিমনাসটিক্স শেখানোর উপযুক্ত ঘরও নেই। এটাও একটা সমস্যা।

শিল্পচর্চার জন্য একসময় স্কুলের আলাদা ভবন ছিল। এখন কর্মশিক্ষা, গান ও স্কুলের বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠানের জন্য ভবনটি ব্যবহার করা হয়। স্কুলের প্রতিষ্ঠাদিবস ও বার্ষিক অনুষ্ঠানের সাজসজ্জা, পোশাক-আশাক মেয়েরা নিজেরাই তৈরি করে নেয়। তাদের সাহায্য করেন শিক্ষক শিবশঙ্কর কুণ্ডু ও শিক্ষিকা হেনা দাশগুপ্তা। স্কুলের নিজস্ব মঞ্চও রয়েছে। স্কুলের প্রার্থনাসঙ্গীত তো আছেই, সেইসঙ্গে উচ্চাঙ্গসঙ্গীত, জাতীয়তাবাদী গানও শেখানো হয়। বাটিক, বাঁধনি, এমব্রয়ডারি, কাটিং এবং কালি ও ফিনাইল

*ফিজিক্স ল্যাবরেটরিতে উচ্চমাধ্যমিকের মেয়েরা*

তৈরির কাজও ছাত্রীরা শেখে। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় মেয়েরা অংশ নেয়, অংশ নেয় বিজ্ঞানমেলায়।

মেয়েরা এখন নানাভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এ-বিষয়ে তারা আগের চেয়ে স্কুলে এখন

*যোগাসন অনুশীলন করছে স্বীকৃতি ঘোষ*

বেশি সুযোগ পাচ্ছে।

বুনিয়াদি, মাধ্যমিক এবং বিজ্ঞান ও কলা-বিষয়ক উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগগুলি মিলিয়ে এই স্কুলের ছাত্রী-সংখ্যা এখন প্রায় ২১০০। প্রতিটি বিভাগের জন্য আছে পৃথক ভবন। পুকুর, মাঠ ও গাছপালা ঘেরা বাগানের পাশে আছে শিক্ষিকাদের হস্টেল। আছে বিদ্যালয়-সমবায় ও ছাত্রীদের হেল্‌থ হোম। সব মিলে ভারী সুন্দর একটা পরিবেশ। মফস্বলের একটি স্কুল নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও এমন সুন্দরভাবে গড়ে উঠেছে যে, দেখলেই আনন্দ হয়।

অদ্বিতী বন্দ্যোপাধ্যায়

## অনেকের ছবিই পরিণত

*সুচেতা শর্মার ছবি 'মোরগ লড়াই'*

রামকৃষ্ণ মিশন, গোলপার্ক, সারদাদেবী স্কুল অব ফাইন আর্টস অ্যান্ড ক্রাফ্টসের বার্ষিক প্রদর্শনী সম্প্রতি হয়ে গেল। বিভিন্ন বয়সের একশোর বেশি ছেলেমেয়েদের ছবি ছিল প্রদর্শনীতে। এই স্কুলে ছবি আঁকা শেখানো হয় জলরঙে। এ ছাড়া পেপার মাস্ক, ছাপাই ছবি, কোলাজ, ওরিগামি ও শোলার কাজও শেখানো হয়। ছবি আঁকা শেখান রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, শোলার কাজ শেখান স্বপন দাস। প্রদর্শনীতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর একটি করে আঁকা ছবি রাখা হয়েছিল। শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগ কলকাতার বাসিন্দা, কিন্তু তাদের কল্পনায় ধরা পড়েছে গ্রামের জীবন। অনেকের ছবিই বেশ সুন্দর, প্রশংসা করবার মতো।

অশোককুমার কুণ্ডু

কেরিয়ার গাইড

# কম্পানি সেক্রেটারি হতে হলে

ইনস্টিটিউট অব কম্পানি সেক্রেটারিজ অব ইন্ডিয়া ১৯৮০ সালে স্থাপিত হয়েছে। কম্পানি সেক্রেটারি বৃত্তির উন্নতি এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারতে এটি একমাত্র বিধিবদ্ধ সংস্থা। এই সংস্থাটি স্থাপিত হওয়ার আগে কম্পানি ল বোর্ড ছাত্রদের নাম নথিভুক্ত করত এবং কম্পানি সেক্রেটারিশিপ পরীক্ষা নিত। প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং ও সরকারি ডিপ্লোমা দেওয়ার দায়িত্বও ছিল তাদেরই। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত কম্পানি ল বোর্ড এই দায়িত্ব পালন করেছে। কিন্তু এই বৃত্তির চাহিদা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে সরকারের কাছ থেকে কম্পানি সেক্রেটারিশিপ পরীক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয় ইনস্টিটিউটকে, ১৯৬৮ সালের ৪ অক্টোবর। ১৯৮১ সালে বিধিবদ্ধ সংস্থায় রূপান্তরিত এর বর্তমান সদস্য-সংখ্যা ছ' হাজার ছ'শোর মতো এবং রেজিস্টার্ড ছাত্রের সংখ্যা এক লক্ষ উনচল্লিশ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে। ইনস্টিটিউটের সদর দফতর নতুন দিল্লিতে। আঞ্চলিক অফিস আছে কলকাতা, দিল্লি, মাদ্রাজ এবং বোম্বাই-এ। তা ছাড়া ইনস্টিটিউটের চারটি আঞ্চলিক পর্ষদ এবং বিভিন্ন শহরে তেত্রিশটির মতো শাখা-কেন্দ্র আছে।

আইনের সব ধারা মেনে কম্পানির সব কাজকর্ম ঠিকঠাক পরিচালনার গুরুদায়িত্ব পালন করার জন্য দরকার পড়ে একজন দক্ষ প্রশাসকের। কম্পানি সেক্রেটারি সেই গুরুদায়িত্ব পালন করেন। কম্পানির আর্থিক, আইন, প্রশাসনিক কর্ম পরিচালনা, ব্যয়সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় সম্পর্কে তাঁকে জানতে এবং দক্ষতার প্রয়োগ করতে হবে। যেসব কম্পানির জমা মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা কিংবা তার বেশি সেইসব কম্পানির ক্ষেত্রে একজন পুরো সময়ের কম্পানি সেক্রেটারি রাখা বাধ্যতামূলক।

আইনের সমস্ত ধারা মেনে কম্পানির যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালনার জন্য দরকার হয় একজন দক্ষ প্রশাসকের। কম্পানি সেক্রেটারি সেই গুরুদায়িত্ব পালন করেন। এই বৃত্তিটির ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা মনে রেখে এবারের পরামর্শ:

(১) শতকরা অন্তত ৫০ নম্বর পেয়ে যাঁরা স্নাতক হয়েছেন তাঁরা সারা বছর ধরে নাম রেজিস্ট্রি করাতে পারবেন।

(২) ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় পাশ করার পর কম্পানিতে প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিংয়ের সময় মাসে ৫০০ টাকা থেকে ১৫০০ টাকা পর্যন্ত স্টাইপেন্ড পাওয়া যেতে পারে।

আর এই ইনস্টিটিউটের সদস্যই এমন পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতর ব্যক্তি। কম্পানি সেক্রেটারিশিপ পাশ করার পর ভারতের অন্তত ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি কোর্স করা যেতে পারে। এমনকী অধ্যাপকপদেও তাঁদের নিয়োগ করা যায়।

## নাম নথিভুক্তির নিয়ম

ইনস্টিটিউটের প্রিলিমিনারি, ইন্টারমিডিয়েট এবং ফাইনাল পরীক্ষায় পাশ করার পর তবেই কম্পানি সেক্রেটারি হওয়া সম্ভব। রেজিস্টার্ড ছাত্র ছাড়া ইন্টার বা ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়া যায় না, কিন্তু প্রিলিমিনারি পরীক্ষার জন্য সরাসরি আবেদন করা যেতে পারে। ছাত্র হিসেবে নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ১৮ বছর বয়স হওয়া চাই। শিক্ষাগত যোগ্যতা দরকার কমার্স গ্র্যাজুয়েট, বি-এ বা বি-এসসি (তবে এ ক্ষেত্রে শতকরা ৫০ নম্বর পেয়ে পাশ করা চাই অথবা যে-কোনও বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি)। কস্টিং এবং চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টরাও কম্পানি সেক্রেটারিশিপ-এর ইন্টার এবং ফাইনাল পরীক্ষায় বসতে পারেন। ছাত্র হিসেবে এখানে নাম নথিভুক্ত করতে হলে 'এস টি ১' ফর্মে আবেদন করতে হয়।

সারা বছর ধরে ছাত্রদের নাম নথিভুক্ত করা হয়। ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত যেসব ছাত্র নথিভুক্ত হন, তাঁরা পরবর্তী ডিসেম্বর মাসের পরীক্ষায় বসতে পারেন এবং যেসব ছাত্র অগস্ট মাস পর্যন্ত নাম নথিভুক্ত করেন তাঁরা পরবর্তী জুন মাসের পরীক্ষায় বসতে পারেন। রেজিস্ট্রেশন বা নথিভুক্তির সময়সীমা ৫ বছর। এই ৫ বছরের মধ্যেই তাঁকে ইন্টার এবং ফাইনাল পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। তবে পর্ষদ মনে করলে এই সময়সীমা

অমর দাশ

বাড়াতে পারে। রেজিস্ট্রেশন বাতিল হওয়ার দু' বছরের মধ্যে ডিনোভো রেজিস্ট্রেশন করা যেতে পারে।

## পরীক্ষা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা

ইনস্টিটিউট এই পরীক্ষা নেয় তিনটি পর্যায়ে—প্রিলিমিনারি, ইন্টারমিডিয়েট এবং ফাইনাল। কোন বিষয়ের কী সিলেবাস, সেসব ইনস্টিটিউটের হ্যান্ডবুক-এ পরিষ্কার ভাবে দেওয়া আছে (অ্যানেকসার ১)।

প্রিলিমিনারি পরীক্ষা দিতে হলে প্রার্থীকে ন্যূনপক্ষে গ্র্যাজুয়েট হতে হবে। এই পরীক্ষা দিতে হলে প্রার্থীকে ইনস্টিটিউটের ছাত্র হিসেবে নাম নথিভুক্ত করাতে হয় না ; সরাসরি আবেদন করা যায়। একবারে বসে কোনও বিষয়ে শতকরা ৪০ নম্বর এবং এগ্রিগেটে শতকরা ৫০ নম্বর পেলে পরীক্ষার্থীকে উত্তীর্ণ বলে ঘোষণা করা হয়।
ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় বসতে হলে প্রার্থীকে অন্তত ন' মাস আগে ছাত্র হিসেবে নিজের নাম নথিভুক্ত করাতে হবে।

তা ছাড়া পোস্টাল কোচিং শেষ করা চাই। যদি দুটি গ্রুপে একবারে বসে কেউ প্রতিটি বিষয়ে কমপক্ষে শতকরা ৪০ নম্বর এবং এগ্রিগেটে সব বিষয় মিলিয়ে শতকরা ৫০ নম্বর পায় তা হলে তাকে পাশ বলে ঘোষণা করা হয়। তেমনই একটি গ্রুপের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। একবারে বসে কোনও বিষয়ে কমপক্ষে শতকরা ৬০ নম্বর এবং এগ্রিগেটে শতকরা ৭০ নম্বর পেলে এবং দুটি গ্রুপ একসঙ্গে পাশ করলে তাকে ডিসটিংশন সহ পাশ বলে উল্লেখ করা হয়।
ফাইনাল পরীক্ষা দিতে হলে প্রার্থীকে ইনস্টিটিউটের নথিভুক্ত (রেজিস্টার্ড) ছাত্র হতে হবে ; ইন্টারমিডিয়েট পাশ করতে হবে (দুটি গ্রুপেই)। যদি একসঙ্গে কোনও পরীক্ষার্থী তিনটি গ্রুপেই বসেন এবং প্রতিটি বিষয়ে কমপক্ষে শতকরা ৪০ নম্বর পেয়ে পাশ করেন ও এগ্রিগেটে শতকরা ৫০ নম্বর পান তা হলে তাঁকে উত্তীর্ণ ঘোষণা করা হয়। একটি গ্রুপের ক্ষেত্রেও এই নম্বরের হারের নিয়ম প্রযোজ্য। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার মতো ফাইনাল পরীক্ষাতেও নির্দিষ্ট নম্বর (প্রতি বিষয়ে ৬০% এবং এগ্রিগেটে ৭০%) পেলে তাকে ডিসটিংশন সহ পাশ বলে ঘোষণা করা হয়।
সারা দেশের প্রায় ৩৮টি কেন্দ্রে ইনস্টিটিউটের পরীক্ষা নেওয়া হয়। আমেদাবাদ, বাঙ্গালোর, বেলগাঁও, বরোদা, ভুবনেশ্বর, বম্বে (চার্চগেট এবং দাদার), কলকাতা, চণ্ডীগড়, কোয়েম্বাটুর, দিল্লি, এর্নাকুলাম,

গুয়াহাটি, গাজিয়াবাদ, হায়দরাবাদ, ইন্দোর, জয়পুর, যোধপুর, কানপুর, লখনউ, লুধিয়ানা, মাদ্রাজ, মাদুরাই, মোদিনগর, নাগপুর, পানাজি, পাটনা, পুনে, রাজকোট, সিমলা, শ্রীনগর, রাঁচি, ত্রিচুরাপল্লি, ত্রিবান্দ্রাম, উদয়পুর, বিজয়ওয়াড়া, বিশাখাপত্তনম। ভারতের বাইরে আবুধাবিতেও পরীক্ষা-কেন্দ্র আছে। প্রতি বছর সাধারণত জুন ও ডিসেম্বর মাসে পরীক্ষা নেওয়া হয়। নির্ধারিত ফর্মে আবেদন করতে হয় পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। ইনস্টিটিউটের অফিস থেকে দু' টাকার বিনিময়ে এই ফর্ম পাওয়া যেতে পারে। দু' টাকার পোস্টাল অর্ডার কিংবা ব্যাঙ্ক ড্রাফট (দি ইনস্টিটিউট অব কম্পানি সেক্রেটারিজ অব ইন্ডিয়া অনুকূলে) এবং নাম-ঠিকানা লেখা ২৩×১১ সেমি মাপের ১ টাকা ৪০ পয়সার ডাকটিকিট লাগানো একটি খাম পাঠালে ডাকযোগেও ফর্ম পাওয়া যেতে পারে।
ইনস্টিটিউটের সদর দফতরের ঠিকানা : দ্য ইনস্টিটিউট অব কম্পানি সেক্রেটারিজ অব ইন্ডিয়া, আই সি এস আই, ২২ ইনডাসট্রিয়াল এরিয়া, লোদি রোড, নতুন দিল্লি-১১০০০৩।

## পড়াশোনার খরচ

রেজিস্ট্রেশন
ফি বাবদ ২৫০ টাকা, প্রিলিমিনারি এগজামিনেশন এক্সজেম্পশন ফি (প্রয়োজন হলে) ৫০ টাকা, ইন্টারমিডিয়েট কোর্সের জন্য পোস্টাল টিউশন ফি ৬৫০ টাকা। যারা কমার্স গ্র্যাজুয়েট নয় তাদের ক্ষেত্রে এক্সজেম্পশন ফি প্রযোজ্য। তা ছাড়া গ্র্যাজুয়েট বা পোস্টগ্র্যাজুয়েট স্তরে যে-বিষয় পড়ানো হয়নি অথচ প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত আছে এমন প্রতিটি বিষয়ের জন্য পোস্টাল টিউশন ফি দিতে হবে ৫০ টাকা। তফসিলি জাতি বা উপজাতির ছাত্রছাত্রীদের অর্ধেক ফি লাগবে।
প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফি ২০ টাকা।
ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফি ২৫ টাকা।
ফাইনাল পরীক্ষার ফি ৩০ টাকা।
ইনস্টিটিউটের যাবতীয় প্রাপ্য দিতে হয় ডিমান্ড ড্রাফটে।

## পূর্ব ভারতে যোগাযোগের ঠিকানা

পূর্ব ভারতে আছে কয়েকটি আঞ্চলিক পরিষদ ও শাখাকেন্দ্র। এইসব ঠিকানায় যোগাযোগ করা যেতে পারে :

(১) ইস্টার্ন ইন্ডিয়া রিজিওনাল কাউন্সিল অব দ্য আই সি আই, ১৮এ এভারেস্ট হাউস, ১৯তলা, ৪৬সি চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা-৭০০০৭১।

(২) ভুবনেশ্বর চ্যাপ্টার—৬৭৪, শহিদনগর ভুবনেশ্বর-৭৫১০০৭।

(৩) জামশেদপুর চ্যাপ্টার—ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, সোনারি ব্রাঞ্চ, জামশেদপুর-৮৩১০০১।

(৪) নর্থ ইস্টার্ন চ্যাপ্টার—ফিনানশিয়াল কন্ট্রোলার, অসম ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিভেলাপমেন্ট কর্পোরেশন লিঃ, আর জি বড়ুয়া রোড, গুয়াহাটি-৭৮১০২৪।

(৫) পাটনা চ্যাপ্টার—ভারত ওয়াগন অ্যান্ড এঞ্জিনিয়ারিং কোং লিঃ, 'সি' ব্লক, (৬ তলা), মৌর্যলোক, ডাকবাংলো রোড, পাটনা-৮০০০০১।

(৬) রাঁচি চ্যাপ্টার—ডেপুটি চিফ ফিনান্স ম্যানেজার, আর অ্যান্ড ডি সি আই এস, স্টিল অথরিটি অব ইন্ডিয়া লিঃ, রাঁচি-৮৩৪০০২।

এ ছাড়া ভারতে আছে আরও তিনটি আঞ্চলিক পরিষদ অফিস। উত্তর ভারতে—১, রানি ঝাঁসি রোড, নয়াদিল্লি-১১০০৫৫ ; দক্ষিণ ভারতে—৪, হুইট ক্রফ্ট রোড, নাঙ্গামবাক্কাম, মাদ্রাজ-৬০০০৩৪ ; এবং পশ্চিম ভারতে—১৩, জলি মেকার চেম্বার্স, নং ২, নরিম্যান পয়েন্ট, বোম্বাই-৪০০০২১।

ধারাবাহিক উপন্যাস

# সোনার গণপতি হিরের চোখ

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

যাই হোক, স্টেশন থেকে ফিরে শুভঙ্কর ধীরে-ধীরে অন্ধকার মাড়িয়ে বিল্টুদের বাড়ির পিছনে এসে দাঁড়াল। নীচের দরজা তো ভেতর থেকেই বন্ধ। তাই বাড়ির পিছন দিকে চলে গেল। কড়ি ভচুকে বলেছিল ছাদের আলসের সঙ্গে একটা নাইলনের ফিতে নীচের দিকে ঝুলছে। সেটা এখনও ঝুলছে কী ? যদি ঝুলে থাকে তবে তাই ধরেই ওপরে উঠবে শুভঙ্কর।

ও তীক্ষ্ণ চোখে দেওয়ালে হাত বুলিয়ে অন্ধকার হাতড়ে এগোতে লাগল। এত অন্ধকার হত না এখানে, আসলে চারদিকে গাছপালা এত ঘন যে, তারই ছায়ায় অন্ধকার যেন কুটিল হয়ে উঠেছে। অবশ্য এই অন্ধকার থাকবে না বেশিক্ষণ। পূর্ণিমা এগিয়ে আসছে। তাই খানিক বাদেই জ্যোৎস্না ফুটবে। দেওয়াল হাতড়ে যেতে-যেতে এক জায়গায় হঠাৎই একটা কী যেন হাতে লাগল ওর। আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল শুভঙ্কর। এই তো ঝুলছে ফিতেটা। ও হাত দিয়ে ফিতেটা ধরে বেশ দু-একবার গায়ের জোরে টেনে দেখল। না, বাঁধন আলগা নয়। বেশ শক্তই আছে। তাই আর দেরি না করে সেটাকে ধরে একটু-একটু করে দেওয়াল বেয়ে উঠতে লাগল ওপরে। বেশ খানিকটা উঠেছে এমন সময় ভাঙা দেওয়ালের একটা খোপের ভেতর থেকে 'ক্যাঁ-ক্যাঁ' শব্দে প্রচণ্ড চিৎকার করে কী যেন একটা উড়ে গেল ডানা ঝাপটে। আর একটু হলেই হয়েছিল আর কি। হাত ফসকে পড়ে যেত একদম নীচে। ওর সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপতে লাগল ভয়ে। একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে। বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করছে। একটুক্ষণ থেমে থেকে এই আকস্মিক ব্যাপারটা সামলে নিয়ে আবার ওঠা শুরু করল। একেবারে শেষ সীমায় পৌঁছে ঘেরা-ছাদের আলসেটা টপকেই দেখল, হাত, পা ও মুখ বাঁধা অবস্থায় মউ পড়ে আছে ছাদের ওপর। কী নির্দয়ভাবে মেয়েটাকে বেঁধে রেখেছে ওরা। হাত দুটো পিছমোড়া করে দুটো পায়ের সঙ্গে নাইলনের ফিতে দিয়ে বেঁধেছে। মুখের ভেতর কাপড় গুঁজে সে মুখও বাঁধা। এমনকী, গড়িয়ে-গড়িয়েও মেয়েটা যাতে চলে যেতে না পারে সেজন্য সারা গায়ে ফিতে জড়িয়ে ছাদের আলসের ঘেরের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে মজবুত বাঁধনে।

শুভঙ্কর মউয়ের অবস্থাটা দেখেই ধীরে-ধীরে সিঁড়ির দরজার কাছে গেল। অল্প একটু চাপ দিয়ে ঠেলে দেখল সেটা বন্ধ কি না। কিন্তু না, খোলাই ছিল সেটা। আসলে এ-দিকটা নিরাপদ তো। তাই তাড়াতাড়ি পালাবার সুবিধের জন্য খোলা রেখেছে দরজাটা। শুভঙ্কর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সেই খোলা দরজায় শিকল দিল। তারপর পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল মউয়ের কাছে। জোরে গেল না এই কারণে যদি পায়ের শব্দে ওরা কিছু টের পায়।

শুভঙ্কর মউয়ের কাছে গিয়ে দেখল ওর দু' চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। এখানে তত অন্ধকার নেই। তার ওপর আকাশের ভরন্ত চাঁদের গা বেয়ে জ্যোৎস্না ঝরে-ঝরে পড়ছে।

মউও দেখল শুভঙ্করকে। বাঁচার আশায় মুক্তির আনন্দে ওর চোখে-মুখে নিমেষে ভাবান্তর ঘটে গেল। মুখে তো কিছু বলতে পারল না। শুধু একটা গোঁ-গোঁ শব্দ বেরোল মুখ থেকে। শুভঙ্কর প্রথমেই ওর মুখের বাঁধন খুলে ফেলল।

বিস্মিত মউ ওর দিকে তাকিয়েই বলল, "তবে যে শুনলাম পুলিশের গাড়ি এসে তোমাকে নিয়ে গেছে ?"

"ঠিকই শুনেছ। কিন্তু তোমাকে এই শত্রুপুরীতে এই অবস্থায় ফেলে রেখে আমি কী করে যাই বলো ?"

"কিন্তু পুলিশের খপ্পর থেকে ছাড়া পেয়ে এখানে তুমি এলে কী ভাবে ?"

"অন্যায়ভাবে। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে এসেছি আমি। যাকগে, এখন এসব কথা বলার সময় নয়। শুধু তোমার ক্ষতি হবে ভেবেই পুলিশকে এদের কথা বলিনি কিছু।"

"আমিও ঠিক সেই কারণেই আমার প্যান্টের পকেটে ছুরি থাকা

সত্ত্বেও বাধা দিইনি ওদের। কেননা, পাল্টা প্রতিশোধ নিতে যদি ওরা তোমাকে মেরে ফেলে তাই।"

শুভঙ্কর হেসে বলল, "কিন্তু কিসের জন্য মউ ? আমি তোমার কে ?"

"আমার সত্যিকারের বন্ধু। আমি অনেকদিন ধরে তোমার মতো সহজ সরল একটি ভাল ছেলেকে আমার বন্ধু হিসেবে পেতে চেয়েছিলাম। এতদিনে পেয়েছি।"

"সে কী ! আমি তো জানি তোমার চোখে আমি একটা বোকা হাবা হাঁদারাম।"

"সেটা আগে ছিলে। এখন আর নও। তুমি যদি তাই হতে তা হলে কি এইভাবে বীরের মতো পুলিশের খপ্পর থেকে পালিয়ে এসে আমাকে উদ্ধার করতে পারতে ? যাক,এখন কথা না বাড়িয়ে আমার প্যান্টের পকেট থেকে ছুরিটা বার করে বাঁধনগুলো কেটে দাও। অনেকক্ষণ এইভাবে পড়ে আছি। কষ্ট হচ্ছে খুব।"

শুভঙ্কর একটুও দেরি না করে মউয়ের পকেটে হাত দিয়ে ছুরিটা বার করল। ভাগ্যিস, জিনসের প্যান্টটা পরে ছিল মউ। তাই পিছন দিকের পকেটে বেশ ভালভাবেই গুঁজে রাখতে পেরেছিল ছুরিটা। ছুরি বার করেই কাটতে লাগল ফিতেগুলো। ফিতে কাটা শেষ হলে ওকে বহুকষ্টে দু'হাতে ধরে তুলে দাঁড় করাল শুভঙ্কর। অনেকক্ষণ উলটো-পাকে বাঁধা থাকার ফলে হাত-পাগুলো কিছুতেই সোজা হতে চাইছিল না। এবার উঠে দাঁড়িয়ে হাত-পা টান করে সামান্য একটু ম্যাসাজ করে ঠিকঠাক করে নিল। তবু কী ব্যথা-ব্যথা করছে। বুক ভরে কয়েকটা নিশ্বাস নিয়ে মউ বলল, "এই সময় একটু জল পেলে ভাল হত। যা তেষ্টা পেয়েছে।"

"জল তো এখন পাওয়াই মুশকিল।"

"সে জানি। এখন চলো, চুপিচুপি গিয়ে দেখি ওরা কী করছে।"

ছুরিটা শুভঙ্করের হাতেই ছিল। সেটাকে কায়দা মাফিক ধরে মউকে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলার দালানে এল। যে ঘরে অপারেশন সে ঘরের জানলা-দরজা ভেতর থেকেই বন্ধ ছিল। ওরা চুপিচুপি এসে দরজার দু'পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল। দু'জনেই কান খাড়া করে শোনবার চেষ্টা করল ওদের কোনও কথাবার্তা অথবা খুটখাট ঠুকঠাক শব্দ কিছু শুনতে পায় কি না। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও কিছুই শুনতে পেল না ওরা। শুভঙ্কর তখন আঙুলের ডগা দিয়ে আলতো করে একটু চাপ দিল দরজায়। দরজাটা খুলে গেল। ঘরের ভেতর চিমনি লণ্ঠনটা জ্বলছিল। তারই আলোয় যা দেখল, তাতে সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল ওদের।

শুভঙ্কর ও মউ দেখল ঘরের মেঝেয় কড়ির প্রাণহীন দেহটা লুটিয়ে পড়ে আছে।

আর কী দেখল ?

আর দেখল দাদুর ছবিটা দেওয়ালের হুকে টাঙানো নেই। সেখানে চোরকুঠরির গহ্বরটা হাঁ হয়ে আছে। সোনার গণপতির চিহ্নমাত্র নেই। অর্থাৎ গণপতি উধাও হয়েছেন। সেই চোরকুঠরিতে চন্দনকাঠের শূন্য সিংহাসনে ফণা উঁচিয়ে দুলছে একটা কেউটে সাপ।

শুভঙ্কর সাপ চেনে না। মউ ওকে বলল, "এটা জাত কেউটে, এর ছোবল সহ্য করার শক্তি মানুষ কেন দানবেরও নেই।"

মউ দু' বার হাতে তালি দিতেই সাপটা ফাটলের গর্তে ঢুকে গেল।

শুভঙ্কর ও মউ দারুণ রকমের আশাহত হয়ে কী যে করবে কিছু ঠিক করতে পারল না। ওরা কড়ির মৃতদেহের ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখল ওর কপালের ওপর ছোবলের দাগ। পাশাপাশি দুটি ক্ষত।

## শব্দসন্ধান

রঞ্জন

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ■ | ৩ | | ৪ | ■ | ৫ | | ৬ |
| ৭ | | ■ | | ■ | ৮ | ৯ | | ■ | |
| ■ | ১০ | | | ■ | ১১ | | ■ | ১২ | |
| ১৩ | | ■ | ১৪ | ১৫ | | ■ | ১৬ | | ■ |
| | ■ | ১৭ | | | ■ | ■ | ১৮ | | ১৯ |
| ২০ | ২১ | | ■ | ■ | ২২ | ২৩ | | ■ | |
| ■ | ২৪ | | ■ | ২৫ | | | ■ | ২৬ | |
| ২৭ | | ■ | ২৮ | | ■ | ২৯ | | | ■ |
| | ■ | ৩০ | | | ■ | | ■ | ৩১ | ৩২ |
| ৩৩ | | | ■ | ৩৪ | | | ■ | ৩৫ | |

**সংকেত : পাশাপাশি** : (১) ভারতে এই অস্ত্র প্রথম ব্যবহার করেছিলেন বাবর। (৩) খিল। (৫) নেকড়ে বাঘ। (৭) বস্ত্রবিশেষ। (৮) এর সারা গায়ে বড়-বড় কাঁটা। (১০) গ্রাম্য মহোৎসব। (১১) লাউ। (১২) পাখির মধ্যে কাক, জন্তুর মধ্যে শিয়াল যেমন। (১৩) ডানা আছে, কিন্তু কে দেখেছে একে? (১৪) গানের একটি বিশেষ তাল বা রাগিণী। (১৬) রামকৃষ্ণকে ইনি ঘরে-ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন। (১৭) মনের ক্রিয়া। (১৮) অম্লমধুর ফলবিশেষ। (২০) রাম-লক্ষ্মণকে নাগপাশমুক্ত করেছিলেন কে? (২২) ভাড়া, শুল্ক। (২৪) গলার গয়না, ঘরের পরদা। (২৫) মনোনয়ন, মনোনীত। (২৬) নদীর থাকে, রাজারও থাকে। (২৭) 'হও ধরমেতে—'। (২৮) ধনুকের জ্যা। (২৯) আম। (৩০) বরফ। (৩১) নৌ-চালক। (৩৩) মজা, কৌতুক। (৩৪) পা ও পাপ দুয়ের যা দরকার হয়। (৩৫) চোঙ।

**উপর-নীচ** : (১) দামি জিনিসপত্র। (২) প্রাণ বাঁচাতেই এমন দৌড়। (৩) অমনোযোগ। (৪) জাহাজের খালাসি। (৫) গাছ। (৬) খিদেয় কাতর। (৯) 'এ তো বড়ো রঙ্গ—'। (১২) দূর থেকে পাহাড়ের রং যেমন দেখায়। (১৩) সাপ। (১৫) মর্যাদা। (১৬) বেল। (১৭) মহামারী (১৯) কাব্যে সমুদ্র বা সরোবর। (২১) শোভন, সুন্দর। (২২) যা খাই, রঙিন হলে তা-ই পুষি। (২৩) বাঘের জন্য বিখ্যাত। (২৫) 'মরাঠা দস্যু আসিছে রে ঐ—' কোন কবিতার পঙ্‌ক্তি? (২৬) অরণ্যদেবকে বনবাসীরা বলে '— অশরীরী'। (২৭) মৎস্যগন্ধা ছিলেন —কন্যা। (২৮) পাহাড়-পর্বতে থাকে। (৩০) পাখির বাসা। (৩২) জলাশয়বিশেষ।

*গত সংখ্যার সমাধান*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| উ | ত্ত | ম | পু | রু | ষ | ■ | হা | লু | ম |
| প | ■ | নু | ■ | ই | ■ | ■ | ও | ■ | র |
| ন | ■ | ■ | সি | ত | ■ | প | দা | তি | ক |
| গ | র্দ | ভ | ■ | ন | গ | দ | ■ | মি | ত |
| র | ■ | দ্র | ব | ■ | ■ | ব্র | ■ | র | ■ |
| ■ | ম | ■ | লা | ■ | ■ | জ | উ | ■ | চি |
| অ | জা | ■ | হ | লু | দ | ■ | মা | ই | নে |
| কু | রু | ব | ক | ■ | শা | ক্য | ■ | ■ | বা |
| লা | ■ | ন্ধু | ■ | ■ | ন | ■ | খু | ■ | দা |
| ন | শ্ব | র | ■ | কা | ন | ন | কু | সু | ম |

ওর মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠছে। প্রাণহীন নিথর দেহ।

শুভঙ্কর বলল, "এই দম-বন্ধ-করা চোরকুঠরিতে ওই সাপটা কী করে এল?"

মউ বলল, "এতে আর অবাক হওয়ার কী আছে? দীর্ঘদিনের পুরনো বাড়ির ফাটলের মধ্যে ওই চোরকুঠরিতে সাপ ছাড়া অন্য কিসেরই বা বাসা হবে? তার ওপর চন্দন কাঠের সিংহাসনের গন্ধ। একদিকে অবশ্য ভালই হয়েছে। এই দুষ্কৃতীগুলো যদি না আসত, আর তুমি আমি দু'জনে এই কাজ যদি করতে যেতাম তা হলে কী যে হত তা একবার চিন্তা করে দেখেছ কি? হয় তুমি, না হয় আমি দু'জনের একজন মরতামই।"

"তা অবশ্য ঠিক। সোনার গণপতিকে আমরা উদ্ধার করতে না পারলেও তিনি কিন্তু অলক্ষ্য হতে আমাদের অতি সুন্দরভাবে রক্ষা করে চলেছেন।"

"এবং এর দ্বারাই মনে হয় দুই আর দুইয়ে যেমন চার, তেমনই সোনার গণপতিও আমাদের। আজ হোক কাল হোক, ও মূর্তি আমাদের হাতে আসবেই আসবে। তার কারণ আমাদের মধ্যে কোনওরকম তঞ্চকতার প্রবৃত্তি নেই। আমাদের উদ্দেশ্য মহৎ। আমরা গণপতির আর্থিক মূল্য নয়, তাঁর কৃপা চাই। আমরা তাঁর ইচ্ছাপূরণে ব্রতী।"

শুভঙ্কর বলল, "তা না হয় হল। কিন্তু ওই ভচু। তার নাগাল কী করে পাব আমরা?"

"যেভাবেই হোক পেতে হবে।"

"এখন প্রশ্ন, সোনার গণপতি সত্যিই কি সে পেয়েছে? শূন্য সিংহাসন দেখে ফিরেও তো যেতে পারে?"

"পারে। তবে এক্ষেত্রে তা হয়নি। সিংহাসনটা ভাল করে লক্ষ করো, তা হলেই তোমার প্রশ্নের উত্তর পাবে। আমি প্রথমেই যা দেখবার তা দেখে নিয়েছি।"

শুভঙ্কর মউয়ের কথামতো সিংহাসনটা পরীক্ষা করল। সিংহাসনের মাঝখানটায় চারচৌকো একটা সাদা দাগ। সেই দাগের বাইরে চারদিকে পুরু ধুলোর আস্তরণ। এতেই বোঝা যায় সোনার গণপতি এখানেই ছিল। এবং সেটাকে এখান থেকে সরানো হয়েছে।

মউ বলল, "কী দেখলে?"

"তোমার অনুমানই ঠিক।"

"এ ছাড়া আরও প্রমাণ, সোনার গণপতি যদি পাওয়া না যেত তা হলে ওই দুষ্কৃতী ছাদে উঠে নাইলনের ফিতে ধরেই চুপিচুপি পালাত। কিন্তু যেহেতু ওটা সে হাতে পায় তাই ওই দুর্লভ সামগ্রী হাতে কঠিন পথটি বেছে না নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে সোজা পথেই চলে গেছে।"

শুভঙ্কর ও মউ কড়ির পকেট হাতড়ে কিছু টাকাপয়সা ও দাদুর লেখা সেই ডায়েরিটা উদ্ধার করল। টাকাপয়সাগুলো অপ্রয়োজনীয় বস্তুর মতো ফেলে দিয়ে ডায়েরিটা সযত্নে রক্ষা করল। কড়ির হাতে একটা রিভলভার ছিল। শুভঙ্কর নিয়ে নিল সেটা।

মউ বলল, "গণপতি যা করেন সিদ্ধিলাভের জন্য। আসন্ন সংগ্রামে ওটাই আমাদের হাতিয়ার। ওটাকে সঙ্গে রাখো। কাজে লাগাবে।"

শুভঙ্কর রিভলভার হাতে নিয়ে বলল, "সেকথা আবার বলতে? এখন বুঝলে তো গণপতি রহস্য কীরকম?"

"কীরকম?"

"প্রথম আবির্ভাবেই একজনের মৃত্যু। এখনও কে যে মরবে, কখন যে মরবে তা কে জানে? (ক্রমশ)

*ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়*

বইয়ের খবর

## দুটি ছেলেমেয়ের অ্যাডভেঞ্চার

ছোট্ট মেয়ে লি-লা । জন্মদিনে তার দাদু তাকে দিলেন সাটিনের একটা খেলনা ফু-ডগ । ফু-ডগ কী ? প্রাচীনকালে চিনের সম্রাটরা মন্দির আর প্রাসাদের সামনে এক কাল্পনিক জন্তুর বিরাট বিরাট মূর্তি বানাতেন । তাঁদের বিশ্বাস ছিল এই ফু-ডগ ওই মন্দির আর প্রাসাদ পাহারা দেয় । লি-লা'র দাদা ম্যালকম বিশ্বাস করতে চায় না সেকথা । তারপর দু'জনে একদিন চুপিচুপি ট্রেনে চেপে চারশো মাইল পেরিয়ে লন্ডনে আসে । সঙ্গে ভাগ্যিস ছিল জাদু-খেলনাটা ! নানা বিপদের মধ্যে তাদের কীভাবে রক্ষা করে ফু-ডগ, তারই গল্প । ছবিগুলোও চমৎকার । লিখেছেন, রুমার গডেন । বইয়ের নাম : ফু-ডগ । ছবি এঁকেছেন ভালেরি লিট্‌লউড । (জুলিয়াম্যাক-রাই বুক্‌স । দাম : ৯·৯৫ পাউন্ড) প্রকাশিত হয়েছে ১৯৯০ সালে । ইতিমধ্যেই বইটি খুব জনপ্রিয় হয়েছে ইংল্যান্ডে ।

## মজার ছড়া আর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের ছবি

যে-কোনও ভাল ছোটদের বই মানেই দারুণ সব ছবিতে ভরপুর । এই ছবি আঁকেন যে শিল্পীরা তাঁদের প্রত্যেকের ছবি-আঁকার ধরনও আবার নানারকম । নিজস্ব প্রতিভার পরিচয় তাতে স্পষ্ট । প্রতি বছর ব্রিটেনে ছোটদের যে-সমস্ত নতুন বই প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে যে বইয়ের ছবি সব থেকে আকর্ষক এবং চমকপ্রদ, সেই শিল্পীকে দেওয়া হয় 'মাদার-গুজ' পুরস্কার । ১৯৭৯ সাল থেকে প্রতি বছর এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে । এখনও পর্যন্ত দশ বছরে যে দশজন শিল্পী মাদার-গুজ পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদের সকলের ছবি নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে একটি বই, নাম 'টেন গোল্ডেন ইয়ার্স' । প্রকাশক : ওয়াকার বুক্‌স । সম্পাদনা করেছেন, স্যালি গ্রিন্‌ড্‌লে ও ক্রিস পাউলিং । দাম : ৯·৯৫ পাউন্ড । বইটির পরিকল্পনায় সম্পাদকদের বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় । তাঁরা ব্রিটেনের সমস্ত নামকরা কবিকে ছোটদের জন্য ছড়া বা কবিতা লিখতে অনুরোধ করেছেন । এই ছড়া ও কবিতাগুলির সঙ্গে মানানসই ছবি এঁকেছেন পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পীরা । সব মিলিয়ে বইটির জুড়ি মেলা ভার । কয়েকটি ছবির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় । যেমন, পিটার ডিকসন আর পিটার ব্রাউনজনের কবিতায় মিচেল কার্টিজের ছবি, অ্যাড্রিয়ান মিচেলের কবিতার সঙ্গে প্যাট্রিক বেনসনের ছবি আর জন রাইসের 'ভাল্লুকেরা কলা খায় না কভু' (বিয়ারস ডোন্ট ইট ব্যানানাস) কবিতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চার্লস ফিউজের ছবি । অ্যাড্রিয়ান মিচেল পুরস্কৃত হয়েছিলেন প্রথম বছরে, অর্থাৎ

*অ্যাড্রিয়ান মিচেলের কবিতার সঙ্গে রয়েছে প্যাট্রিক বেনসনের এই ইলাস্ট্রেশন*

১৯৭৯ সালে, প্যাট্রিক বেনসন পুরস্কৃত হন ১৯৮৩-তে আর চার্লস কিউজ এই পুরস্কার পেয়েছেন সম্প্রতি, ১৯৮৯-তে । বইটি সম্পর্কে আর-একটি তথ্য জানানো দরকার । সম্পাদকরা ভূমিকায় জানিয়েছেন যে, বইটি বিক্রি করে যে টাকা পাওয়া যাবে তার পুরোটাই তুলে দেওয়া হবে গ্রেট অরমন্ড স্ট্রিট হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হাতে । হাসপাতালটিতে যাতে আরও বেশিসংখ্যক রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায় ।

## দুটি গল্পের বই

**গাঙশালিকের বাসা**
অধীর বিশ্বাস
*সাহিত্য বিহার, মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রিট, কলকাতা : ৯*
*দাম : দশ টাকা*

লেখক ছোটদের মনের গভীরে অনায়াসে ডুব দিতে পারেন, ধরতে পারেন তাদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার মুহূর্তগুলিকে । দশটি গল্পের এই সঙ্কলনেও লেখক তাঁর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন । 'বন্ধুর নাম পিঁপড়ে', 'খেলতে গিয়ে', 'ভূতের পালকি' ও 'গাঙশালিকের বাসা' গল্পগুলি ভাল । অনুপ রায়ের প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ সুন্দর ।

**ছোটদের অমনিবাস**
ধীরেন্দ্রলাল ধর
*কিশোর ভারতী, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা :৭*
*দাম : তিরিশ টাকা*

বারোটি গল্পের এই সঙ্কলনে যেমন আছে আলিবাবা, রবিনহুড, আলাদিন ও আশ্চর্য প্রদীপের গল্প, তেমনই আছে গালিভার ও লিলিপুটদের গল্প । গল্পগুলি লেখা হয়েছে যুক্তাক্ষর বাদ দিয়ে, যাতে একদম ছোটরাও বইটি পড়তে পারে । বইটি পড়ে ছোটরা ভীষণ আনন্দ পাবে ।

রতনতনু ঘাটী

## ক্রিকেটারদের নিয়ে বই

লন্ডনের সুবিখ্যাত 'দি টাইমস' পত্রিকায় গত দীর্ঘ একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে খেলার পাতায় অনেক ক্রিকেটার সম্পর্কেই নানা ধরনের লেখা বেরিয়েছে। তার মধ্যে থেকে উজ্জ্বলতম পঞ্চাশজন ক্রিকেটার সম্পর্কে লেখা সঙ্কলন করে প্রকাশ করেছেন তাঁরা । শুধু এই ক্রিকেটারদের জীবনী নয়, আছে টেস্টম্যাচের ও কাউন্টি ম্যাচের স্মরণীয় মুহূর্ত, ব্যক্তিগত জীবনের মজার-মজার ঘটনা, বিভিন্ন রেকর্ডের নির্ভুল ইতিহাস। সম্পাদক কেনেথ গ্রেগরি (টাইমস বুক্‌স, ১৬·৯৫ পাউন্ড) । ছবির সংখ্যাও অনেক । ক্রিকেট-পাগল পাঠকের কাছে বইটির মূল্যই আলাদা । নাম : ফিফটি মাস্টার ক্রিকেটারস ফ্রম দি টাইমস ।

অভীক মজুমদার

নানারকম

## ধাঁধা

এক-একজনের এক-একরকম বায়না। আমাদের ছোট্ট পিকনিকে সকালের জলখাবার কী হবে, তাই নিয়ে আলোচনা চলছিল। আর তখনই বোঝা গেল, খানা শুধু 'আপরুচি'ই নয়, সেই রুচিও নানা ধরনের। কিন্তু তাই বলে এতরকম? শুধু ডিমের কথাই ভাবো না। সকালে পাউরুটি-কলার সঙ্গে ডিম হবে—এই পর্যন্ত সবাই একমত। কিন্তু ডিমের কী হবে, তাই নিয়ে হাজারো দাবি। এ বলে সেদ্ধ, ও বলে আধ-সেদ্ধ। কেউ বলে ওয়াটার পোচ, কেউ চায় ওমলেট। এ বলে হাঁসের ডিম, ও বলে মুরগির। ওফ্‌!

ছোট্‌কার কাছে পিকনিকের গল্প বলছিলাম। ছোট্‌কা শুনে হেসে বলল, "ডিমের কী হবে আমি বলছি। চটপট লিখে নাও।" আমি ভাবলাম, বুঝি রন্ধনপ্রণালী শেখাবে ছোট্‌কা। কিন্তু তার বদলে পেলাম ডিমের ধাঁধা।

**প্রথম ধাঁধা** ॥ বাজারে এক ডিমবিক্রেতা অনেক ছোট ঝুড়িতে করে ডিম এনেছে। হাঁসের ডিম আছে, আছে মুরগির ডিমও। ছ'টা ঝুড়ি: এক ঝুড়িতে ৫টা, একটায় ৬টা। একটাতে ১২টা, একটায় ১৪টা, একটাতে ২৩টা, একটা ২৯টা ডিম। কোন্‌টায় হাঁস, কোন্‌টায় মুরগি তা কিন্তু বলছি না। বিক্রেতা প্রথমেই স্থানীয় বাজারের একটা দোকানে ডিম-ভর্তি ঝুড়ি ছ'টার একটা ঝুড়ি বিক্রি করে এল। তারপর নিজের জায়গায় ফিরে এসে দেখল, খুব সুন্দর হিসেব এখন। হাঁসের ডিম যা রয়েছে, ঠিক তার দ্বিগুণ সংখ্যক রয়েছে মুরগির ডিম! কোন্‌ ঝুড়িটা বিক্রি করে এমন হল?

**দ্বিতীয় ধাঁধা** ॥ চায়ের কাপের হাতল কাপের কোন্‌ দিকে থাকে?

**তৃতীয় ধাঁধা** ॥ জট ছাড়াও—

টধূপলিল

**গতবারের উত্তর** ॥ (১) দেওয়ালঘড়িটায় দম দিয়ে, চালু করে, সে-ঘড়ির সময় দেখে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন ভদ্রলোক। মোড়ে গিয়ে গির্জার ঘড়িতে লক্ষ করেছেন কতটা সময় কাটালেন সেখানে। ফিরে এসে প্রথমেই দেখেছেন বাড়ির দেওয়ালঘড়িতে কতটা সময় বদলেছে। সেটুকু সময়ই বাইরে কেটেছে তাঁর। গির্জার সামনে কতক্ষণ ছিলেন, তাঁর জানা। সেই সময়টুকু বাদ দিয়ে বাকি সময়টুকু আসা-যাওয়ায়। একে দুই দিয়ে ভাগ করে গির্জায় শেষ দেখা সময়ের সঙ্গে একটা ভাগফল যোগ করে নিয়ে দেওয়ালঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে সঠিক সময়ে এনেছেন ভদ্রলোক। (২) ৯৯, ১০০ ও ১০১। (৩) নাগকেশর।

সত্যসন্ধ

## মজার খেলা

পুরনো ক্যালেন্ডারের পাতা থেকে ১ থেকে ১২ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো কেটে নাও। তারপর লুডোর ঘুঁটির মতো ছোট-ছোট ১ ডজন ঘুঁটি কেটে নাও পিসবোর্ড থেকে। বারোটা সংখ্যা বারোটা ঘুঁটিতে বসিয়ে দাও। তা হলেই তুমি অর্ধেক তৈরি— এবারের মজার খেলার জন্য। এবার একটা বড় পিসবোর্ডের উপর সাদা কাগজ সেঁটে তাতে নীচের ছবির মতন একটা ছবি এঁকে নাও। নিয়েছ? বাকি অর্ধেক কাজও শেষ। এবার তুমি পুরো তৈরি খেলার জন্য।

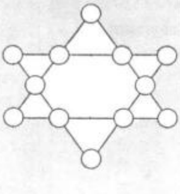

এবার কী করতে হবে শোনো। ১ থেকে ১২ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোকে এই ছবির মধ্যে এমনভাবে বসাতে হবে, যাতে কিনা প্রত্যেক লাইনের চারটে বৃত্তের মধ্যে বসানো সংখ্যার যোগফল হয় ২৬। বন্ধুরা ১২টি ঘুঁটি নিয়ে হিসেব করে বসাক। কিন্তু তার আগে তোমার নিজেরও উচিত চেষ্টা করে দেখা। নইলে সমাধানের জন্য বিফল বন্ধুরা যদি তোমাকেই চেপে ধরে তখন? একটা উত্তর চটপট দেখিয়ে দিই বরং—

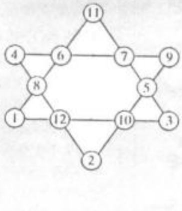


মজারু

## কত কথা

আমার হাতে একটা হেঁয়ালি এসেছে, তোমাদের জন্য দিচ্ছি। দ্যাখো তো যাঁর নাম জানতে চাওয়া হয়েছে বলতে পারো কি না!
একে-দুয়ে হাত, একে-তিনে জল
তিনে মিলে বিখ্যাত কে বল?

২। তিনটে শব্দ দেওয়া হল। এই শব্দগুলোর আগে যে শূন্যস্থান আছে সেখানে একই শব্দ বসিয়ে এদের বাড়াও:
—হাঁস
—কাক
—লেবু

৩। নীচের তিনটি শব্দের মধ্যে পর-পর কী-কী শব্দ পাওয়া যেতে পারে? (ক) পিতামাতা। (খ) কানাকড়ি। (গ) সীতারাম।

**উত্তর**: ১। পাণিনি। ২। 'পাতি' শব্দটি বসবে। ৩। (ক) পিতা, তামা, মাতা। (খ) কানা, নাক, কড়ি। (গ) সীতা, তারা, রাম।

কথক

ছবি: কৃষ্ণেন্দু চাকী

আপনার রঙরূপের বয়েস কি আপনার আসল বয়েসের চেয়েও বেশী দেখাচ্ছে?
আপনার রঙরূপের জৌলুষ কাল কেমন থাকবে, তা নির্ভর করে, আজ আপনি তার কিভাবে দেখাশোনা করছেন, তার ওপর। কারণ, বয়েস বাড়ার সাথে সাথে,ত্বকের আর্দ্রতা কমে যেতে থাকে—তাই, দরকার, জনসন্স বেবী লোশন-এর ময়েশ্চারাইজিং-এর গুণ। এ পাবেন আপনার বেছে নেওয়ার মত দুটি ফর্মূলেশনে—লোশনটি ত্বকের গভীরে ঢুকে কাজ করে, আর এর বিশেষ ময়েশ্চারাইজিং গুণ ত্বকে পুষ্টি যোগায়—আর, আপনার ত্বক অপূর্ব কোমল ও তরতাজা ক'রে রাখে, ফলে আপনার রঙরূপেও যেন চির-বসন্তের ছোঁওয়া লাগে!
রেগুলার
শুষ্ক ত্বকের জন্যে এক বিশেষ ময়েশ্চারাইজারযুক্ত উপাদানের মিশ্রণ
REGULAR FORMUL
Johnson's baby lotion
LOW OIL FORMULA
Johnson's baby lotion
Johnson & Johnson
লো অয়েল
তেলতেলে ত্বকের জন্যে হাল্কা, সূক্ষ্ম ফর্মূলা
জনসন্স বেবী লোশন
কারণ, নরম ও মোলায়েম ত্বক আপনার বয়স গোপন রাখে।
জনসন অ্যাণ্ড জনসন
OBM/4573 BEN

WB/CC 264 MH BY SOUTH 683 TN/MS(C) 731